বুদ্ধকথা

ডক্টর অমূল্যচন্দ্র সেন
এম্. এ, এল্-এল্. বি, পি-এচ্. ডি (হাম্বুর্গ্)

ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিসিটি সোসাইটি
২১ বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৪

ভারতবিদ্যাবিহার-গ্রন্থাবলী—৬

প্রকাশ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬২ ॥ মে ১৯৫৫

প্রকাশক শ্রীমতী বাণী মুন্সী
ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিসিটি সোসাইটি,
২১ বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৪
মুদ্রাকর শ্রীকালিদাস মুন্সী
পুরাণ প্রেস। ২১ বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৪

নিবেদন

এই রচনাটি বাইশ বৎসর পূর্বে (১৯৩৩-৩৪) বঙ্গশ্রী-পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। এখন ইহাতে নানা সংস্কার সাধিত হইয়াছে।

রচনার পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া আচার্য ডক্টর শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয় চারখানি রেখাচিত্র আঁকিয়া দিয়া আমাকে অশেষ গৌরবান্বিত করেন। সেগুলি ২১, ২৭, ৩৩ এবং ৩৫ পৃষ্ঠায় এই পুস্তককে অলঙ্কৃত করিল। ২১২ পৃষ্ঠার রেখাচিত্রটিও তাঁহার অঙ্কিত অশোকরাজকন্যা ভিক্ষুণী সংঘমিত্রার সিংহলযাত্রা বিষয়ক বিখ্যাত চিত্র হইতে গৃহীত।

মলাট ও মুখপট চিত্রদ্বয় ভারতীয় প্রত্নবিভাগের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

অমূল্যচন্দ্র সেন

বিষয়সূচী

চিত্রসূচী



১

উপক্রমণিকা

আধুনিক যুগের মনীষীগণ বুদ্ধকে এশিয়ার শ্রেষ্ঠ মানব বলিয়াছেন। চিন্তাশীল ঐতিহাসিকগণ পৃথিবীর ধর্মগুরুদের মধ্যে বুদ্ধকে অত্যুচ্চ আসন দান করিয়াছেন। পৃথিবীর সব দেশের ধর্ম-ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে বাস্তবিকই প্রতীতি হয় যে চরিত্রে ও জ্ঞানে, ত্যাগে ও লোকহিতার্থক আত্মোৎসর্গে বুদ্ধের স্থান বহু ধর্মপ্রচারকের উপরে ছিল।

কাশীকোশল অঙ্গমগধ প্রভৃতি ছোট ছোট রাজ্যে সামান্যভাবে আরম্ভ হইয়া বুদ্ধের 'ধম্ম' স্বকীয় অন্তর্নিহিত মহিমাবলে ও রাজশক্তির সহায়তায় সমগ্র ভারতের কর্ম ও চিন্তায় অপূর্ব প্রেরণার সঞ্চার করিয়াছিল। সেই প্রেরণায় অনুপ্রাণিত সম্রাট ও ভিক্ষুর সম্মিলিত উদ্যমে বুদ্ধের বাণী ভারতের সাগরপর্বত-সীমান্ত অতিক্রম করিয়া উত্তরে পশ্চিমে, দক্ষিণে পূর্বে দূর দূর দেশে ছড়াইয়া পড়িল—সভ্য ও অর্ধসভ্য নব নব জাতি নিজ নিজ জ্ঞানবুদ্ধি অনুসারে সেই নবীন মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া নিজেদের 'শাক্যমুনির পুত্র' নামে পরিচয় দিল। ঐতিহাসিকগণ ইহাকেই প্রাচীনভারতের দিগ্বিজয় বলিয়াছেন। ইহা হইয়াছিল বাহুবলে নহে, মৈত্রীবলে—অশোক যাহাকে বলিয়াছেন ধর্মবিজয়। ইহার লক্ষ্য ছিল ধনলুণ্ঠন-আহরণ নহে, মনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ বিতরণ। সেই ধর্মবিজয়ের স্মৃতিতেই চীনজাপান-শ্যামসুমাত্র-যববলি-সিংহলব্রহ্মতিব্বতে বুদ্ধপদলাঞ্ছিত মগধকাশী-কোশল আজ পরমতীর্থরূপে পূজিত হইতেছে।

আমাদের নিজেদেরই দেশের এত বড় মহাপুরুষ যে বুদ্ধ, তাঁহাকে ভারত বিস্মৃত হইয়াছিল। ভারততত্ত্ববিৎ পাশ্চাত্য পণ্ডিত আক্ষেপ করিয়াছেন যে, ঐতিহাসিক বোধের অভাবে বাস্তব ভুলিয়া আজগুবির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আমরা আমাদের স্বদেশীয় বড় বড় কীর্তিমান্‌দের স্মৃতির অবমাননা করিয়াছি। আচার্য শঙ্করের মত মহামেধাবী দার্শনিক পণ্ডিতকে আমরা ভেল্‌কিবাজি-প্রদর্শক তার্কিকে দাঁড় করাইয়াছিলাম, মহাকবি কালিদাসের মত সুকুমার রূপ-রসস্রষ্টাকে লঘুচিত্ত বিদূষকে পর্যবসিত করিয়াছিলাম এবং আমাদের দেশের

শ্রেষ্ঠসন্তান যে বুদ্ধ, তাঁহাকে তো সম্পূর্ণ ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। তিব্বতচীন কোরিয়াজাপান ইন্দোচীন যখন তথাগতের জন্মভূমি অভিমুখে ফিরিয়া ভক্তিভরে তাঁহার জীবনকথা আবৃত্তি করিত, তখন যে দেশে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল সেই ভারত তাঁহাকে একেবারেই বিস্মৃত হইয়াছিল। নেপাল-উপত্যকার অন্তরালে মহাযান-বৌদ্ধগ্রন্থগুলি বৃথাই রক্ষিত হইয়াছিল; বিদ্রোহ, বিদেশীর আক্রমণ ও পরাজয় উপেক্ষা করিয়া সিংহলদ্বীপ ভারতীয় সংস্কৃতভাষারই দুহিতা পালিভাষায় রচিত 'ত্রিপিটক' বৌদ্ধশাস্ত্র দুই সহস্র বৎসর ধরিয়া বৃথাই বিশ্বস্তভাবে রক্ষা করিয়াছিল; ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরুত্থানের পর যাঁহাকে ব্রাহ্মণেরা ধিক্কার করিয়াছিলেন, সেই বুদ্ধের নাম বিস্মৃতির অতলে ডুবিয়া গিয়াছিল, ভারতে কেহই তাহা জানিবার বা রক্ষা করিবার বিন্দুমাত্র প্রয়াস করে নাই।

একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণই বুদ্ধকে আমাদের কাছে প্রত্যর্পণ করিয়াছেন—বহু শ্রম যত্ন ও অর্থব্যয়ে শাস্ত্রগ্রন্থ শিলালিপি প্রভৃতির আবিষ্কার ও অর্থভেদ করিয়া ইঁহারাই ভারতের লুপ্তগৌরবকাহিনীর ইতিহাস পুনরুদ্ধার করিয়াছেন। পাশ্চাত্যের বহুপণ্ডিত কর্তৃক বৌদ্ধধর্ম বৌদ্ধসাহিত্য প্রভৃতি সম্বন্ধে বহু গবেষণাগ্রন্থ রচিত হইয়াছে।

কোনও প্রাচীন শাস্ত্রীয় বিষয়কেই আধুনিক দৃষ্টিতে পুরাপুরি গ্রহণ করা যায় না। সকল দেশের সকল ধর্মের শাস্ত্রেই কোন না কোনও মহাপুরুষ কালক্রমে ভক্তবর্গের নিকটে লোকোত্তর পদ ও ভগবান আখ্যা পাইয়া থাকেন, তাঁহাদের শিক্ষারও কোনও দিক উপেক্ষিত হয়, কোনও দিক বা শিষ্যপরম্পরা কর্তৃক বহুবর্ধিত হইয়া ভিন্নমূর্তি ধারণ করে। অন্যান্য ধর্ম শাস্ত্রের মত বৌদ্ধশাস্ত্রও নানা অলৌকিক ও অতিপ্রাকৃত বিষয়বহুল, বুদ্ধও ইহাতে চিত্রিত হইয়াছেন অতিমানবরূপে। আমরা কিন্তু শাস্ত্রীয় অতিপ্রাকৃত বর্ণনাবলীর অন্তরালে প্রচ্ছন্ন বাস্তব ও মানব বুদ্ধকেই বুঝিবার যথাসম্ভব চেষ্টা করিব।

বুদ্ধযুগের বাতাবরণ

কোনও বিষয় সম্যক্ বুঝিতে হইলে তাহার পারিপার্শ্বিকের ধারণা প্রয়োজন, নতুবা বস্তুর বাস্তবরূপ যথাযথ উপলব্ধি হয় না। সুতরাং বুদ্ধকে বুঝিতে হইলে তাঁহার সমসাময়িক কাল সম্বন্ধে কয়েকটি কথা স্মরণ করা আবশ্যক।

অতীতকে স্বর্ণবর্ণে রঞ্জিত করা মানুষের স্বভাব, ইহা মানুষের একটা প্রকৃতিগত দুর্বলতা, অতীতের গুণ গাহিয়া বোধহয় মানুষ বর্তমানের অভাব ও অপূর্ণতার পরিপূরণ করে এবং স্বমনোগত আদর্শাকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি-সাধন করে। সকলেই মনে করে এখন ঘোরকলি চলিতেছে, তাহার পূর্বে দ্বাপরত্রেতা উত্তরোত্তর ভাল ছিল এবং সত্যযুগে সবই ছিল অত্যুত্তম। কিন্তু কলিকাল যে কখন্ না ছিল তাহা তো দেখিতে পাওয়া যায় না—মনুসংহিতায় বলা হইয়াছে তখন কলিকাল চলিতেছে, গৌতম বশিষ্ঠ অশ্বলায়ন প্রভৃতির ধর্মসূত্রেও তাহাই দেখা যায় এবং বুদ্ধও তাঁহার যুগকে কলিই মনে করিতেন। বস্তুতঃপক্ষে সংসার সদাই পাপপুণ্যময়। পাপপুণ্য কদাচিৎ কিছু ন্যূনাধিক হইলেও অপাপবিদ্ধ পূর্ণপুণ্য বা পুণ্যহীন পাপমাত্র সংসারে দেখা যায় না, পৃথিবীর ইতিহাসও তাহার সাক্ষ্য দেয় না। সব যুগেই পুণ্যাপুণ্য থাকে, কালবশে অপুণ্যের অপ্রিয় স্মৃতি লুপ্ত হইয়া পুণ্যের প্রিয়স্মৃতি বলবতী হয়, তাই আমরা মনে করি অতীতে বুঝি শুধু পুণ্যই ছিল।

একদা ঐতিহাসিকরা এরূপ ধারণা করিতেন যেন বুদ্ধের যুগেই ভারত-ইতিহাসে সভ্যতার প্রথম আবির্ভাব হইয়াছিল। একালের ঐতিহাসিক জ্ঞানে ইহা ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়। বুদ্ধের প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব হইতেই ভারত সভ্যতামার্গে বহু উন্নত হইয়াছিল। বুদ্ধের যুগ ভারতীয় সভ্যতার ক্রমবিকাশ-ধারার উন্মেষকাল নহে, পরন্তু বহু বিবর্তনের পর পুনরায় আরও একটি পর্যায়-মাত্র। বুদ্ধের যুগে ভোগ লালসা প্রভৃতির কিছুমাত্র অভাব ছিল না, ঐহিক বৈভব-সামগ্রীরও ত্রুটি ছিল না। লৌকিক জ্ঞান ও শিক্ষা প্রভৃতিরও প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছিল।

রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে সমগ্র দেশ তখন বহু ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিল এবং এই রাজ্যগুলির মধ্যে প্রায়ই যুদ্ধবিগ্রহ ঘটিত। যে ভূভাগ পরে বুদ্ধের কর্মক্ষেত্র হয়, সেখানে গঙ্গার দক্ষিণকূলে মগধরাজ্যই প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, রাজা বিম্বিসার তখন মগধের রাজা ছিলেন এবং গিরিব্রজ বা রাজগৃহ নগর তাঁহার রাজধানী ছিল। মগধের উত্তরপূর্বস্থ অঙ্গরাজ্য তখন মগধের অধীন হইয়াছিল। গঙ্গার উত্তরকূলে কোশলরাজ্যেরই তখন প্রাধান্য। প্রসেনজিৎ তখন কোশলের রাজা, শ্রাবস্তী তাঁহার রাজধানী ছিল এবং প্রাচীন কাশীরাজ্য তখন কোশলের অঙ্গীভূত হইয়াছিল। কাশীর পশ্চিমে ছিল কৌশাম্বীরাজ্য,

ইহা পরে অবন্তীরাজ চণ্ডপ্রদ্যোত কর্তৃক অধিকৃত হয়। গঙ্গার উত্তরকূলে বৈশালীরাজ্য লিচ্ছবিবংশীয় ক্ষত্রিয়গণের অধিকারে ছিল। বৈশালী মল্ল শাক্য প্রভৃতি রাজ্যে ক্ষত্রিয়গণ মিলিতভাবে রাজ্যশাসন করিতেন।

বুদ্ধযুগের ধর্মদার্শনিক পরিবেশ

বুদ্ধের যুগে জনসাধারণের মধ্যে বৈদিকব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিশেষ প্রভাব ছিল। এই যাগযজ্ঞ-ক্রিয়াকাণ্ডময় পুরোহিত-তন্ত্রে ব্রহ্মাদি দেবতাগণের উপাসনা ও তাঁহাদের প্রসাদে পরলোকে স্বর্গসুখ লাভ ছিল প্রধান কাম্য। সাধারণ লোকাচারে আবার যাগযজ্ঞ ব্যতীত বহু প্রকার মন্ত্র 'তুক্‌তাক্' প্রভৃতির প্রচলন ছিল। শিক্ষিত চিন্তাশীল সমাজে কিন্তু এই ধর্মে সকলের পরিতৃপ্তি হয় নাই, লোকে সত্যানুসন্ধানে অন্য নানা পথের আশ্রয় গ্রহণ করিত। এ বিষয়ে ক্ষত্রিয়গণ অগ্রণী ছিলেন; বোধহয় বিষয়ভোগে পরিতৃপ্ত হইয়া তাঁহাদের স্বভাববলিষ্ঠ প্রকৃতি গতানুগতিক ধর্মপথে সন্তোষ লাভ করে নাই। এ সম্পর্কে ইহাও স্মরণীয় যে বৈদিক ধর্ম ভারতে আসিবার বহু পূর্বেই ভারতে সম্ভবত ধর্মদার্শনিক চিন্তার আরম্ভ হইয়াছিল।

উপনিষদের অধ্যাত্মজিজ্ঞাসার বিবরণে দেখা যায় যে সে যুগে ক্ষত্রিয়দের মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের প্রচেষ্টা চলিতেছিল এবং ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়দের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া এই নবরহস্য ও গুপ্ততত্ত্ব অধিগম করিবার চেষ্টা করিতেন। উপনিষদ্-চিন্তার সার হইতেছে মানুষের দেহমনের অন্তরালে এক অবিনাশী জ্ঞানময় আনন্দস্বরূপ আত্মার অস্তিত্বোপলব্ধি এবং বিশ্বের সবের মূলে এক পরমাত্মা বা ব্রহ্মের অনুভূতি। চিন্তাশীলগণের মধ্যে এই তত্ত্ব যখন প্রসারিত ও গৃহীত হইতে আরম্ভ করিল তখন বৈদিক ব্রাহ্মণগণও ইহাকে স্বীকার না করিয়া পারিলেন না, কিন্তু এই স্বীকৃতি ছিল নামমাত্রেই—বৈদিক সাহিত্যের পরিশিষ্টরূপে উপনিষদের চিন্তা ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্রে স্থানলাভ করিল বটে কিন্তু আত্মা ও ব্রহ্মের নূতন নামাঙ্কনের আবরণে প্রাচীন ক্রিয়াকাণ্ডই বলবান রহিল। উপনিষদ্-চিন্তাধারার পূর্ণ পরিণতি হইয়াছিল কিন্তু সম্ভবত বুদ্ধের পরবর্তী কালে; ঠিক বুদ্ধের যুগে ঔপনিষদিক চিন্তা শৈশবাবস্থায়ই ছিল মনে হয়।

বৈদিকধর্মের সম্পূর্ণ বহির্ভূত, এমন কি বেদবিরোধী মতবাদও সে যুগে অনেক ছিল। এই মতবাদগুলি প্রচারিত হইয়াছিল প্রধানতঃ

পরিব্রাজক সন্ন্যাসীসম্প্রদায়গুলির মধ্যে। ইহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল নির্গ্রন্থ (বা জৈন) সম্প্রদায়, যাঁহারা 'গ্রন্থি' (বা বন্ধন)-হীনতার সাধক ছিলেন। এই মতের আরম্ভ হইয়াছিল সুপ্রাচীন কালে মনে হয়। বুদ্ধের প্রায় আড়াই শত বৎসর পূর্বে কাশীনগরীর পার্শ্বনাথ এই মতের সমধিক প্রচার করেন। বুদ্ধের যুগে বৈশালীনগরীর জ্ঞাতৃবংশজাত মহাবীর এই সম্প্রদায়ের সংস্কারক ও শক্তিমান প্রচারক ছিলেন। পার্শ্ব ও মহাবীর উভয়েই ক্ষত্রিয়বংশোদ্ভব ছিলেন। মহাবীর বুদ্ধের কিছু বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন এবং বুদ্ধের পূর্বেই প্রচারজীবন আরম্ভ করেন। ব্রাহ্মণেতর সম্প্রদায়গুলির মধ্যে প্রধানতঃ নির্গ্রন্থগণের সহিতই বুদ্ধের শিক্ষাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হইয়াছিল। নির্গ্রন্থমতের প্রধান শিক্ষা ছিল অবিনাশী আত্মায় ও অবিনাশী পুদ্গলে (যাবতীয় জড়বস্তুর মৌলিক স্থূল-উপাদান) বিশ্বাস। আত্মার প্রধান লক্ষণ হইতেছে চেতনা। আত্মা (বা জীব) ও পুদ্গল উভয়ই গতিশীল; আত্মার স্বভাবগতি ঊর্ধ্বমুখ, পুদ্গলের স্বভাবগতি অধোমুখ। আত্মা অরূপী হইলেও দেহানুযায়ী আয়তনবান। পুদ্গলের সহিত বন্ধনই জীবের সংসার-ভ্রমণের কারণ, এই বন্ধন হইতে মুক্তিই মোক্ষ। জীবের পুদ্গলবন্ধনের কারণ হইতেছে কর্ম; কর্মত্যাগ ও কৃচ্ছ্রসাধনদ্বারা পূর্বজন্মার্জিত কর্মনাশ হইতেছে মোক্ষলাভের উপায়। মহাবীরের শিক্ষায় পুরুষকার অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিল। জীব নিজেই তাহার শুভাশুভ-বিধাতা। পাপকর্মের কুফল ও পুণ্যকর্মের সুফল জৈনধর্মের বড় শিক্ষা, জীবের সমুদায় ভাগ্য তাহার স্বকৃত শুভাশুভ কর্মেরই ফল। পরমাত্মা ঈশ্বর বা ভগবান প্রভৃতির কোনও প্রয়োজনীয়তা বা অস্তিত্বের উল্লেখ প্রাচীন জৈনশাস্ত্রে নাই। মহাবীর নগ্নতাবাদী ছিলেন।

আর একটি অবৈদিক সম্প্রদায় ছিল আজীবিকবাদ। মংখলীপুত্র গোশাল ছিলেন ইহার নেতা। গোশাল মহাবীরের সমসাময়িক হইলেও মহাবীরের পূর্বেই প্রচার আরম্ভ করেন। গোশালও নগ্নতা ও আত্মায় বিশ্বাসী ছিলেন কিন্তু তাঁহার শিক্ষায় পুরুষকারের কোনও স্থান ছিল না, কারণ জীবের পূর্ব-নিয়ন্ত্রিত ভাগ্যে বিশ্বাস তাঁহার মতের একটি প্রধান অঙ্গ ছিল।

অজিত কেশকম্বলী (বোধহয় লোমশ-শরীরবশতঃ অথবা বিশিষ্ট রকমের মোটা কম্বল ব্যবহার করিতেন বলিয়া ইনি এই নাম পাইয়াছিলেন),

সঞ্জয় বৈরাটীপুত্র, ককুদ্ কাত্যায়ন (বোধহয় ইনি কুব্জপৃষ্ঠ ছিলেন) প্রভৃতি আরও কয়েকজন প্রধান দার্শনিক-মতপ্রচারকের নাম বুদ্ধের সমসাময়িকরূপে উল্লিখিত আছে। মোটকথা সেই যুগে আধ্যাত্মিক সত্য ও দার্শনিক তত্ত্বের অনুসন্ধানে শিক্ষিত সমাজে প্রবল ব্যগ্রতাবোধ জাগিয়াছিল, বিভিন্ন মত-পোষকদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতাও দেখা যাইত। এক মতাবলম্বীরা অন্য মতাবলম্বীগণকে স্বদলভুক্ত কবিবার চেষ্টা করিতেন, ইহা লইয়া বাদবিসম্বাদও হইত। অগ্নি-উপাসক, জলবাসী ও নানা অদ্ভুত-ক্রিয়াশীল বিবিধ ধর্ম-সম্প্রদায়েরও উল্লেখ পাওয়া যায়।

বৌদ্ধশাস্ত্রের বিবরণ

বৌদ্ধ ধর্মের দুইটি প্রধান শাখা হীনযান ও মহাযান। হীনযান বা থের (স্থবির)-বাদ শাস্ত্রের অংশবিশেষই সর্বপ্রাচীন। থেরবাদী শাস্ত্র পালি-ভাষায় লিখিত। তিনটি 'পিটক' বা ঝুড়িতে অর্থাৎ তিনটি অংশে বিভক্ত বলিয়া ইহার নাম 'ত্রিপিটক' এবং সেই তিনটি ভাগ হইতেছে সুত্তপিটক (সূত্র°), বিনয়পিটক এবং অভিধম্মপিটক (অভিধর্ম°)।

সুত্তপিটক—এই অংশে বহু ব্যক্তির সহিত বুদ্ধের ধর্মবিষয়ক কথোপ-কথনের বিশদ বর্ণনা আছে। পালি 'সুত্ত' শব্দতঃ=সংস্কৃত 'সূত্র' হইলেও উভয়ে প্রভেদ আছে। সংস্কৃতে 'সূত্রে'র অর্থ অল্প কয়েকটি শব্দের দ্বারা কোনও বিষয়ের প্রকাশ কিন্তু পালিতে যাহাকে 'সুত্ত' বলা হয় তাহা এক একটি বিস্তৃত বিবরণ। সুত্তপিটক পাঁচটি 'নিকায়' অর্থাৎ নিচয় বা শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা দীঘনিকায় মজ্ঝিমনিকায় সংযুত্তনিকায় অঙ্গুত্তরনিকায় ও খুদ্দক-নিকায়। দীঘ মজ্ঝিম ও সংযুত্ত-নিকায় বিবিধ 'বগ্‌গে' বিভক্ত এবং প্রত্যেক বগ্‌গ (বর্গ) দশ হইতে পনরটি পর্যন্ত সুত্তের সমষ্টি। অঙ্গুত্তরনিকায় এগারটি 'নিপাতে' বিভক্ত, প্রতি নিপাতে কয়েকটি বগ্‌গ ও প্রতি বগ্‌গে দশ বা অধিক সুত্ত আছে। খুদ্দকনিকায় পনরটি বিভিন্ন গ্রন্থের সমষ্টি, তাহার মধ্যে পাঁচটি গ্রন্থ হইতেছে ধম্মপদ সুত্তনিপাত থেরগাথা থেরীগাথা ও জাতক। বৌদ্ধদের পক্ষে ধম্মপদ, হিন্দুর পক্ষে ভগবদ্‌গীতার তুল্য। সুত্তনিপাতকে আধুনিক পণ্ডিতগণ সমগ্র ত্রিপিটকের মধ্যে প্রাচীনতম রচনা মনে করেন।

বিনয়পিটক—ইহাতে সংঘবিষয়ক নিয়মাবলীর ইতিহাস ও বিবরণ আছে। ইহা সুত্তবিভঙ্গ মহাবগ্‌গ চুল্লবগ্‌গ ও পরিবার, এই চার ভাগে বিভক্ত।

অভিধম্মপিটক—ইহার বিষয়বস্তু হইতেছে সুত্তপিটক-বর্ণিত বিষয়গুলির দীর্ঘতর আলোচনা ও শ্রেণীবিভাগ। ইহাতে দার্শনিক বিচার ও তর্কদ্বারা বুদ্ধের শিক্ষা প্রসারিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ইহা সাতখানি বিভিন্ন গ্রন্থে বিভক্ত।

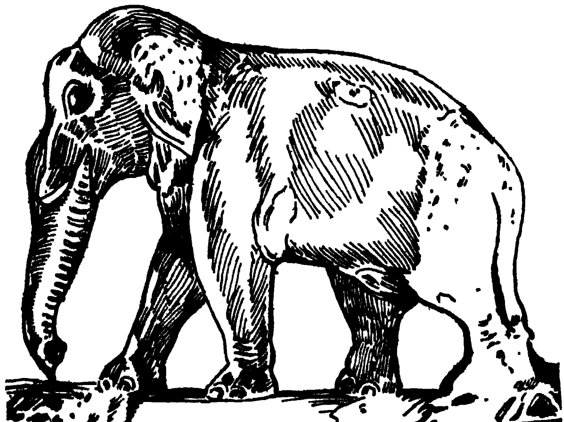
অন্যান্য ধর্মের শাস্ত্র যেমন, বৌদ্ধশাস্ত্রও তেমনি এককালে একজনের দ্বারা লিখিত হয় নাই। বুদ্ধের দেহত্যাগের অল্পদিন পরেই প্রবীণ শিষ্যগণ তাঁহার উপদেশ ও শিক্ষাবলী আবৃত্তি করিবার উদ্দেশ্যে রাজগৃহের সপ্তপর্ণী-গুহায় স্থবির মহাকাশ্যপের নেতৃত্বে মিলিত হন। এই সম্মেলন সংঘ-ইতিহাসে প্রথম ধর্মসঙ্গীতি (First Buddhist Council) নামে পরিচিত। এই সময় হইতে বুদ্ধের বাণী সংগৃহীত ও মুখে মুখে বিস্তার হইতে আরম্ভ হয়। মগধরাজ কালাশোকের রাজত্বকালে (বুদ্ধনির্বাণের প্রায় একশত বৎসর পরে, অনুমান খ্রী. পূ. ৩৮৩) বৈশালীতে সংঘের দ্বিতীয় সম্মেলন হয়। সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে, অনুমান খ্রী. পূ. ২৪৭, পাটলিপুত্রে তৃতীয় সম্মেলন হয়। ইতিমধ্যে বুদ্ধবাণীর অংশবিশেষ সম্ভবতঃ বিধিবদ্ধাকারে লিখিতও হইয়াছিল। সংঘের মধ্যে ধর্ম, দার্শনিক মত, আচার প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে বহু মতভেদ বাড়িতে বাড়িতে অবশেষে সম্রাট কণিষ্কের রাজত্বকালে, অনুমান খ্রী. ১ শতকে, পঞ্জাব অথবা কাশ্মীরের কোনও স্থানে চতুর্থ সম্মেলনের পর সংঘ মহাযান ও হীনযান, এই দুই প্রধান শাখায় পুরাপুরি বিভক্ত হইয়া যায়।

ত্রিপিটক গ্রন্থগুলির বিস্তৃত টীকা-সাহিত্যও রচিত হয়। বিখ্যাত টীকাকার বুদ্ধঘোষ সম্ভবতঃ খ্রী. ৫ শতকের লোক, তাঁহার জন্মস্থান ছিল মগধে।

খ্রীষ্টপর প্রথম কয়েক শতকের মধ্যে সংস্কৃতভাষায় রচিত অষ্টসাহস্রিকা-প্রজ্ঞাপারমিতা, সদ্ধর্মপুণ্ডরীক, লংকাবতার প্রভৃতি গ্রন্থকে মহাযানিকগণ প্রামাণিক শাস্ত্র মনে করেন।

ত্রিপিটক-শাস্ত্রগ্রন্থগুলি, তাহার টীকাদি এবং মহাযানিক গ্রন্থগুলিতে বুদ্ধের জীবন সম্বন্ধে বহু তথ্যের উল্লেখ আছে। ইহাই বুদ্ধজীবনীর মূল উপাদান। ললিতবিস্তর, কবি অশ্বঘোষ-রচিত বুদ্ধচরিত, এবং পরবর্তী কালে রচিত জাতকনিদানকথা ও জিনচরিত প্রভৃতি গ্রন্থেও বুদ্ধজীবন-সম্পৃক্ত অনেক

ঘটনাবলীর উল্লেখ আছে। সিংহলের দীপবংস ও মহাবংস নামক গ্রন্থদ্বয়ে সংঘের ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক বিবরণ আছে। এই গ্রন্থদ্বয় খ্রী. ৫ শতকের পরে রচিত। খ্রী. ১ হইতে ১১ শতকের মধ্যে অনেক চীনা বৌদ্ধ পণ্ডিত তীর্থ-ভ্রমণ ও নালন্দা প্রভৃতি মহাবিহারে শাস্ত্রাধ্যয়নের জন্য ভারতে আসিয়াছিলেন এবং ভারতীয় বৌদ্ধপণ্ডিতগণেরও অনেকে ধর্মপ্রচারের জন্য চীনদেশে গিয়াছিলেন। ইঁহাদের সম্মিলিত প্রয়াসে বহু মহাযান-বৌদ্ধগ্রন্থ ও অন্যান্য বিখ্যাত অনেক সংস্কৃতগ্রন্থ চীনা ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। তিব্বত ও ভারতের মধ্যেও বৌদ্ধ পণ্ডিতগণের এইরূপ সহযোগ চলিয়াছিল খ্রী. ৮ হইতে ১৩ শতক পর্যন্ত। তিব্বতী পণ্ডিতেরা নালন্দা বিক্রমশিলা ও উদ্দণ্ডপুর (বা ওদন্তপুরী) প্রভৃতি স্থানের মহাবিহারে অধ্যয়নার্থে আসিতেন এবং ভারতীয় পণ্ডিতেরাও অনেকে তিব্বতে গিয়াছিলেন। চীনা ও তিব্বতীতে যত ভারতীয় গ্রন্থ অনূদিত হইয়াছিল তাহার মূল সংস্কৃত গ্রন্থগুলির অনেক লুপ্ত হইয়া গিয়াছে কিন্তু তিব্বতী ও চীনা অনুবাদ হইতে আধুনিক পণ্ডিতগণ সেই লুপ্ত সংস্কৃত মূলগ্রন্থগুলির কতিপয়ের আদি কলেবর পুনর্গঠন করিতে পারিয়াছেন। এই গ্রন্থসমূহেও বৌদ্ধধর্মবিষয়ক অনেক ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়। শাস্ত্রাদি অন্য গ্রন্থাবলীর মত এই গ্রন্থগুলির বিবরণাদিও নির্বিচারে সর্বদা গ্রহণীয় বা বিশ্বাস্য নহে।



সারনাথ অশোকস্তম্ভগাত্রের হস্তীমূর্তি

২

মহানিষ্ক্রমণ ও বোধিলাভ

অনুমান খ্রী. পূ. ৫৬৩ বুদ্ধের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা শুদ্ধোদন গৌতমগোত্রীয় ও শাক্যবংশীয় ছিলেন। কপিলবাস্তু নগরে (বর্তমানে নেপালের অন্তর্গত) শাক্যদের বাসস্থান ছিল। শাক্যরা আর্যজাতি ছিলেন কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে; সম্ভবতঃ তাঁহারা পার্বত্য মঙ্গোলীয় জাতীয় ছিলেন এবং পূর্বপুরুষ যুদ্ধব্যবসায়ী ছিলেন বলিয়া ব্রাহ্মণ্যসমাজে ক্ষত্রিয় নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। প্রাচীন ভারতে অনেক অনার্য জাতীয় নিম্নশ্রেণীর লোক যেমন শূদ্র নামে ব্রাহ্মণ্য সমাজে পরিগণিত হইয়াছিল, সেইরূপ যোদ্ধারা ক্ষত্রিয় নামে এবং বণিকেরা বৈশ্য নামে ব্রাহ্মণ্য সমাজে পরিচিত হইতেন। সেই কালের প্রচলিত প্রথানুসারে কুলপুরোহিত ব্রাহ্মণ যে গোত্রের হইতেন, ইঁহাদেরও সেই গোত্র হইত।

পরবর্তী কালের বৌদ্ধ লেখকেরা কপিলবাস্তুকে বিশাল রাজ্য ও শুদ্ধোদনকে মহাপ্রতাপশালী বহু-ঐশ্বর্যবান রাজারূপে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা ঠিক নহে। প্রাচীন বৌদ্ধশাস্ত্রে কোনও লোকের কথা বলিতে হইলে তাহার উপাধি-পদবী এবং সে ব্যক্তিকে অপরে কি বলিয়া সম্বোধন করিত প্রভৃতি যথাযথ ভাবে উল্লিখিত হইত। প্রাচীন পালিশাস্ত্রে শুদ্ধোদনকে কোথাও রাজা বলা হয় নাই, মাত্র 'শাক্য শুদ্ধোদন' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। বস্তুতঃপক্ষে শুদ্ধোদন ভূস্বামী এবং সেহেতু যুগরীতিতে ছোটখাট রাজাবিশেষ ছিলেন। শুদ্ধোদনের জমিতে ভাল ধান জন্মিত, কেহ বলেন এই জন্যই তাঁহার নাম 'শুদ্ধ-ওদন' হইয়াছিল। অনেক পালি বর্ণনা ও গল্পে কপিলবাস্তুর ধান্যসমৃদ্ধি ও শাক্যদের ধান্যক্ষেত্রের উল্লেখ দেখা যায়। শাক্যরা কার্যতঃ স্বাধীন হইলেও নামে কোশলের অধীন ছিল। একটি প্রাচীন পালি সুত্তে বুদ্ধ নিজেকে 'কোশলের লোক' বলিয়াছেন; কোশলের রাজাও একবার বুদ্ধকে বলিয়াছিলেন "ভদন্ত, ভগবানও ক্ষত্রিয়, আমিও ক্ষত্রিয়; ভগবানও কোশলের লোক, আমিও কোশলের লোক।"

অমাবস্থায় অথবা তাহার দুই একদিন পূর্বে বা পরে। যদি তাঁহার জন্মকালে পূর্ণিমাও ঘটিয়া থাকে এবং চন্দ্রের বৃষরাশিতেও অবস্থিতি হইয়া থাকে, তবে তাহা ঘটিয়াছিল অগ্রহায়ণ মাসে, জ্যৈষ্ঠে নহে। যদি তিনি বৈশাখমাসে কিন্তু চন্দ্রের বৃষরাশিতে অবস্থানকালে জন্মিয়া থাকেন, তবে তাহা ঘটিয়াছিল শুক্লা প্রতিপদ বা দ্বিতীয়া-তৃতীয়ায়, পূর্ণিমায় নহে। এই সকল বিবেচনা করিলে মনে হয় বুদ্ধের জন্মরাশি যদি রবির নহে, চন্দ্রের অবস্থিতি অনুসারে গণিত হইয়া থাকে, তবে তিনি বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠে যদিও জন্মিয়া থাকেন, পূর্ণিমায় জন্মেন নাই। বৈশাখীপূর্ণিমা প্রসিদ্ধ সুদিবস বলিয়া পরে তাহাই হয়তো তাঁহার জন্মদিবস বলিয়া কল্পিত হইয়াছিল, যেমন যীশুখ্রীষ্টের জন্ম বস্তুতঃপক্ষে ২৫শে ডিসেম্বরে না ঘটিলেও পরে তাহা রবির উত্তরায়ণারম্ভকালীন প্রসিদ্ধ উৎসবের সহিত একীকৃত হইয়াছিল। আরও একটি কথা, বুদ্ধের রাশিপরিচয় রবি বা চন্দ্রের অবস্থিতি হইতে না হইয়া, জ্যোতিষীগণ যাহাকে "লগ্ন" বলেন তাহা হইতেও হইয়া থাকিতে পারে। "লগ্নের" অর্থ জন্মমুহূর্তে পূর্বদিগন্তে যে রাশির অবস্থিতি হয়, ইহার স্থায়িত্ব প্রায় দুই ঘণ্টা এবং ইহা বিভিন্ন মাসে বিভিন্ন সময়ে হয়। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠে জাত ব্যক্তির জন্মলগ্ন যদি বৃষরাশিতে হয় তবে বুঝিতে হইবে জন্ম হইয়াছিল অতি পূর্বাহ্ণে, কিন্তু অন্যান্য মাসে জন্ম হইলে বৃষলগ্ন অন্যান্য সময়ে ঘটে।

পুত্রসন্তানের জন্মে মাতাপিতার মনস্কামনা পূর্ণ হইয়াছিল বলিয়া নবজাতকের নাম সিদ্ধার্থ রাখা হইল। শিশুর ভাগ্যনির্ণয়ের জন্য আবার জ্যোতিষীদের ডাকা হইলে তাঁহারা শিশুর দেহে অনেক শুভলক্ষণ দেখিলেন ও তাহার মহাপুরুষত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ মত প্রকাশ করিয়া তাহার সংসারত্যাগ ও সন্ন্যাসগ্রহণের গুরু সম্ভাবনা জানাইলেন—এরূপ বর্ণিত আছে। জ্যোতিষশাস্ত্রানুসারে এরূপ ভবিষ্যদ্বাণী হয়তো অসম্ভব নহে, কিন্তু এরূপও হইতে পারে যে বুদ্ধজীবনের ঘটনা জানা ছিল বলিয়াই পরবর্তীকালের বর্ণনাকাররা পূর্বের ভবিষ্যদ্বাণীরূপে ইহার উল্লেখ করিতে পারিয়াছিলেন। সিদ্ধার্থের জন্মের "সাতদিন" (অর্থাৎ কিছুদিন) পরে মায়াদেবীর মৃত্যু হইল। মায়াদেবীর ভগিনী (শুদ্ধোদনের অন্যতমা পত্নী) শিশুর পালনভার লইলেন। ইঁহার নাম কি ছিল জানা যায় না, শাস্ত্রে ইঁহাকে "মহাপ্রজাবতী গৌতমী"

বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে কারণ ইনি বুদ্ধের মত বিখ্যাত প্রজা অর্থাৎ সন্তানকে পালন করিয়াছিলেন।

সিদ্ধার্থের বাল্যজীবনের কথা বিশেষ জানিতে পারা যায় না। ভক্ত লেখকরা যে সকল কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে মনে হয় সিদ্ধার্থ মেধাবী বালক ছিলেন, কুলপুরোহিত ব্রাহ্মণের কাছে লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন ও বিদ্যালাভে তৎপরতা দেখাইয়াছিলেন। সিদ্ধার্থের স্বভাবে কিন্তু বালসুলভ চপলতা ছিল না, সমবয়সীদের খেলাধূলায় তিনি বিশেষ মাতিতেন না। তাঁহার প্রকৃতিতে ধীরতা ও ভাবুকতা দেখা যাইত। তিনি কখন কখনও নির্জনে বসিয়া অন্যমনা হইয়া কি যেন ভাবিতেন। শুদ্ধোদনের ভ্রাতুষ্পুত্র দেবদত্ত সিদ্ধার্থের সমবয়সী ছিলেন। দেবদত্ত একবার তীরবিদ্ধ করিয়া একটি হাঁসকে ভূপাতিত করিলে সিদ্ধার্থ শুশ্রূষা করিয়া এই আহত পক্ষীর প্রাণ বাঁচাইয়াছিলেন। হাঁসটি কাহার ইহা লইয়া পরে উভয়ের বিবাদ হয়, দেবদত্ত বলিলেন "আমি তীর মারিয়া ইহাকে মাটিতে ফেলিয়াছি, ইহা আমার", সিদ্ধার্থ বলিলেন "আমি শুশ্রূষা করিয়া ইহাকে বাঁচাইয়াছি, ইহা আমার।" পুরোহিতের কাছে উভয়ে বিবাদনিষ্পত্তির জন্য গেলে পুরোহিত হাঁস সিদ্ধার্থেরই প্রাপ্য বলিলেন। এই ঘটনাটি ভাবী বুদ্ধের মনোবৃত্তির সুন্দর নিদর্শন।

সিদ্ধার্থ একবার সঙ্গীদের সঙ্গে নগরের বাহিরে বেড়াইতে গিয়াছিলেন ; সঙ্গীরা খেলাধূলায় লাগিয়া গেল কিন্তু সিদ্ধার্থ কাহাকেও কিছু না বলিয়া বনের মধ্যে চলিয়া গেলেন। সঙ্গীরা ফিরিয়া আসিলে সিদ্ধার্থকে দেখিতে পাওয়া গেল না। শুদ্ধোদন খুঁজিতে বাহির হইয়া সিদ্ধার্থকে নির্জন বনে একটি গাছের নীচে চিন্তামগ্ন হইয়া উপবিষ্ট দেখিতে পাইয়াছিলেন। আর একবার সিদ্ধার্থ পিতার সঙ্গে জমিজমা চাষবাস দেখিতে গিয়াছিলেন। শুদ্ধোদন যখন কৃষিকার্য পরিদর্শন করিয়া বেড়াইতেছিলেন তখন সিদ্ধার্থ একটি জাম গাছের নীচে বসিয়া কি যেন ভাবিতে ভাবিতে আত্মবিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলেন। পরজীবনে বুদ্ধ শিষ্যদের নিকট স্বয়ং এই ঘটনাটির উল্লেখ করিয়াছিলেন।

ধনীসন্তান বলিয়াই হউক অথবা বৌদ্ধ লেখকেরা যেমন বলিয়াছেন, সিদ্ধার্থের সংসারত্যাগ সম্বন্ধে জ্যোতিষীদের ভবিষ্যদ্‌বাণীর ফলে শুদ্ধোদনের নিজের ইচ্ছায়ই হউক, সিদ্ধার্থ বিলাসে পালিত হইয়াছিলেন। শুদ্ধোদন পুত্রকে

তিনটি বাড়ী বানাইয়া দিয়াছিলেন, একটি গ্রীষ্মকালের জন্য, একটি বর্ষাকালের জন্য ও একটি শীতকালের জন্য। প্রত্যেক বাড়ীতেই উদ্যান ও পদ্মপুষ্করিণী ছিল। সিদ্ধার্থ সর্বদাই নৃত্যগীতবাদ্যনিপুণা সুন্দরী ললনাগণ-পরিবৃত হইয়া থাকিতেন, বর্ষাকালে দোতলা হইতে নামিতেন না—এসব কথাও বুদ্ধ পরে নিজেই বলিয়াছিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া যে তিনি অপটু অথবা দুর্বল ছিলেন তাহা নহে। তাঁহার বিবাহের পূর্বে একবার কথা উঠিয়াছিল যে তিনি অন্তঃপুরে কামিনীকুলসংসর্গে কাল কাটাইয়া পুরুষোচিত শিক্ষা পান নাই। ইহার উত্তরে সিদ্ধার্থ শাক্যদের সম্মুখে নিজের ক্ষত্রিয়কুমারোচিত শৌর্যবীর্যের পরিচয় দিয়া জয়লাভ করিয়াছিলেন। এই সময়ে তাঁহার চড়িবার জন্য একটি হস্তী আনা হইতেছিল, কিন্তু ঈর্ষাকাতর দেবদত্ত ইহা সহিতে না পারিয়া হাতিটিকে বধ করিয়াছিলেন। এইসব কাহিনী কতদূর বিশ্বাস্য ঠিক বলা যায় না।

যথাসময়ে সিদ্ধার্থের বিবাহ হইল। সিদ্ধার্থের অসাংসারিক ভাবগতি দেখিয়া—জ্যোতিষীদের ভবিষ্যদ্‌বাণী থাকুক বা না থাকুক—গুরুজনেরা শুদ্ধোদনকে পুত্রের বিবাহ দিতে অনুরোধ করেন, এইরূপ বর্ণিত আছে। সিদ্ধার্থের বিবাহ সম্বন্ধে বিভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্ন বিবরণ আছে। কেহ বলেন গুরুজনেরা শুদ্ধোদনের অনুরোধে সিদ্ধার্থকে বিবাহ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে সিদ্ধার্থ বিবেচনার জন্য সময় প্রার্থনা করিয়া পরে জানান যে উচ্চমনা ও নম্র প্রকৃতির কন্যা হইলে তিনি বিবাহ করিতে প্রস্তুত আছেন। কেহ বলেন ভাবী পত্নীতে কি কি গুণ প্রত্যাশা করেন তাহার একটি তালিকা গুরুজনদের হাতে দিয়া সিদ্ধার্থ তাঁহাদের কন্যা নির্বাচন করিতে বলেন। কেহ বলেন সমবেতা শাক্যকুমারীদের মধ্য হইতে সিদ্ধার্থ স্বয়ং এক তরুণীকে পত্নীরূপে মনোনীতা করেন।

তাঁহার পত্নীর নাম কি ছিল জানা যায় না। পালিশাস্ত্রে তাঁহাকে পুত্রের নামানুসারে 'রাহুল-মাতা' বলিয়া কদাচিৎ উল্লেখ করা হইয়াছে, পালিশাস্ত্র বুদ্ধের পত্নী সম্বন্ধে প্রায় নীরব। সংস্কৃত তিব্বতী সিংহলী প্রভৃতি গ্রন্থে সিদ্ধার্থের পত্নীর বিভিন্ন নাম পাওয়া যায়, যথা গোপা যশোধরা উৎপলবর্ণা ভদ্রা বিম্বা ইত্যাদি। বিবাহের একাধিক বিবরণ ও পত্নীর বিভিন্ন নাম হইতে মনে হয় সিদ্ধার্থের একসঙ্গে বা ক্রমে ক্রমে একাধিক কন্যার সঙ্গে হয়তো বা বিবাহ হইয়া থাকিতে পারে। সেযুগে ধনীপুত্রের একাধিক বিবাহ

হওয়াই সাধারণ প্রথা ছিল; ক্ষত্রিয়কুমারদের একই দিনে বহুকন্যার সহিত বিবাহ হইত। পত্নীর সহিত তাহার কতিপয় ভগিনী এবং আরও অনেক কুমারী, সখী সহচরী বা পরিচারিকারূপে পতিগৃহে গিয়া সহপত্নীরূপে বাস করার প্রথাও সেযুগে প্রচলিত ছিল, যদিও প্রধানা পত্নী একজনই হইতেন। সিদ্ধার্থপত্নীর যে সকল নাম পাওয়া যায় তাহা সবই পরে কল্পিতও হইতে পারে। বিবাহিতা পত্নী ব্যতীত সিদ্ধার্থকে বিলাসে ভুলাইয়া রাখিবার জন্য শুদ্ধোদন কর্তৃক অনেক সুন্দরী ও নৃত্যগীতকুশলা কামিনী নিয়োগের কথাও অনেক গ্রন্থে আছে। 'রাহুল-মাতা' কোনও মতে সিদ্ধার্থের মাতুলকন্যা এবং কোনও মতে পিতৃব্যকন্যা ছিলেন, কোনও মতে তিনি দেবদত্তের সহোদরা ভগ্নী ছিলেন এবং তাঁহার পিতার নাম ছিল সুপ্রবুদ্ধ, আবার কেহ বলেন তিনি অমিতোদন বা অমৃতোদন নামক শুদ্ধোদনের অপর এক ভ্রাতার কন্যা ছিলেন। পিতৃব্যকন্যা বা মাতুলকন্যা বিবাহ সে যুগে প্রচলিত ছিল। জৈনগুরু মহাবীরের ভাগিনেয় জমালিও মহাবীরের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

সিদ্ধার্থের মনে সুখ ছিল না। জ্যোতিষীরা বলিয়াছিলেন সিদ্ধার্থ জরা ব্যাধি মৃত্যু ও সন্ন্যাসী দেখিয়া সংসার ত্যাগ করিবেন, তাই শুদ্ধোদন পাহারা বসাইয়া সিদ্ধার্থের দৃষ্টিতে এই চারিটি বিষয় আসা নিবারণ করিলেন, অবশেষে প্রমোদ-উদ্যানে যাইবার পথে দৈবাৎ এগুলি দেখিয়া এবং সারথিকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া সিদ্ধার্থের সংসারবৈরাগ্য উপস্থিত হইল—এসব কথা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য। সিদ্ধার্থের মত বুদ্ধিমান ব্যক্তি প্রায় ত্রিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত জরা কি, ব্যাধি কি, মৃত্যু কাহাকে বলে এসব জানিতেন না, একথায় কোনও কাণ্ডজ্ঞানবান ব্যক্তির আস্থা হইবে না। শিক্ষাগুরুর কাছে, বয়স্যদের কাছে, কপিলবাস্তু নগরের দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে তিনি কি কখনও এগুলির কথা শুনিলেন না বা স্বচক্ষে দেখিলেন না? শুদ্ধোদনের বৃহৎ পরিবারে ত্রিশ বৎসরের মধ্যে আত্মীয়স্বজন দাসদাসীদের মধ্যে কি একটা লোকও বুড়া হয় নাই, একটা লোকও অসুস্থ হয় নাই বা একটা লোকেরও মৃত্যু হয় নাই? তাঁহার পরবর্তী কালের বাক্যাবলী ও আচরণ হইতে বেশ বুঝা যায় যে, সাংসারিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বুদ্ধের যথেষ্টই ছিল; ইহা কি তিনি সংসারত্যাগের পর তপস্যা করিবার সময়ে জনশূন্য বনে বসিয়া সংগ্রহ করিয়াছিলেন, না সংসারে থাকিতেই সংগ্রহ করিয়াছিলেন?

লাগে ? তিনি সংসারের বিলাসসুখে প্রথমে খুব মাতিয়াছিলেন এবং পরে তাঁহার ইহাতে বিরক্তি জন্মিল, একথা কেহ বলেন নাই। যেটুকু লিপ্ত হইয়াছিলেন তাহাতেই তিনি ইহার অসারতা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। বুদ্ধ চিরদিনই সরলপ্রাণ ছিলেন। সিদ্ধার্থ সরলভাবে তাঁহার মানসিক অবস্থার কথা ও সংসারত্যাগের বাসনা আত্মীয়স্বজনকে জানাইয়াছিলেন। পত্নী ও পিতার সহিতও তিনি এবিষয়ে আলোচনা করিয়াছিলেন বলিয়া বর্ণিত আছে। শুদ্ধোদন প্রথমে অনেক বাধা দিয়া অবশেষে আর আপত্তি করেন নাই। মনের উচ্চাশা মিটাইবার আকাঙ্ক্ষায় সিদ্ধার্থ পত্নীর কাছে উৎসাহ পাইয়াছিলেন, একথাও বৌদ্ধেরা বলিয়াছেন। বুদ্ধ পরে পত্নীর যে প্রশংসা করিয়াছিলেন তাহাতে ইহা সম্ভব বলিয়াই মনে হয়।

সিদ্ধার্থের সংসারত্যাগ সম্পর্কে আরও একটি কথা বলা আবশ্যক। বৌদ্ধ ও জৈন শাস্ত্রে দেখা যায় সেই যুগে সমাজের অনেকের, বিশেষতঃ ক্ষত্রিয়দের মধ্যে খুব বড় একটা আধ্যাত্মিক সম্পদ লাভের জন্য বিপুল প্রয়াস চলিতেছিল। এই সম্পদকে বৌদ্ধজৈন শাস্ত্রে নির্বাণ বুদ্ধত্ব জিনত্ব তীর্থঙ্করত্ব অমৃত প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ইহারই কথা বুদ্ধ বলিয়াছিলেন “যাহার জন্য বড় ঘরের ছেলেরা গৃহ ছাড়িয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করে”। মহাবীর ইহা লাভের জন্য বারো বৎসর বহু কষ্টভোগ করিয়াছিলেন। বুদ্ধ ও মহাবীর ব্যতীত ছোট বড় আরো অনেকে বুদ্ধত্ব জিনত্ব লাভেব দাবি করিতেন। অধ্যাত্ম-অধ্যবসায়ীরা পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করিতেন ‘‘আয়ুষ্মন্, তুমি অমৃত লাভ করিয়াছ কি ?” অনেক অনেক উদ্দেশ্যে এই সম্পদ লাভের চেষ্টা করিত, এখনও যেমন বিভিন্ন লোক বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ধার্মিক বা সন্ন্যাসী সাজে অথবা ‘দেশের কাজে’ যোগ দেয়। সিদ্ধার্থের উদ্দেশ্য কি ছিল ? জীবের দুঃখ দেখিয়া এই দুঃখ হইতে সংসারের পরিত্রাণের উপায় অন্বেষণের জন্য তিনি সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন, এই যে কথা প্রচলিত আছে তাহা ঠিক বলিয়া মনে হয় না। পরে আমরা দেখিতে পাইব লোকের কাছে তাঁহার বাণী প্রচার করিবেন কি না, এবিষয়ে বুদ্ধের মনে প্রবল দ্বিধা উপস্থিত হইয়াছিল। বাণাহত হংসের আর্তনাদে বিগলিত হইয়া যে বালক শুশ্রূষা করিয়া তাহার প্রাণ বাঁচাইয়া তাহার প্রতি মমতা দেখাইয়াছিল, সে যে দুঃখ হইতে মুক্তির পথ আবিষ্কার করিয়া অপর দশজনকে তাহা না দেখাইয়া থাকিতে পারিবে না, ইহা স্বাভাবিক।

পরসেবা পরোপকার ও বিশ্বপ্রেমের বীজ সিদ্ধার্থের মনে অবশ্যই ছিল, কিন্তু ঠিক এই সময়টিতে, যখন তিনি সংসার ত্যাগ করিবার কথা ভাবিতেছিলেন, তখন তাঁহার দৃষ্টি ছিল প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ নিজের উপর, তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল নিজের দুঃখবিমুক্তি লাভ। জীবনের শেষ পঁয়তাল্লিশ বৎসর যে তিনি লোক-হিতার্থে পথে পথে গ্রামে নগরে ঘুরিয়া বেড়াইবেন, এ উদ্দেশ্য বা কল্পনা এ সময়ে তাঁহার ছিল না। তিনি সে সময়ে ভবিষ্যতের কথা ভাবেন নাই, ঠিক অব্যবহিত সম্মুখের উদ্দিষ্ট আদর্শ কি ভাবে সাধন করিবেন, এই কথাই তাঁহার মনকে সম্পূর্ণ অধিকার করিয়া ছিল। কথিত আছে গৃহত্যাগের পূর্বমুহূর্তে নব-জাত শিশুপুত্র রাহুলের মুখ একবার দেখিবার ইচ্ছা হইলে তিনি এই ইচ্ছা দমন করিয়া মনকে বুঝাইয়াছিলেন "বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া তারপর রাহুলকে দেখিব"। ইহা চিরদিনের জন্য গৃহত্যাগে কৃতসংকল্প লোকের কথা বলিয়া মনে হয় না।

সিদ্ধার্থের এই সময়েব বিমনাভাব দূর করিবার জন্য আত্মীয়স্বজন বন্ধু-বান্ধবেরা কত চেষ্টা করিয়াছিলেন, শুদ্ধোদননিযুক্তা চতুরা কামিনীগণ গৃহে নৃত্যগীত ও প্রমোদ-উদ্যানে নিপুণ বিলাসরঙ্গ-বিভ্রমের দ্বারা তাঁহাকে উল্লসিত আত্মবিস্মৃত ও ভোগলুব্ধ করিবার কত ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছিল, মহাকবি অশ্বঘোষ রচিত বুদ্ধচরিত কাব্যে এসবের সুললিত বর্ণনা আছে। কিন্তু তাহা কাব্য, ইতিহাস নহে।

জরা ব্যাধি মৃত্যু, এগুলি মানবজীবনের পরিবর্তনশীলতা ও দুঃখের চিরন্তন মূর্ত প্রতীক। বুদ্ধ বহু উপদেশে বহুস্থলে এগুলির কথা বলিয়াছেন, তাই এগুলির উপর ভক্তদের এত দৃষ্টি পড়িয়াছিল যে তাঁহাদের মনে এগুলি জমাট বাঁধিয়া বাস্তবরূপ ধারণ করিয়াছিল এবং অবশেষে বর্ণনায় তাঁহারা ইহাদের মনুষ্যরূপ ধরিয়া সিদ্ধার্থের দৃষ্টিতে উপস্থিত হওয়া কল্পনা করিয়া-ছিলেন। সিদ্ধার্থ নিশ্চয়ই এই প্রতীকগুলিতে যাহা কিছু বুঝায়, সেসব সম্বন্ধে খুব চিন্তা করিতেন। আমাদের দেশে বহুপরিজনপূর্ণ কোলাহলময় গৃহে একলা বসিয়া কেহ কোনও কিছু ভাবিবার সুবিধা পায় না, সেইজন্য দেখা যায় প্রাচীনকালে কাহারও কিছু ভাবিবার বা করিবার থাকিলে, কেহ 'মানুষের মত মানুষ' হইতে চাহিলে, একটু ব্যক্তিত্ব একটু স্বাতন্ত্র্য লাভ করিতে চাহিলে গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইত। ভাবুক সিদ্ধার্থ বোধহয় একাকী নগরের বাহিরে প্রমোদ-উদ্যানে গিয়া এসব বিষয়ে চিন্তা করিতেন। আমরা

অনেক সময়ে আমাদের মনের অনেক ভাবনার কথা আত্মীয়স্বজনের সহিত আলোচনা না করিয়া পুরানো চাকর ঠাকুরের সহিত করি, সিদ্ধার্থও বোধহয় সারথির সহিত প্রথমে এসব বিষয়ের আলোচনা করিতেন। ইহা হইতেই বোধহয় দৈবজ্ঞের কথা, দেবতাদের জরাব্যাধিমৃত্যু-সন্ন্যাসীর মূর্তি ধরিয়া দেখা দিবার কথা প্রভৃতির উদ্ভব হইয়াছিল।

এই সময়ে সিদ্ধার্থের একটি পুত্র জন্মে। পুত্রের জন্মসংবাদ শুনিয়া সিদ্ধার্থ নাকি বলিয়াছিলেন "রাহুলো জাতো", শত্রু জন্মিল, অর্থাৎ সংসারের বন্ধন বাড়িল, তাই পুত্রের নাম রাহুল রাখা হয়। আধুনিক পণ্ডিতেরা মনে করেন জন্মের সময়ে বা সেই অহোরাত্রের মধ্যে সূর্য বা চন্দ্রের গ্রহণ (রাহুগ্রাস) হইয়াছিল বলিয়া জাতকের এই নাম হইয়া থাকিবে। পুত্রের জন্মে সিদ্ধার্থ সংসারত্যাগের অভিপ্রায় কিছুদিন স্থগিত রাখেন। পৌত্রের জন্মে শুদ্ধোদন উৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন। সিদ্ধার্থ মনোহরবেশে সজ্জিত হইয়া উৎসবে যোগ দিতে আসিতেছিলেন, তাঁহাকে দেখিবার জন্য শাক্যনারীরা বাতায়নে দাঁড়াইয়া ছিলেন। বর্ণিত আছে কৃশা-গৌতমী নামে এক তন্বী সিদ্ধার্থের রূপের প্রশংসা করিয়া "ধন্য (নিব্বুতো) এই ব্যক্তি, ধন্য ইহার জনকজননী" এইরূপ কয়েকটি কথা বলিল। তাহার কথার মধ্যে 'নিব্বুত' শব্দটি কয়েকবার শুনিয়া সিদ্ধার্থ ভাবিলেন যুবতী তাঁহাকে নির্বাণলাভের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে, তাই কৃতজ্ঞতাব চিহ্নস্বরূপ তিনি নিজকণ্ঠের একটি মুক্তাহার কৃশা-গৌতমীকে পাঠাইয়া দিলেন। কৃশা-গৌতমী কিন্তু মনে করিয়াছিল সিদ্ধার্থ তাহাকে প্রণয়োপহার পাঠাইয়াছেন।

গৃহত্যাগ

সিদ্ধার্থ সংকল্প করিলেন আর বিলম্ব না করিয়া সত্বর গৃহত্যাগ করিবেন। গভীররাত্রে নিদ্রিতা নর্তকীদের স্রস্তবসন, আলুথালু কেশপাশ, বিসদৃশ অঙ্গবিক্ষেপ প্রভৃতি দেখিয়া ঘৃণায় সিদ্ধার্থের সেই মুহূর্তেই পলায়নের ললিত-বিস্তর গ্রন্থের যে কাহিনী প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে তাহা অশাস্ত্রীয়, কারণ পালিশাস্ত্রে এ ঘটনা যশ নামক একজন ধনীপুত্র বুদ্ধশিষ্যের জীবনে ঘটিয়াছিল বলিয়া বর্ণিত আছে। এই ঘটনার নাটকীয় মূল্যবত্তা বুঝিয়া পরবর্তী কালের গল্পকারেরা ইহা বুদ্ধের জীবনে চালাইয়া দিয়াছেন।

সিদ্ধার্থ পলাইয়া গৃহত্যাগ করেন নাই, সকলেই জানিত তিনি গৃহত্যাগ করিবেন। পালিশাস্ত্রের প্রাচীন যে যে অংশে তাঁহার গৃহত্যাগের উল্লেখ আছে, সেখানে সহজ ভাবেই একথা বলা হইয়াছে, এবং তাহাতে পলায়নের কোনও প্রসঙ্গ নাই। তিনি ঘোড়ায় চড়িয়া ছন্দক নামক একজন বিশ্বস্ত অনুচরকে সঙ্গে



সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগ নন্দলাল বসু অঙ্কিত

লইয়া বৈশালীনগরী অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। গল্পকারেরা যাহা বর্ণনা করিয়াছেন—শুদ্ধোদন সিদ্ধার্থের পলায়ন নিবারণ করিবার জন্য চারিদিকে বহু সতর্ক প্রহরী রাখিয়াছিলেন—তাহা যদি সত্য হয় তবে ছন্দককে ডাকিবামাত্র সে বাড়ীর লোককে সংবাদ না দিয়া সিদ্ধার্থের পলায়নে সাহায্য করিল কেন? ধরা পড়িবার ভয়ে সিদ্ধার্থ যদি তীরবেগে ঘোড়া ছুটাইয়াছিলেন, তবে ছন্দক পায়ে হাঁটিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গেল কি করিয়া? সিদ্ধার্থ পলায়ন করেন নাই বটে, কিন্তু সম্ভবতঃ সকলের খেদাশ্রুবিসর্জনের মধ্যে গৃহত্যাগ করা তাঁহার সুকুমারচিত্তে রুচিকর মনে হয় নাই, তাই তিনি গভীররাত্রে গোপনে গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন। যাত্রার পূর্বে শিশুপুত্রকে একবার তাঁহার দেখিতে ইচ্ছা হওয়া, নিদ্রিতা পত্নীর কক্ষে গিয়া পত্নীর বাহুতে শিশুর মুখ আংশিক আবৃত দেখিয়া পত্নীর বাহু সরাইয়া পুত্রমুখ দেখিবার বাসনা হওয়া, কিন্তু তাহাতে পত্নী জাগিয়া হয়তো যাত্রায় বাধা দিবেন এই ভাবিয়া বিরত হইয়া নিঃশব্দে গৃহত্যাগের যে কাহিনী প্রচলিত আছে তাহা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতগণ মনে করেন পুত্রজন্মের অত্যল্পকাল পরে সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগ, রাত্রে পলায়ন প্রভৃতি, কাহিনীগুলির নাটকীয়ত্ব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সম্ভবতঃ ভক্তকল্পিত।

বৈশালীর পথে অনুপ্রিয় নামক গ্রামে সিদ্ধার্থ ছন্দককে বিদায় দিয়াছিলেন। অঙ্গের বসনভূষণ ত্যাগ করিয়া ছন্দকের হাতে দিয়া তিনি সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়াছিলেন। কেহ বলিয়াছেন এক ব্যাধের সহিত বস্ত্রবিনিময়

করিয়া সিদ্ধার্থ ব্যাধের বস্ত্র পরিয়াছিলেন ও তরবারি দ্বারা মস্তকের কেশচ্ছেদন করিয়াছিলেন। বর্ণিত আছে ছন্দক কপিলবাস্তুতে ফিরিয়া মহাপ্রজাবতী গৌতমীর হাতে সিদ্ধার্থের অলঙ্কার আভরণাদি দিলে মহাপ্রজাবতী শোকে দুঃখে তাহা নিকটবর্তী একটি পুষ্করিণীতে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছিলেন। অনুপ্রিয় গ্রামের একটি আমবাগানে কিছুদিন একাকী নির্জনে বাস করিয়া শান্তচিত্ত হইয়া সিদ্ধার্থ বৈশালীনগরী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। গৃহত্যাগের সময়ে তাঁহার প্রায় উনত্রিশ বৎসর বয়স হইয়াছিল।

বৈশালী সেযুগে অতি প্রসিদ্ধ নগরী ছিল। সুরম্য হর্ম্য, পদ্মসরোবর, প্রমোদ-উদ্যান প্রভৃতিতে ইহার শোভাবর্ধন হইত। লিচ্ছবিবংশীয় ক্ষত্রিয়েরা এখানে বাস ও রাজত্ব করিতেন। লিচ্ছবিক্ষত্রিয়দের মধ্যে গণতন্ত্রশাসন-প্রথা প্রচলিত ছিল অর্থাৎ গণের বা এই বংশের সকলে মিলিয়া রাজ্য চালাইতেন। শাক্যদের মত লিচ্ছবিদেরও খুব বংশগৌরব ছিল। বৈশালী অতি সমৃদ্ধিশালী নগরী এবং ভোগবিলাসেরও লীলাক্ষেত্র ছিল। এখানকার অধিবাসীদের আচারব্যবহারে মার্জিত রুচির পরিচয় পাওয়া যাইত ও বসন-ভূষণের পরিপাট্যের জন্য তাহারা প্রসিদ্ধ ছিল। নানাবর্ণের সুবেশ পরিহিত, নানা অলঙ্কারে শোভিত লিচ্ছবিদের দেখিয়া বুদ্ধ একবার শিষ্যদের বলিয়াছিলেন "ভিক্ষুগণ, তোমাদের মধ্যে যাহারা দেবতাদের কখনও দেখ নাই, তাহারা এই লিচ্ছবিদের ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া দেখ ও দেবতাদের সহিত ইহাদের সাদৃশ্য লক্ষ্য কর।" নানাস্থানের ধনীরা প্রকাশ্যে ও কোন কোনও রাজা গুপ্তভাবে বিলাসপ্রমোদের জন্য বৈশালীতে আসিতেন।

ভোগবিলাসের ক্ষেত্র হইলেও বৈশালী জ্ঞানবিজ্ঞান-চর্চা এবং ধর্মদর্শনাদি আলোচনারও স্থান ছিল। মহাবীরের নিগ্রন্থসম্প্রদায়ের কেন্দ্র এইখানেই ছিল। অনেক প্রসিদ্ধ শিক্ষকেরা এখানে স্ব স্ব মত প্রচারের জন্য আসিতেন এবং সেই আন্দোলনে উৎসাহী অনেক যুবকরাও এখানে শিক্ষার জন্য সম্মিলিত হইত। সিদ্ধার্থও সেইজন্য প্রথমে এখানে আসিলেন। সেযুগে অব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীদের 'শ্রমণ' বলা হইত; সিদ্ধার্থকে সাধারণ লোকে গোত্র-নামে 'গৌতম' বা 'শ্রমণ গৌতম' বলিত। সিদ্ধার্থ যে পরমবস্তু লাভের আশায় সংসার ছাড়িয়া আসিয়াছিলেন, এখন তাহার উপায় খুঁজিতে লাগিলেন।

তিনি নানা সম্প্রদায়ের লোকের সহিত পরিচয় করিলেন, বিভিন্ন মতের বিভিন্ন শিক্ষকগণ কর্তৃক কোথায় কি শিক্ষাদান হইতেছে তাহা জানিলেন। সাধকদের সম্বন্ধে আমরা স্থূলভাবে জানি যে অমুক সংসার ত্যাগ করিলেন, অত বৎসর তপস্যা করিলেন ও শেষে সিদ্ধিলাভ করিলেন। কিন্তু এই তপস্যা কথাটির মধ্যে যে কত পরিশ্রম, কত আগ্রহ, কত বিফলতার ইতিহাস লুক্কায়িত থাকে তাহা আমরা তত ভাবিয়া দেখি না।

বোধহয় প্রথমাবধি আদর্শের কিছু বৈষম্য থাকায় শ্রমণ গৌতম বৈশালীতে নির্গ্রন্থদের সহিত পরিচিত হইলেও মহাবীরের নিকট যান নাই। অনেকের কাছেই গৌতম যাইতেন ও তাঁহার সমবয়সী ও সমচেষ্টাবান্ অনেকের সহিতই তাঁহার পরিচয় হইয়াছিল। কালাম গোত্রের আলার নামক একজন ব্রাহ্মণ গুরুর নিকটে তিনি ধ্যানের প্রক্রিয়া শিক্ষা করিলেন। আলারের শিক্ষা দিবার যাহা ছিল সবই গৌতম শিখিলেন বটে কিন্তু তাঁহার মনে হইল তিনি যে বস্তু অন্বেষণ করিতেছিলেন, এ পথে তাহা পাইলেন না। তাই আলার কালামের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া তিনি শ্রাবস্তী নগরীতে এবং সেখান হইতে রাজগৃহ নগরে গেলেন। রাজগৃহ ও শ্রাবস্তী সেই সময়ে খুব বড় নগর ছিল। সম্ভবতঃ শ্রাবস্তীতে উদ্রক রামপুত্র নামক আর এক গুরুর নিকটে গৌতম কিছুদিন শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। উদ্রকের শিক্ষাতেও অভীষ্টলাভের পথ না পাইয়া তিনি সেখান হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। আলার ও উদ্রক উভয়েই গৌতমকে খুব স্নেহ করিতেন, গৌতমও তাঁহাদের শ্রদ্ধা করিতেন। গৌতমের বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য ও শিক্ষার আগ্রহে প্রীত হইয়া তাঁহাদের যাহা শিখাইবার ছিল, সযত্নে তাঁহারা গৌতমকে সবই শিখাইয়াছিলেন। তিনি যখন তাঁহাদের ছাড়িয়া আসেন তখন এমন বুদ্ধিমান ও যত্নশীল শিষ্যের চলিয়া যাওয়ায় উভয় গুরুই দুঃখিত হইয়াছিলেন ও তাঁহাকে বারবার থাকিতে বলিয়াছিলেন। গৌতম ইঁহাদের ছাড়িয়া গেলেন নিজের ঈপ্সিতবস্তু লাভের জন্য, ইঁহাদের প্রতি অশ্রদ্ধায় নহে। বোধিলাভের পর সকলের পূর্বে ইঁহাদের কথা বুদ্ধের মনে হইয়াছিল ও কৃতজ্ঞভাবে তিনি ইঁহাদের স্মরণ করিতেন।

গৌতম দেখিতে অতি সুপুরুষ ছিলেন, তাঁহার উজ্জ্বল গৌরবর্ণ ও সৌম্য মুখকান্তি লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। ক্ষত্রিয় রাজবংশের ধনীপুত্র

সংসার ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইয়াছে, ইহাও বোধহয় রাজগৃহের লোক শুনিয়াছিল। রাজা বিম্বিসার প্রাসাদ-বাতায়ন হইতে পথে তাঁহাকে ভিক্ষাটন-রত দেখিয়া খবর লইবার জন্ত লোক পাঠাইয়াছিলেন। গৌতম ভিক্ষান্ন লইয়া নগরের বাহিরে গিয়া ভিক্ষান্ন ভোজন করিতে গিয়া দেখিলেন অতি কদর্য অন্ন, তাঁহার বমনের উদ্রেক হইল। "যখন সন্ন্যাসী হইয়াছি তখন এইরূপ অন্নই আমাকে খাইতে হইবে" বলিয়া তিনি নিজেকে বুঝাইলেন। বিম্বিসার তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার সহিত পরিচয় করিতে আসিয়াছিলেন এবং বর্ণিত আছে বিম্বিসার গৌতমকে জমিজমা দিয়া মগধে বাস করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন কিন্তু গৌতম স্বীকৃত হন নাই। বিম্বিসার গৌতমকে অনুরোধ করিলেন যে অভীষ্টলাভে কৃতকার্য হইবার পর যেন তিনি কিছুদিন রাজগৃহে আসিয়া বাস করেন।

এ পর্যন্ত যে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহাতে বিফলকাম হইয়া গৌতম অতঃপর গয়ার নিকটবর্তী একটি পাহাড়ে কিছুদিন বাস করিলেন, কিন্তু সে স্থান ভয়ঙ্কর এবং প্রসন্নচিত্তে সাধনার অনুপযুক্ত বলিয়া তিনি সেখান হইতে নৈরঞ্জনা নদীতীরে উরুবিল্ব নামক গ্রামে আসিলেন। বপ্র, ভদ্রিয়, অশ্বজিৎ, মহানাম ও কৌণ্ডিণ্য নামে "পাঁচজন" ভিক্ষু এখানে তাঁহার সঙ্গী হইল এবং আরও অনেক তপস্বীও এখানে ছিলেন। বৌদ্ধশাস্ত্রে "পাঁচজন" বলিতে কিন্তু ঠিক পাঁচজনই বুঝায় না, ইহার অর্থ "কয়েকজন"।

উরুবিল্বে আসিয়া বা আসিবার পূর্বেই গৌতমের এই তিনটি উপমা মনে হইয়াছিল—জলে নিমজ্জিত কাষ্ঠখণ্ড অরণিদ্বারা ঘর্ষণ করিলে অগ্নি উৎপন্ন হয় না; ভিজা কাঁচা কাঠ জলে নিমজ্জিত না হইলেও অরণিদ্বারা ঘর্ষণ করিলে তাহাতেও অগ্নি উৎপন্ন হয় না; একমাত্র শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ডেই অরণিদ্বারা ঘর্ষণ করিলে অগ্নি উৎপন্ন হয়। এই উপমা মনে হওয়ায় তিনি কৃচ্ছ্র সাধনের দ্বারা শরীরনিগ্রহ করিয়া পরমজ্ঞানাগ্নি উৎপন্ন করিবার অভিপ্রায় স্থির করিলেন। সেযুগে কৃচ্ছ্রসাধনের খুব প্রসার ছিল; নির্গ্রন্থ আজীবিক প্রভৃতি অনেক সম্প্রদায়ই কৃচ্ছ্রমার্গের সাধক ছিলেন। ইঁহাদের সহিত অন্ত বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও গৌতম বোধহয় এই সুপ্রচলিত পথে অভীষ্ট লাভের চেষ্টা সফল হয় কিনা দেখিবার জন্ত কৃচ্ছ্রসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

শ্রমণ গৌতম ঘোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। তাঁহার কৃচ্ছ্রসাধনের কথা পরে তিনি নিজে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছিলেন—"বলবান ব্যক্তি দুর্বল ব্যক্তিকে যেমন মস্তক বা স্কন্ধ ধরিয়া স্ববশে আনে, সেইরূপ আমি দন্তে দন্ত চাপিয়া, তালুদেশে জিহ্বা দৃঢ়বদ্ধ করিয়া চিত্তকে পেষণ করিবার চেষ্টা করিলাম, আমার কক্ষদেশে স্বেদ নির্গম হইতে লাগিল। চিত্তের অভিনিবেশ অবিচলিত হইলেও দেহ অচঞ্চল হইল না, কিন্তু তথাপি আমি অপরাভূত রহিলাম। আমি মুখ ও নাসিকা দ্বারা শ্বাসপ্রশ্বাস রোধ করিলাম। বলবান ব্যক্তি তরবারির অগ্রভাগ দ্বারা আঘাত করিলে যেরূপ হয়, আহত বায়ু সেইরূপ আমার মস্তকে আঘাত করিল। মস্তকে দৃঢ়ভাবে রজ্জুদ্বারা বেষ্টন করিয়া বন্ধন করিলে বা তীক্ষ্ণ ছুরিকাদ্বারা শরীর কাটিয়া ফেলিলে অথবা দুই বলবান ব্যক্তি এক দুর্বল ব্যক্তিকে বলপূর্বক জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর ধরিয়া রাখিলে যেরূপ যন্ত্রণা বোধ হয়, আমার সেইরূপ যন্ত্রণাবোধ হইল। আমি অতি অল্প আহার করিতে লাগিলাম ও ক্রমে দিনে একটি মাত্র বদরি বা একটিমাত্র তিল বা একটিমাত্র তণ্ডুল আহার করিতাম। আমার শরীর এরূপ শুষ্ক হইয়া গেল যে আমি যেখানে বসিতাম সেখানে উষ্ট্র-পদচিহ্নের মত ছাপ পড়িত, চক্ষুদ্বয় কোটরগত হইয়া গভীর কূপের তলদেশস্থ জলের মত বোধ হইত, উদর স্পর্শ করিলে মেরুদণ্ড হাতে ঠেকিত, মেরুদণ্ড স্পর্শ করিলে উদর হাতে ঠেকিত, গায়ে হাত বুলাইলে রোম ঝরিয়া পড়িত"।

এই কঠোরসাধনা করিতে করিতে একদিন গৌতম চৈতন্যহীন হইয়া পড়িয়া রহিলেন। অনেকে ভাবিল বুঝি তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, লোকমুখে শুদ্ধোদনের নিকটেও গৌতমের মৃত্যু সংবাদ পৌঁছিয়াছিল—দুঃসংবাদ খুব সহজেই ছড়াইয়া পড়ে। শুদ্ধোদন সংবাদদাতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন পুত্র বুদ্ধত্বলাভ করিবার পর মারা গিয়াছেন কি না, এবং পুত্রের দৃঢ় প্রতিজ্ঞার কথা জানিতেন বলিয়া গৌতম বুদ্ধত্বলাভ না করিয়াই মারা গিয়াছেন, একথা তাঁহার বিশ্বাস হয় নাই। চৈতন্য ফিরিয়া আসিলে গৌতম ভাবিলেন তিনি মৃত্যুর দ্বার হইতে ফিরিয়া আসিলেন কিন্তু অভীষ্ট লাভের কোনও চিহ্ন দেখিলেন না। তিনি বলিয়াছিলেন—"আমি বুঝিলাম যে আমার চেষ্টায় ফল হইল না। তখন আমার মনে পড়িল যে, বাল্যকালে আমার পিতা যখন শস্যক্ষেত্রে কর্মব্যস্ত ছিলেন

তখন জম্বুবৃক্ষের নীচে বসিয়া আমি কামনাবাসনাবিরহিত সুখ ও আনন্দময় ধ্যানের প্রথম অবস্থায় বিহার করিয়াছিলাম”। বিনা দ্বিধায় গৌতম কৃচ্ছ্র ত্যাগ করিলেন। যাহাতে লাভ বা অভীষ্টসাধন হইবে না বুঝিতেন তাহা বিনা দ্বিধায়, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোনও চিন্তা না করিয়া ত্যাগ করা বুদ্ধের প্রকৃতির একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। অতীতের প্রতি তাঁহার কোনও মিথ্যা মায়া ছিল না। গৃহ গুরুদ্বয় ও কৃচ্ছ্রত্যাগে আমরা তাঁহার এই বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাই; পরজীবনেও একবার তিনি কলহপরায়ণ ভিক্ষুদের নিরস্ত করিতে না পারিয়া বহু ভক্তের অনুরোধ-উপরোধে কর্ণপাত না করিয়া একাকী সংঘ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। গৌতমকে কৃচ্ছ্রত্যাগ করিতে দেখিয়া তাঁহার পূর্বসঙ্গীরা তাঁহাকে ছাড়িয়া গেল।

গৌতম পুনরায় আহারগ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং শরীরে কিঞ্চিৎ বললাভ হইলে গ্রামে ভিক্ষায় বাহির হইতে লাগিলেন। পূর্বস্থান ত্যাগ করিয়া তিনি নিকটবর্তী আর একটি বনে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। শরীরক্লেশ নিরাকরণ হওয়ায় তাঁহার চিত্তের স্বাচ্ছন্দ্য ফিরিয়া আসিল। সুস্থ ক্লেশহীন দেহে স্বচ্ছন্দচিত্তে আনন্দে বিহার করিয়া তিনি ক্রমে ক্রমে ধ্যানের প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থা হইতে চতুর্থ অবস্থার সুখদুঃখহীন অবিচলিত শুদ্ধ শান্তভাবে বিরাজ করিতে লাগিলেন। ইহা সহজেই অনুমেয় যে এই অবস্থায় উপনীত হইয়া গৌতম কিছুকাল বাহ্যজ্ঞানশূন্য বিভোরভাবে কাটাইয়াছিলেন। এ সময়কার তাঁহার মনোভাবের বর্ণনা ভাষার অতীত। একদা সারা দিবারাত্র এইভাবে কাটাইয়া নিশাশেষে তাঁহার প্রত্যক্ষ প্রতীতি হইল যে তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে, যাহা অন্বেষণে ছয় বৎসর এত যত্ন এত পরিশ্রম করিয়াছেন তাহা লাভ করিয়াছেন, বিশ্বের পরমতত্ত্ব তিনি সাক্ষাৎ দেখিয়াছেন, জানিয়াছেন ও অনুভব করিয়াছেন। তাঁহার মনে হইল জগতের সকল সত্য তাঁহার নিকটে প্রতিভাত হইয়াছে, নিজ হৃদয়ের ও সকল বস্তুর তিনি মূল পর্যন্ত বুঝিয়াছেন; তিনি বোধ করিলেন তাঁহার সকল দুঃখের অন্ত হইয়াছে, তিনি ‘নির্বাণ’ ও পরম আনন্দ লাভ করিয়াছেন। একমাত্র যে পথে গেলে এই পরম অবস্থা লাভ করা যায়, তিনি সেই পথের পথিক হইয়াছেন, তাই তিনি ‘তথাগত’; তিনি বোধি বা পরম জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাই তিনি ‘বুদ্ধ’।

গুরুদ্বয়ের কাছে তাঁহার শিক্ষালাভ, নিজের সাধনপ্রচেষ্টা, কৃচ্ছ্রাভ্যাস এবং বোধিলাভের কথা বুদ্ধ নিজমুখে যাহা বলিয়াছেন তাহাতে কিন্তু মারের প্রলোভন, বোধিদ্রুম প্রভৃতি সম্বন্ধে কোনও কথা নাই এবং পালিশাস্ত্রেও এসবের উল্লেখ পাওয়া যায় না। ইহা খুবই সম্ভব যে, সে সময়ে তিনি যে সব গাছের নীচে বসিতেন তাহার মধ্যে একটা বড় অশ্বত্থগাছ ছিল, অথবা এইরূপও হইতে পারে যে পরবর্তী কালে যখন বুদ্ধের স্মৃতিজড়িত স্থানগুলির পূজা আরম্ভ হইল তখন উরুবিল্বের বনের একটা বড় অশ্বত্থগাছকে তাঁহার সিদ্ধিক্ষেত্র কল্পনা করিয়া লোকে পূজা করিতে লাগিল, কারণ বৃক্ষপূজা প্রাচীন ভারতে সুপ্রচলিত ছিল।



গৌতমের বোধিলাভ নন্দলাল বসু অঙ্কিত

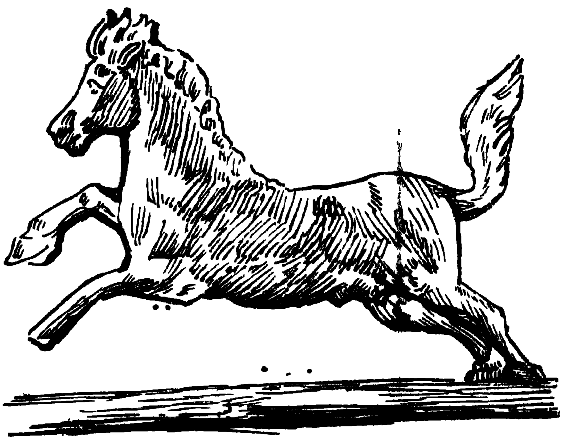
মজ্‌ঝিম-নিকায়ের দ্বেধাবিতক্ক-সুত্তে বুদ্ধ বোধিলাভের পূর্বে ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলির সম্বন্ধে তাঁহার চিন্তার বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই বোধহয় মার-প্রলোভন কাহিনীর মূল। নিবৃত্তিমার্গের সাধকমাত্রকেই নিজ হৃদয়ের অন্তর্নিহিত কামক্রোধাদি পশুবৃত্তিগ্রামের সহিত সংগ্রাম করিয়া জয়লাভ করিতে হয়। বুদ্ধ বলিয়াছিলেন তিনি এগুলির মূল পর্যন্ত উচ্ছেদ করিয়াছেন। ধর্মসাধকগণের অনেকে বলেন তাঁহারা এই আদিমবৃত্তিগুলিকে নিরোধ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, আবার অনেককে সারাজীবন ধরিয়া এই বৃত্তিগুলির সহিত হাতাহাতি করিতে দেখা যায়। আধুনিক মনোবিশ্লেষণ-বিজ্ঞান মতে মানবমনের এই মূলগত প্রবৃত্তিগুলিকে অতিমাত্রায় অযথা নিরোধের চেষ্টা করিলে ইহারা সাময়িক চাপা থাকে বটে কিন্তু সুবিধা পাইলেই স্বমূর্তিতে বা ছদ্মমূর্তিতে প্রকাশিত হইয়া নানা অঘটন ঘটাইয়া থাকে। আমাদের পৌরাণিক কাহিনীর অনেক মুনিঋষির জীবনে আমরা তাহার পরিচয় পাই। যে পাপভীরুরা পাপবিষয়ে সদাসন্ত্রস্ত থাকে, পাপ তাহাদের কাছে যেন একটা সজীব বস্তু বলিয়া মনে হয়। নিজ অন্তঃপ্রবৃত্তির

স্ফুরণকে তাহারা বাহিরের একটা দুষ্ট শক্তির আক্রমণ মনে করে। যীশুর সহিত নাকি শয়তানের তর্কবিতর্ক হইয়াছিল। খ্রীষ্টান সাধকেরা প্রায় প্রত্যহই নানা আকারে উক্ত দুষ্ট ব্যক্তিটিকে নানাস্থানে চাক্ষুষ দেখিতেন, মার্টিন লুটার বাইবেল অনুবাদ করিতে করিতে ক্লান্ত শরীরে হঠাৎ চোখে অন্ধকার দেখিয়া শয়তান উপস্থিত হইয়াছে মনে করিয়া তাহাকে দোয়াত ছুঁড়িয়া মারিয়াছিলেন। বৌদ্ধরাও মানুষের প্রবৃত্তিপরায়ণতা ও স্বভাবজাত দুর্বলতাগুলিকে মূর্তিমান মারের কারসাজি মনে করিতেন। 'মার' কথাটির অর্থ কিন্তু 'মৃত্যু', যাহাতে আধ্যাত্মিক জীবনের বিনাশ হয়।

গল্প আছে সাধনকালের শেষদিকে সুজাতা নাম্নী এক গোপনারী গৌতমকে আহার যোগাইত। সুজাতা নাকি দেবতার নিকটে মানসিক করিয়াছিল যে তাহার যদি ভাল বিবাহ হয় ও প্রথমে পুত্রসন্তান জন্মে তবে সে দেবতাকে পূজা দিবে। যথাকালে তাহার দুই ইচ্ছাই পূর্ণ হইলে সে পায়সান্ন রাঁধিল এবং বনে গিয়া গাছতলায় দেবতার পূজা দিবে বলিয়া দাসীকে গাছতলা ঝাঁট দিয়া লেপিয়া মুছিয়া রাখিতে বলিল। দাসী গাছ-তলায় গিয়া গৌতমকে সেখানে উপবিষ্ট দেখিয়া তাঁহাকেই দেবতা মনে করিয়া দৌড়িয়া গিয়া সুজাতাকে জানাইল। সুজাতাও এ কথায় বিশ্বাস করিয়া পায়স লইয়া গিয়া গৌতমকে খাইতে দিল ও মধ্যে মধ্যে অন্য গোপকন্যাদের সঙ্গে লইয়া তাঁহাকে আহার্য দান করিত। তপস্যাকালে বুদ্ধের পরিচর্যা করিয়াছিল বলিয়া বৌদ্ধসাহিত্যে এই সরলা গ্রাম্য নারীর বহুযশ কীর্তিত হইয়াছে। কৃচ্ছ্রভগ্ন শরীরের নষ্টবল ফিরাইয়া আনিতে এবং আহারদানে নবতপস্যার পথ সরল করিতে গৌতমকে এই গোপকন্যা যে সাহায্য করিয়াছিল তাহাতে সে সকলেরই কৃতজ্ঞতা অর্জন করিয়াছে।

বোধিলাভ করিয়া গৌতম যে মহাসত্য ও পরমবস্তু পাইলেন তাহার কি বর্ণনা করিব? বুদ্ধ নিজেই তাঁহার সম্বোধিলব্ধ তত্ত্ব সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"এই ধর্ম গভীর, সহজে ইহাকে দর্শন বা অনুবোধ করিতে পারা যায় না, ইহা তর্কের অগোচর, কঠিন, এবং শুধু জ্ঞানী ব্যক্তিই ইহা জানিতে পারে।" বুদ্ধ ইহার বিষয়ে লোককে পরে যাহা বলিতেন তাহার কয়েকটি মূলতথ্যমাত্র আমরা ক্রমে কিঞ্চিৎ বুঝিবার চেষ্টা করিব।

[সিদ্ধার্থের বাল্য কৈশোর ও যৌবনের কথা পালিশাস্ত্রে অতি অল্পই আছে। শাস্ত্রান্তর্গত নহে এবং পরবর্তীকালে রচিত কতিপয় গ্রন্থে, যেমন জাতকনিদানকথা, বুদ্ধচরিত, জিনচরিত, ললিতবিস্তর প্রভৃতি এবং তিব্বতী সিংহলী কোন কোনও গ্রন্থে এ বিবরণ কিছু পাওয়া যায়। মজ্‌ঝিমনিকায়ের মাগন্দিয়সুত্ত, অরিয়পরিয়েসনসুত্ত, মহাসচ্চকসুত্ত, বোধিরাজকুমারসুত্ত ও সঙ্গারবসুত্তে এবং অঙ্গুত্তরনিকায় ১।১৪৫, নিজের পূর্বজীবন সম্বন্ধে বুদ্ধ যাহা বলিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ আছে]।



সারনাথ অশোকস্তম্ভগাত্রে বুদ্ধের সংসারত্যাগ-প্রতীক অশ্বমূর্তি

৩

ধর্মচক্রপ্রবর্তন

সম্যক্‌জ্ঞান লাভ করিয়া বুদ্ধ কিছুদিন সেই বনেই বাস করিলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে স্থান পরিবর্তন করিতেন, এক গাছের নীচে হইতে আর এক গাছের নীচে, একবন হইতে আর এক বনে যাইতেন এবং বনের মধ্যে পথে পায়চারি করিয়া বেড়াইতেন। কিছুদিন এই ভাবে তিনি তপস্থালব্ধ পরমানন্দ উপভোগ করিলেন। ভবিষ্যতে যে ধর্ম তাঁহার দ্বারা প্রচারিত হইয়াছিল, তাহার দার্শনিক ভিত্তির পরিপুষ্টি সাধন, তাঁহার স্থাপিত সংঘের নিয়মাবলী প্রভৃতি বিষয়ে তিনি এই সময়ে সম্ভবতঃ অনেক চিন্তা কবিয়াছিলেন।

সুজাতাব বাড়ীর রাধা নাম্নী এক দাসী এই সময়ে মারা গিয়াছিল। তাহার পরিত্যক্ত বস্ত্রাদি শ্মশানে পড়িয়া ছিল, বুদ্ধ তাহা নিজহাতে ছিঁড়িয়া তাহাতে চীবর প্রস্তুত করিয়া নিকটের একটি জলাশয়ে ধুইয়া লইলেন। এই জলাশয় বৌদ্ধদিগের একটি তীর্থস্থান। রাধা দাসী হয়তো কাল্পনিক ব্যক্তি হইতে পারে কিন্তু এই সময় হইতে বুদ্ধ ও ভিক্ষুরা রাস্তা, শ্মশান প্রভৃতি স্থান হইতে পরিত্যক্ত বস্ত্র সংগ্রহ করিয়া চীবর প্রস্তুত করিয়া লইতেন, অন্য বস্ত্র ব্যবহার করিতেন না। অন্য সম্প্রদায়েব সন্ন্যাসীরাও এইরূপে বস্ত্র সংগ্রহ করিতেন। পরে বুদ্ধ শিষ্যগণকে দানপ্রাপ্ত চীবর ব্যবহারে অনুমতি দিয়াছিলেন।

ক্রমে লোকজনের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইতে লাগিল। এক দাম্ভিক ব্রাহ্মণ তাঁহার কাছে আসিয়া গর্বিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল 'ব্রাহ্মণ' কথার অর্থ কি। বুদ্ধের সঙ্গে তাহার কিছু কথাবার্তা হইয়া থাকিবে এবং ইহার শেষাংশই শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ব্রাহ্মণের উদ্দেশ্য ছিল সে যে একজন মস্ত ব্যক্তি তাহা বুদ্ধকে বুঝাইবে। তাহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া বুদ্ধ উত্তর দিলেন, "যে ইন্দ্রিয়জয় করিয়াছে এবং কামনার বশীভূত নহে সেই প্রকৃত ব্রাহ্মণ, তবে ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত এমন লোকও আবার অনেক আছে যাহারা জাত্যাভিমানে অন্ধ হইয়া দম্ভভরে চলাফেরা করে, চেঁচাইয়া কথা বলে ও ইন্দ্রিয় দমনের চেষ্টা করে না"। বুদ্ধের এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ অপ্রতিভ হইয়া চলিয়া গেল।

তপুস্স ও ভল্লিক নামে দুইজন ব্যবসায়ী মাল বোঝাই গাড়ী লইয়া সেই বনের মধ্য দিয়া যাইতেছিল। কাদায় তাহাদের গাড়ীর চাকা আটকাইয়া গিয়াছিল। বর্ণিত আছে বুদ্ধের উপদেশে—মনে হয় তাঁহার দৈহিক সহযোগিতায়—তাহারা গাড়ীর চাকা উদ্ধার করিতে পারিয়াছিল। এই দুই বণিকভ্রাতা বুদ্ধকে আহার্য দান করিয়াছিল ও কৃতজ্ঞতা জানাইয়াছিল।

বোধিলাভ করিয়া বুদ্ধ যে জ্ঞান ও আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন তাহা কি শুধু তিনি নিজেই উপভোগ করিবেন, না অন্যকেও দিবেন—এই প্রশ্ন এখন তাঁহার মনে উদিত হইল। একবার তিনি ভাবিলেন সাধারণ্যে ইহার প্রচার করিবেন কিন্তু মনে অনেক দ্বিধা সংশয় ও সঙ্কোচ উপস্থিত হইল। তিনি ভাবিলেন তিনি যে সত্য লাভ করিয়াছেন তাহার তথ্য অতি গম্ভীর, অতি জটিল, অতি কঠিন, জ্ঞানী ব্যতীত অন্যে ইহার মর্ম বুঝিবে না, ইহা সংসারধর্মের সম্পূর্ণ বিপরীত, লোকে ইহাকে উপহাস করিবে—এই ভাবিয়া তিনি প্রচার না করাই স্থির করিলেন। কিন্তু ইহাতে তাঁহার মন মানিল না। হৃদয়ের সহিত বুদ্ধির আবার দ্বন্দ্ব আরম্ভ হইল। তিনি ভাবিয়া দেখিলেন যে, প্রচার করিলে বাস্তবিক উপকার কাহারও যে একেবারে না হইবে তাহা নহে, কারণ সংসারের লোককে তিন ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে—এক ভাগ অজ্ঞানের মধ্যে আছে এবং চিরকাল থাকিবেও, তাঁহার প্রচার বা অপ্রচারে তাহাদের অবস্থার তারতম্য হইবে না; দ্বিতীয় ভাগ জ্ঞান পাইয়াছে বা পাইয়াছে মনে করে, তিনি প্রচার করুন বা না করুন ইহাদেরও কিছু যাইবে আসিবে না; কিন্তু তৃতীয় ভাগের লোক, যাহারা জ্ঞান ও অজ্ঞানের মধ্যবর্তী সংশয়ের অবস্থায় আছে অথচ যাহারা জ্ঞানলাভ ইচ্ছা করে, তিনি প্রচার করিলে তাহারা জ্ঞানলাভ করিবে, প্রচার না করিলে অজ্ঞই থাকিয়া যাইবে। এই তৃতীয় ভাগের লোকের উপকারের জন্য, যাহারা জ্ঞান পাইতে চাহে ও পাইতে পারে কিন্তু পায় নাই, তাহাদের প্রতি অনুকম্পায় বুদ্ধ প্রচার করিবেন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন। হৃদয়ের সহিত দ্বন্দ্বে বুদ্ধি পরাস্ত হইল। এই সময়ের কথা রূপকে বৌদ্ধ ভক্তেরা বর্ণনা করিয়াছেন যে মার আসিয়া বুদ্ধকে বলিয়াছিল যে তাঁহার অভীষ্ট যখন লাভ করিয়াছেন তখন তাঁহার কার্য বা কাম্য আর কিছুই নাই, তিনি মৃত্যু স্বীকার করুন। প্রায় অর্ধশতাব্দী কাল ধর্মপ্রচারের দ্বারা লোকসেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়া বুদ্ধ মারের কথার উত্তর দিয়াছিলেন।

এই ঘটনাকে বুদ্ধের জীবনের একটি মহামুহূর্ত মনে করা উচিত। মানব-সমাজের পক্ষে এইটি বুদ্ধ জীবনের একটি মহাঘটনা কারণ ইহার ফলে তাঁহার জীবন কেবল শুধু নিজের জন্য না হইয়া বহুর জন্য হইল। মহানিষ্ক্রমণ অতি মূল্যবান ঘটনা সন্দেহ নাই কিন্তু সে সময়ে সিদ্ধার্থ গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য। সে সময়ে তিনি চিরদিনের মত সংসারত্যাগ করিয়া যাইতেছেন একথা নিজেও ভাবেন নাই, অপরেও মনে করে নাই। তাঁহার অতৃপ্তির কথা সকলেই জানিত এবং তিনি নিজে ও অপরে ভাবিয়াছিলেন যে বোধিলাভ যদিও সময়সাপেক্ষ ও কষ্টলভ্য, তথাপি অভীষ্ট সিদ্ধ হইলে তিনি হয়তো শান্তচিত্তে আবার সংসার করিবেন। জ্ঞানাজ্ঞানের মাঝামাঝি সংশয়ের অবস্থায় যাহারা আছে তাহাদের উপকারের জন্য ধর্মপ্রচারের এই যে সংকল্প বুদ্ধ করিলেন, তাহার সময় পিছাইয়া দিয়া পরবর্তী যুগের লেখকেরা জীবের দুঃখে ব্যথিত হইয়া সংসারের দুঃখমোচনের জন্য সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগ কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু বস্তুতঃপক্ষে তিনি গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন পরদুঃখ নিবারণের জন্য নহে,-নিজদুঃখ নিবারণের জন্য। এখন তিনি যে সংকল্প করিলেন তাহা জ্ঞান বা বুদ্ধির প্রেরণায় তত নহে যত হৃদয়ের প্রেরণায়।

নিজের অতৃপ্তি নিবারণের জন্য সিদ্ধার্থ গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন ও অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়াছিলেন এবং অভীষ্ট বস্তু লাভও করিয়াছিলেন। কিন্তু বোধিলাভের পর তিনি যদি গৃহাশ্রমে ফিরিয়া ভোগে লিপ্ত হইতেন, তবে মনে করিতাম তাঁহার শ্রম গলিতশবান্বেষী শকুনের গগনবিহারের মত বৃথা হইল। গৃহে না ফিরিলেও যদি তিনি উরুবিল্বের বনে কুটির বানাইয়া নির্জনে বোধির পরমানন্দ ভোগ করিয়া জীবনের অবশিষ্টাংশ যাপন করিতেন, তবে তাঁহাকে গুপ্তস্থানে খনিত তৃষ্ণার্তের অজ্ঞাত নির্মলজলের কূপমাত্র মনে করিতাম। কিন্তু এখন তিনি হইলেন মহাসমুদ্রের মত—পুঞ্জীবদ্ধ মেঘপটলের সৃষ্টি করিয়া প্রবল বায়ুবাহনে সমুদ্র যেমন আপনার রসধারা বিতরণ করিয়া শুষ্ক ধরিত্রীকে প্রাণ দান করে, বুদ্ধও সেইরূপ নিজে দুঃখমুক্ত হইয়া অপরকে দুঃখমোচনের পথ দেখাইবার জন্য প্রচারব্রত গ্রহণ করিলেন। এইখানে তাঁহার পরম শ্রেষ্ঠত্ব, এইখানে তাঁহার মহামহত্ব, এইখানেই তাঁহার বুদ্ধত্বলাভের সার্থকতা।

প্রচার মনঃস্থ করিয়া বুদ্ধ আবার ভাবিলেন কাহাকে প্রথমে নবলব্ধ এই গম্ভীর নির্বাণধর্ম বুঝাইবেন? কে ইহার মর্ম ঠিক বুঝিতে পারিবে? প্রাক্তন

শিক্ষকদ্বয় আলার কালাম ও উদ্রক রামপুত্রের কথা তাঁহার মনে হইল; ইঁহারা উভয়েই সুপণ্ডিত ও সাধু ব্যক্তি ছিলেন এবং গৌতমকে আন্তরিক স্নেহ করিতেন। কিন্তু সংবাদ লইয়া বুদ্ধ জানিলেন—শাস্ত্রে আছে দেবতারা আসিয়া বলিয়া গেলেন—তাঁহারা উভয়েই কালপ্রাপ্ত হইয়াছেন। এই সংবাদে বুদ্ধ দুঃখিত হইলেন; তাঁহার মনে আশা ছিল যে ইঁহাদের মত জ্ঞানী ব্যক্তি সহজেই তাঁহার লব্ধ তত্ত্ব বুঝিবেন ও কখনই তাহার প্রতি তাচ্ছিল্য করিবেন না। এত বড় দুই গুণী ব্যক্তি যে নির্বাণতত্ত্ব জানিতে পারিলেন না, ইহাতে বুদ্ধ ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন।



ঋষিপত্তন-মৃগদাব নন্দলাল বসু অঙ্কিত

ঋষিপত্তনে গমন

পূর্বগুরুদ্বয়কে না পাইয়া পূর্বসঙ্গী 'পঞ্চভিক্ষুর' কথা তাঁহার মনে হইল। তিনি কৃচ্ছ্রত্যাগ করিয়া আহার গ্রহণ আরম্ভ করিলে এই "পাঁচজন" তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল। ইহারা এখন বারাণসীর নিকটবর্তী ঋষিপত্তনের মৃগদাব নামক বনে বাস করিতেছে শুনিতে পাইয়া তিনি সেখানে যাওয়া স্থির করিলেন। ঋষিপত্তন তখন সাধুসন্ন্যাসীদের একটি ক্ষেত্র ছিল। হইতে পারে এইজন্যই বুদ্ধ প্রথমে এখানে মতপ্রচার করিতে আসিয়াছিলেন এবং এখানে আসিবার পর পূর্বোক্ত 'পঞ্চভিক্ষুর' সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল।

উরুবিল্ব হইতে আসিবার পথে আজীবিক সম্প্রদায়ের উপক নামক এক নগ্ন সন্ন্যাসীর সহিত তাঁহার দেখা হইল। বুদ্ধের গম্ভীর সুন্দর মূর্তি দেখিয়া উপক বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আয়ুষ্মন্, তোমার মূর্তি প্রশান্ত, তোমার বর্ণ সুন্দর ও উজ্জ্বল। কাহার কথায় তুমি গৃহ ছাড়িলে? কে তোমার গুরু?"

"আমি সকল পাপ নাশ করিয়াছি, সকল রিপু জয় করিয়াছি; আমি পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিয়াছি, সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছি; আমি সর্বত্যাগী, সকল দেবতা ও মানব হইতে আমি শ্রেষ্ঠ; আমি বুদ্ধ। আমি নিজেই যখন পরমজ্ঞান লাভ করিয়াছি তখন কাহাকে আমার গুরু বলিব?"

"তবে কি তুমি জিন ?"

"যাহাদের পাপের মূল ক্ষয় হইয়াছে তাহারা সকলেই আমার মত জিন ; আমি সকল পাপধর্ম জয় করিয়াছি, অতএব আমি জিনই।"

"আয়ুষ্মন্, হইতে পারে"—এই বলিয়া উপক মাথা নাড়িয়া অন্যপথে চলিয়া গেল।

বুদ্ধ-উপক-সংবাদ শাস্ত্রে এইভাবে বর্ণিত আছে কিন্তু সম্ভবতঃ উপকের কথায় প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ ছিল এবং সে বুদ্ধের কথায় বিশ্বাস না করিয়া সন্দিগ্ধতায় মাথা নাড়িয়া পাশ কাটাইয়া স্থানত্যাগ করিয়াছিল। পণ্ডিতেরা কেহ বলিয়াছেন উপকের প্রথম প্রশ্নের বুদ্ধ সগর্ব উত্তর দিয়াছিলেন। বস্তুতঃ বোধহয় ইহাতে গর্ব নহে, তেজ ছিল। সেই যুগে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে কিরূপ বিদ্বেষ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল তাহাব উল্লেখ পূর্বে করা হইয়াছে। বোধিলাভের পর অন্য সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে উপকের সঙ্গেই বুদ্ধের প্রথম সাক্ষাৎ, কাজেই এই নগ্ন সন্ন্যাসীর সহিত জোরের সঙ্গে কথা বলার প্রয়োজন ছিল। আজীবিক নিগ্রন্থ প্রভৃতিরা সাধনার চরম ফললাভকে জিনত্ব-লাভ বলিতেন। পরে বৌদ্ধরাও একই অর্থে এই কথাটিব ব্যবহার গ্রহণ করিয়াছিলেন। উপকের ধারণায় বোধহয় গোশাল ব্যতীত অন্য ব্যক্তি কেহ 'জিন' ছিল না এবং সে নিজেও এই পরমপদ লাভের বাসনা পোষণ করিত, তাই একজন অজ্ঞাত-কুলশীল লোক যখন সকল পাপ নষ্ট করিযাছে. সকল রিপু জয় করিয়াছে, সকল দেবমানব হইতে সে শ্রেষ্ঠ প্রভৃতি বড় বড় কথা বলিল তখন উপক বিদ্রূপ করিয়া বলিল "তবে বল যে তুমি একজন জিন!" এসত্ত্বেও বুদ্ধ যখন আপনার দাবি পুনরায় প্রকাশ করিলেন, তখন সে অগত্যা অন্য পথে চলিয়া গেল। উপক সম্ভবতঃ বুদ্ধকে বিকৃতমস্তিষ্ক বা অতি অহংকারী ভাবিয়াছিল। উপকের পরে যে হাস্যকর ভাগ্যবিপর্যয় হইয়াছিল তাহা যথাস্থানে বলিব।

পথে কয়েকস্থানে বিশ্রাম করিয়া বুদ্ধ গঙ্গাতীরে উপনীত হইলেন। গঙ্গায় তখন বর্ষার প্রবল স্রোত, নৌকায় পারাপার করিতে হয় অথচ তাঁহার কাছে একটি কড়িও ছিল না। তাঁহাকে পার করিতে খেয়ার মাঝি গণ্ডগোল করিয়াছিল। পরে এই কথা জানিতে পারিয়া রাজা বিম্বিসার বিনা শুল্কে ভিক্ষু-শ্রমণদের এই স্থানে খেয়া-পারাপারের আজ্ঞা দিয়াছিলেন।

বারাণসীতে পৌছিয়া বুদ্ধ ঋষিপত্তন-মৃগদাবে গেলেন। "পঞ্চভিক্ষু" দূর হইতে তাঁহাকে আসিতে দেখিল ও তাঁহার কান্তিময় মূর্তি দেখিয়া ভাবিল নিশ্চয় তিনি কৃচ্ছ্র ত্যাগ করিয়া আরামে খাওয়াদাওয়া করিতেছেন। তাহারা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল, "শ্রমণ গৌতম ব্রতভঙ্গকারী ও সুখলিপ্সু, তাহার সহিত আমরা কথা বলিব না, তাহাকে গ্রাহ্য করিব না, সে আসিলে উঠিয়া দাঁড়াইব না বা কোনরূপ সম্মান দেখাইব না। একখানা আসন পাতিয়া রাখিব, ইচ্ছা হইলে সে বসিবে।"



ঋষিপত্তনে বুদ্ধ ও পঞ্চভিক্ষু — নন্দলাল বসু অঙ্কিত

বুদ্ধ তাহাদের দেখিতে পাইয়া তাহাদের কাছে আসিলেন। বর্ণিত আছে তাঁহাকে নিকটে আসিতে দেখিয়া পঞ্চভিক্ষুর পূর্বের যুক্তি সব ব্যর্থ হইয়া গেল, পাঁচজনেই আসন ছাড়িয়া উঠিয়া তাঁহাকে সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা করিল। তাহারা পূর্বের অভ্যাসানুযায়ী তাঁহাকে পরিচিত সমপদস্থের মত 'আয়ুষ্মন্ গৌতম' বলিয়া সম্বোধন করিল। বুদ্ধ বলিলেন—"হে ভিক্ষুগণ, তথাগতকে নাম ধরিয়া ডাকিও না বা 'আয়ুষ্মন্' বলিয়া সম্বোধন করিও না। ভিক্ষুগণ, তথাগত সম্যক্ সম্বোধি লাভ করিয়াছেন। হে ভিক্ষুগণ, আমার কথায় কান দাও, আমি অমৃত লাভ করিয়াছি। আমি উপদেশ দিব, আমি তোমাদিগকে ধর্ম শিক্ষা দিব। আমার প্রদর্শিত পথে চলিলে তোমরাও অচিরে সেই ধর্ম নিজে বুঝিতে পারিবে ও সাক্ষাৎ জানিতে পারিবে।"

"আয়ুষ্মন্ গৌতম, তুমি তো পূর্বের চর্যাদ্বারা মনুষ্যোত্তর শক্তি বা জ্ঞান লাভ কর নাই। এখন তুমি পূর্বের চর্যা ত্যাগ করিয়া বাহুল্য ভোগের দ্বারা কিরূপে তাহা লাভ করিলে?"

"হে ভিক্ষুগণ, তথাগত বাহুল্যভোগে আসক্ত নহেন, তিনি চর্যা ত্যাগ করিয়া ভোগে লিপ্ত হন নাই। হে ভিক্ষুগণ, আমার কথায় কান দাও, আমি

অমৃত লাভ করিয়াছি ; আমি উপদেশ দিব, আমি তোমাদিগকে ধর্মশিক্ষা দিব। আমার প্রদর্শিত পথে চলিলে তোমরাও অচিরে সেই ধর্ম নিজে বুঝিতে পারিবে ও সাক্ষাৎ জানিতে পারিবে।"

পঞ্চভিক্ষু আবার একই উত্তর দিল। কয়েকবার এইরূপ উত্তর-প্রত্যুত্তরের পর বুদ্ধ বলিলেন—"হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি স্বীকার কর যে আজ আমি তোমাদিগকে যাহা বলিতেছি, পূর্বে কখনও এরূপ বলি নাই ?"

"না ভদন্ত, আপনি সেরূপ বলেন নাই",

"হে ভিক্ষুগণ, তথাগত সম্যক্ সম্বোধি লাভ করিয়াছেন। হে ভিক্ষুগণ, আমার কথায় কান দাও, আমি অমৃত লাভ করিয়াছি। আমি তোমাদিগকে উপদেশ দিব, ধর্মশিক্ষা দিব, আমার প্রদর্শিত পথে চলিলে তোমরাও অচিরে······"।

পঞ্চভিক্ষু আর আপত্তি করিল না। তখন সন্ধ্যা হইয়াছিল। বুদ্ধ তাহাদের কাছে ধর্মব্যাখ্যা করিলেন।

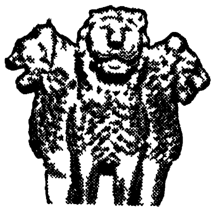
প্রথম উপদেশ

বুদ্ধ বলিলেন "হে ভিক্ষুগণ, যে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছে তাহাকে দুইটি অন্ত পরিহার করিতে হইবে। এই দুইটি অন্ত কি কি ? প্রথমতঃ ভোগ ও কামসুখের পথ—ইহা হীন গ্রাম্য নীচ অনার্য ও অনর্থক ; দ্বিতীয়তঃ শরীর-নিগ্রহের পথ—ইহা দুঃখকর অনার্য ও অনর্থক। হে ভিক্ষুগণ, এই দুই চরম পথ ত্যাগ করিয়া তথাগত মধ্যপথের জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। যাহাতে চক্ষু হয়, জ্ঞান হয়, উপশম হয়, অভিজ্ঞা হয়, সম্বোধি হয় এবং নির্বাণলাভ হয়, সেই মধ্য পথ কি ? ইহা আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অর্থাৎ—১. সম্যক্ দৃষ্টি (অর্থাৎ বিশ্বাস, মত) ; ২. সম্যক্ সংকল্প ; ৩. সম্যক্ বাক্য ; ৪. সম্যক্ কর্ম ; ৫. সম্যক্ জীবিকা ; ৬. সম্যক্ ব্যায়াম (অর্থাৎ চেষ্টা বা প্রয়াস) ; ৭. সম্যক্ স্মৃতি ; এবং ৮. সম্যক্ সমাধি (অর্থাৎ চিন্তা)।

"হে ভিক্ষুগণ, এই সেই মধ্য পথ যাহার জ্ঞান তথাগত লাভ করিয়াছেন এবং যাহাতে চক্ষু হয়, জ্ঞান হয়, উপশম হয়···নির্বাণ লাভ হয়।"

বুদ্ধ আরও বলিলেন—"হে ভিক্ষুগণ, দুঃখের আর্য সত্য এই—জন্মে দুঃখ, জরায় দুঃখ, ব্যাধিতে দুঃখ, মরণে দুঃখ, অপ্রিয়ের সহিত সংযোগে দুঃখ,

প্রিয়ের সহিত বিয়োগে দুঃখ, যাহা পাইতে ইচ্ছা হয় তাহা না পাইলে দুঃখ, সংক্ষেপে বলিতে গেলে পাঁচটি উপাদান-স্কন্ধই (অর্থাৎ রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান) দুঃখ ;



সারনাথ অশোকস্তম্ভশীর্ষে বুদ্ধের ধর্মপ্রচার প্রতীক সিংহচতুষ্টয় মূর্তি

"হে ভিক্ষুগণ, দুঃখ-উদয়েব আর্যসত্য এই—তৃষ্ণা হইতে পুনর্জন্ম হয়, তৃষ্ণা হইতেই সুখভোগেব কামনা হয়, তৃষ্ণাই বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে তৃপ্তি অন্বেষণ কবে। এই তৃষ্ণা তিন প্রকার, সুখতৃষ্ণা ভবতৃষ্ণা (বা বাঁচিয়া থাকিবার ইচ্ছা) ও বিভবতৃষ্ণা ;

"হে ভিক্ষুগণ, দুঃখ-নিরোধেব আর্যসত্য এই—এই তৃষ্ণাব সম্পূর্ণ কামনাহীন নিরোধ, ইহাব ত্যাগ, ইহাব প্রতিবিসর্জ্জন, ইহা হইতে মুক্তি এবং ইহার উচ্ছেদ হইলে দুঃখের নিরোধ হয় ;

"হে ভিক্ষুগণ, দুঃখনিবোধ-পথের আর্যসত্য এই—ইহা সেই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, অর্থাৎ সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সংকল্প, সম্যক্ বাক্য, সম্যক্ কর্ম, সম্যক্ জীবিকা, সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি ও সম্যক্ সমাধি ;

"হে ভিক্ষুগণ, দুঃখেব এই আর্যসত্য যদিও পূর্বে অনমুস্মৃত ধর্ম ছিল, তথাপি ইহা যে আমাকে নির্ণয় কবিতে হইবে, এ সম্বন্ধে আমার চক্ষু জন্মিল, প্রজ্ঞা জন্মিল, শ্রদ্ধা জন্মিল, বিদ্যা জন্মিল, আলোক জন্মিল ;

"হে ভিক্ষুগণ, দুঃখের এই আর্যসত্য যদিও পূর্বে অনমুস্মৃত ধর্ম ছিল, তথাপি আমি যে ইহা নির্ণয় করিলাম, এ সম্বন্ধে আমার চক্ষু জন্মিল, জ্ঞান জন্মিল······আলোক জন্মিল ;

"হে ভিক্ষুগণ, দুঃখের এই আর্যসত্য পূর্বে অনমুস্মৃত ধর্ম ছিল কিন্তু ইহাতে আমার চক্ষু জন্মিল······আলোক জন্মিল ;

"হে ভিক্ষুগণ, দুঃখ-উদয়ের আর্যসত্য যদিও পূর্বে অননুস্মৃত ধর্ম ছিল, তথাপি আমাকে যে ইহা পরিহার করিতে হইবে......এবং আমি যে ইহা পরিহার করিলাম, এ সম্বন্ধে আমার চক্ষু জন্মিল......আলোক জন্মিল ;

"হে ভিক্ষুগণ, দুঃখ নিরোধের এই আর্যসত্য পূর্বে অননুস্মৃত ধর্ম ছিল কিন্তু দুঃখনিরোধ সম্বন্ধে, আমাকে যে দুঃখের সম্পূর্ণ নিরোধ করিতে হইবে এবং আমি যে দুঃখের সম্পূর্ণ নিরোধ করিলাম, সে সম্বন্ধেও আমার চক্ষু জন্মিল......আলোক জন্মিল ;

"হে ভিক্ষুগণ, যত দিন পর্যন্ত তিন প্রকার ও বারো রকমের এই আর্যসত্য-চতুষ্টয় সম্বন্ধে আমার জ্ঞানদর্শন যথাযথরূপে সুবিশুদ্ধ হয় নাই, ততদিন আমি ঠিক জানিতাম না যে এই সম্যক সম্বোধি, যাহা কোনও শ্রমণ ব্রাহ্মণ দেবতা বা মনুষ্য পূর্বে লাভ করে নাই, তাহা আমি লাভ করিয়াছি কিনা ;

"কিন্তু হে ভিক্ষুগণ, যখন এই আর্যসত্য সম্বন্ধে আমার জ্ঞানদর্শন যথাযথরূপে সুবিশুদ্ধ হইল, তখন আমি দেখিলাম যে, দেবমানব শ্রমণব্রাহ্মণ কেহ যাহা লাভ করে নাই, সেই সম্যক্-সম্বোধি আমি লাভ করিয়াছি। এখন আমার সেই জ্ঞানদর্শন জন্মিয়াছে। আমার চিত্তের বিমুক্তি চিরস্থায়ী ; এই আমার শেষ জন্ম ; আর আমাকে সংসারে আসিতে হইবে না।"

শাস্ত্রবিবরণের ইহাই সারাংশ। বুদ্ধ যে একই বারে এই সমগ্র ব্যাখ্যানটি বলিয়াছিলেন, বস্তুতঃপক্ষে তাহা নহে। তিনি যে ঐ কথাগুলিই মাত্র বলিয়াছিলেন তাহাও নহে। শাস্ত্রের বিবরণে দেখা যায় বুদ্ধ কিছুকাল ধরিয়া শ্রোতাদের বুঝাইয়াছিলেন ও তাহাদের সহিত অনেক তর্কবিতর্ক করিয়াছিলেন। পরবর্তী কালের শাস্ত্রপ্রণেতারা বিধিবদ্ধভাবে যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা একাধিকবারের বহুকথার সারসংগ্রহ। এই ব্যাখ্যান দ্বারা বুদ্ধ 'ধর্মচক্র-প্রবর্তন' করিলেন। এখানে 'চক্র'-শব্দের অর্থ রাজ্য বা রাজত্ব।

এই ব্যাখ্যানটি বিশ্লেষণ করিলে আমরা কয়েকটি বিষয় দেখিতে পাই—১. তিনি একটা খুব বড় বস্তু পাইয়াছেন যাহা অন্য কেহই পূর্বে পায় নাই ; ইহা একটি নূতন তথ্য, পূর্বে কেহ এই ধর্মের অনুসরণ করে নাই ; তিনি সাক্ষাৎ ইহা জানিয়াছেন এবং তাঁহার নির্দিষ্ট পথে চলিলে সকলেই ইহা জানিতে পারিবে। ২. তিনি যাহা জানিয়াছেন তাহা বিষয়ভোগ এবং

কৃচ্ছ্রসাধন, এই দুইয়ের দ্বারা জানা যায় না। ৩. তিনি জানিয়াছেন যে সংসার দুঃখময়, তৃষ্ণা হইতে দুঃখের উৎপত্তি, তৃষ্ণা ত্যাগে দুঃখের নিরোধ এবং 'অষ্টাঙ্গিক মার্গ' অনুসরণ করিলে মধ্যপথ অবলম্বন ও দুঃখনিরোধ হয়।

বুদ্ধের সমগ্র জীবনের বাক্য ও কার্যাবলী এই উপদেশেরই প্রতিধ্বনি।

পঞ্চভিক্ষু ব্যতীত বুদ্ধের এই উপদেশ-শ্রোতাদের মধ্যে অন্য লোকও নিশ্চয় ছিল কারণ ঋষিপত্তনে তত্ত্বজিজ্ঞাসু বহু লোকের সমাগম হইত। পঞ্চভিক্ষুর মধ্যে কৌণ্ডিণ্যই নাকি সর্বপ্রথমে বুদ্ধের উপদেশের মর্মগ্রহণ ও তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করে। কয়েকদিন বুঝাইবার পর আরও দুই ভিক্ষু বুদ্ধের সহিত একমত হইল। এই তিনজন ভিক্ষায় বাহির হইত, বুদ্ধ কুটিরে বসিয়া বাকি দুইজনকে বুঝাইতেন এবং তাহাদের সহিত তর্কবিতর্ক করিতেন। ক্রমে ইহারাও তাঁহার শিষ্য হইল। এই পূর্ব সঙ্গীরা সহজে বুদ্ধের শিক্ষা গ্রহণ করে নাই, নূতন কথা সহজে কেহ গ্রহণ করেও না এবং ইহাতে আরও বুঝা যায় যে, বুদ্ধকে বেশ কিছুদিন ধরিয়া তাঁহার নবশিক্ষা লোকের কাছে প্রথম উপস্থাপিত করিতে হইয়াছিল।

সকলেই জানেন আত্মা বলিয়া কোনও কিছু আছে, এ কথা বুদ্ধ মানিতেন না। পঞ্চভিক্ষু তাঁহার অনাত্মবাদ গ্রহণ না করায় বুদ্ধ এই ভাবে তাহাদের বুঝাইয়াছিলেন—"হে ভিক্ষুগণ, শরীর (রূপ) আত্মা নহে; শরীর যদি আত্মা হইত, তবে শরীরে রোগ হইত না এবং শরীর সম্বন্ধে বলা যাইতে পারিত শরীর এরূপ হউক, শরীর এরূপ না হউক; শরীর আত্মা নহে বলিয়াই তাহাতে রোগ হয় ও শরীর সম্বন্ধে আমরা এরূপ কথা বলিতে পারি না। (সেইরূপ বেদনা সংজ্ঞা সংস্কার ও বিজ্ঞান সম্বন্ধেও এইভাবে দেখান যাইতে পারে যে ইহাদের কোনটিই আত্মা নহে)।

"হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি মনে কর? শরীর নিত্য না অনিত্য?"

"ভদন্ত, শরীর অনিত্য;"

"যাহা অনিত্য তাহাতে দুঃখ হয়, না সুখ হয়?"

"ভদন্ত, তাহাতে দুঃখ হয়;"

"যাহা অনিত্য দুঃখময় ও বিনাশশীল, তাহার সম্বন্ধে কি ইহা আমার, ইহা আমি, ইহা আত্মা, এরূপ বলা যায়?"

"না ভদন্ত, এরূপ বলা যায় না;"

"হে ভিক্ষুগণ, সেইরূপ বেদনা সংজ্ঞা সংস্কার ও বিজ্ঞান, কিছুরই সম্বন্ধে এরূপ বলা যায় না। ইহা দেখিয়া বুদ্ধিমান শিক্ষার্থীর এগুলি সম্বন্ধে নির্বেদ উপস্থিত হয়; নির্বেদ হইতে বৈরাগ্য হয়; বৈরাগ্য হইতে মুক্তি হয়। মুক্তি হইলে 'আমি মুক্ত হইয়াছি' এরূপ জ্ঞান হয় ও বোধ জন্মে যে আব জন্মগ্রহণ করিতে হইবে না, সাধনা সমাপ্ত হইয়াছে, কর্তব্য শেষ হইয়াছে, আর সংসাবে আসিতে হইবে না।"

আমরা ক্রমে বৌদ্ধ দর্শন ও ধর্মের অতি সংক্ষেপে কিছু পরিচয় দিব। বৌদ্ধ দর্শন পরবর্তী কালে বর্ধিত হইয়া যে আকার ধাবণ করিয়াছিল, তাহার সহিত বুদ্ধের নিজেব প্রচারিত বাণীর অনেক প্রভেদ দাঁড়াইয়াছিল এবং উত্তব কালের বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শনে এমন অনেক বিষয়ও স্থান লাভ করিয়াছিল যাহা হযতো বুদ্ধ বলেন নাই বা যাহার কোনও প্রয়োজনীয়তাও হয়তো তিনি স্বীকার করিতেন না। এই গ্রন্থ বৌদ্ধদর্শনের বিস্তৃত আলোচনার স্থান নহে, 'অভিধর্মে'র গহন অরণ্যে প্রবেশ করিলে আমরা বুদ্ধবাণীর মূলবৃক্ষটি হারাইয়া ফেলিব। 'অভিধর্মে'র সমৃদ্ধিবৈচিত্র্য যে মূলসূত্রগুলি হইতে জাত হইয়াছিল এবং যাহার আরম্ভ খুব সম্ভবতঃ বুদ্ধের নিজেব শিক্ষাতেই ছিল, এরূপ কয়েকটি প্রধান প্রধান বিষযমাত্র বুদ্ধেব জীবন ও বাণী বুঝিবার সুবিধার জন্য আমরা উল্লেখ করিব।

বৌদ্ধদর্শনের কযেকটি মূলকথা

বুদ্ধ বৃথা দার্শনিক তর্কজাল মোটেই ভালবাসিতেন না, নির্বাণলাভের জন্য ইহার কোনও প্রয়োজনীয়তাও তিনি স্বীকার করিতেন না। তাঁহার নিকট সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কথা ছিল নির্বাণলাভ ও নির্বাণলাভের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল দুঃখ-নিরোধ। যাহার নিরোধ করিতে হইবে তাহার উৎপত্তি জানা প্রয়োজন, রোগের নিদান না জানা থাকিলে চিকিৎসা করিয়া রোগ দূর করা যায় না। অতএব দুঃখ-উদয়ের হেতু আলোচনাতেই বুদ্ধের দার্শনিক মতের উদ্ভব। দুঃখ-উদয়ের হেতু নির্ণয় করিতে বুদ্ধ কারণ পর্যালোচনা করিয়া কার্যকারণের একটি সূত্র পাইয়াছিলেন, বৌদ্ধদর্শনে ইহাকে প্রতীত্য-সমুৎপাদ বলা হয়। এই কার্যকারণ-ধারার একটি অন্তে দুঃখ অর্থাৎ জরা মৃত্যু শোক বিলাপ কষ্ট অশান্তি ও উপদ্রব।

এই দুঃখ কেন হয়? সংসারে জন্মগ্রহণ করি বলিয়াই এই দুঃখ ভোগ করিতে হয়, অতএব জন্ম ইহার কারণ। জন্ম কেন হয়? অস্তিত্ব হইতে জন্ম হয়। অস্তিত্ব কোথা হইতে আসে? আমরা ইন্দ্রিয়সুখ, কুবিশ্বাস, ক্রিয়াকাণ্ডে বিশ্বাস এবং আমাদের একটা আত্মা আছে, এই ধারণা আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকি বলিয়া অস্তিত্ব আসে। এই ধারণাগুলি আঁকড়াইয়া থাকি কেন? তৃষ্ণার বশে আঁকড়াইয়া থাকি। তৃষ্ণা কোথা হইতে জন্মে? সুখ-দুঃখ অনুভব হইতে তৃষ্ণা জন্মে। অনুভবের কারণ কি? বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের স্পর্শ হইতে অনুভবের উৎপত্তি। স্পর্শ কোথা হইতে হয়? পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও মনোরূপ জ্ঞানেন্দ্রিয়, এই ছয়দ্বার বা ষড়ায়তন দ্বারা বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের স্পর্শ হয়। ছয় ইন্দ্রিয় কোথা হইতে আসে? সূক্ষ্ম ও স্থূল দেহীর ব্যক্তি হইতে ছয় ইন্দ্রিয় জন্মে। ব্যক্তি কোথা হইতে আসে? চেতনা হইতে ব্যক্তিত্ব জন্মে। চেতনার কারণ কি? নামরূপ বেদনা সংজ্ঞা সংস্কার ও বিজ্ঞান, এই পাঁচটি 'স্কন্ধ' হইতে সকল পদার্থের উদ্ভব, ইহাদের সমষ্টিকে 'সংখারা' (সংস্কারাঃ) বলে এবং 'সংখারা' হইতে চেতনা জন্মে। সংস্কারগুলি কোথা হইতে আসে? অবিদ্যা হইতে সংস্কারগুলির উৎপত্তি হয়। অতএব অবিদ্যাই দুঃখের আদি মূল।

মূল হইতে আরম্ভ করিলে বলা হয় অবিদ্যা হইতে সংস্কারগুলি, সংস্কারগুলি হইতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান হইতে নামরূপ, নামরূপ হইতে ষড়ায়তন, ষড়ায়তন হইতে স্পর্শ, স্পর্শ হইতে বেদনা, বেদনা হইতে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা হইতে উপাদান, উপাদান হইতে ভব, ভব হইতে জাতি এবং জাতি হইতে জরা-মরণ-শোক-পরিবেদন-দুঃখ-দৌর্মনস্য-উপায়াস জন্মে। এই কার্য-কারণ-ধারার বিভিন্ন তরঙ্গগুলি সর্বদা একভাবে বলা হয় না, কখন কখনও পর্যায়ের কিছু ক্রমভেদ করা হয়, কখনও বা কয়েকটি তরঙ্গ বাদ দেওয়া হয়।

ধর্মের পথ

বুদ্ধের নিকট দর্শনের উপরে ছিল ধর্মের স্থান। ধর্ম শুধু তর্ক বা বিচারের বস্তু নহে, ইহা অভ্যাস ও ব্যবহারের বস্তু। ধর্ম অভ্যাস করিতে হইলে পাঁচটি ব্রত গ্রহণ করিতে হইত, যথা—১. জীব হিংসা না করা,

২. অদত্ত গ্রহণ না করা, ৩. অবৈধ ইন্দ্রিয়সেবা না করা, ৪. অসত্য না বলা, এবং ৫. মাদকদ্রব্য ব্যবহার না করা। এই পাঁচটি ব্রত পালন ও মানসিক উন্নতি সাধনের সঙ্গে সঙ্গে সাধক আধ্যাত্মিক প্রগতির পথে অগ্রসর হয়। এই প্রগতি-মার্গ চারটি স্তরে বিভক্ত হইত, যথা—

১. স্রোতাপন্ন—ইহাতে সাধক ধর্মমার্গে উন্নতির স্রোতে প্রবেশ করে। এখানে শরীরস্থ অবিনশ্বর আত্মায় বিশ্বাস, সন্দিগ্ধতা ও ক্রিয়াকাণ্ডের ফলে বিশ্বাস, এই তিনটি বন্ধন ছিন্ন করিতে হয়। ইহার ফলে স্রোতাপন্ন ব্যক্তিকে আর দুঃখযোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না এবং তাহার বোধি-লাভের নিশ্চয়তা জন্মে;

২. সকৃদাগামি—পূর্বোক্ত বন্ধনত্রয় ছিন্ন করিলে ও ইন্দ্রিয় দমন করিলে সাধক এই স্তরে প্রবেশ করে। এই স্তরে পৌছিয়া উদ্দেশ্য সিদ্ধির পূর্বেই মৃত্যু হইলে সাধককে দুঃখনিরোধের জন্য 'সকৃৎ' অর্থাৎ আর একবার মাত্র সংসারে জন্মগ্রহণ করিতে হয়;

৩. অনাগামি— পূর্বোক্ত বন্ধনত্রয় এবং ইন্দ্রিয়বশ্যতা ও দ্বেষ সম্পূর্ণ নির্মূল করিলে সাধক উচ্চতর জন্মলাভ করে এবং সেইখানেই নির্বাণ লাভ করে আর তাহাকে এই সংসারে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। এই তিনটি স্তরে পুণ্যসঞ্চয় বলিয়া কোনও বস্তুর স্থান নাই। নৈতিক উন্নতিই ইহার সার কথা। অবৈধ কর্ম যে সকল মনোবৃত্তি হইতে প্রসূত হয়, তাহার উচ্ছেদ করিতে হয় এবং তাহা অপেক্ষাও অধিক প্রয়োজনীয় হইতেছে সংসারে থাকিবার যে তৃষ্ণা, তাহা যে কোনও প্রকারেরই হউক না কেন, তাহার সম্পূর্ণ উচ্ছেদসাধন। দুঃখ-উদয়ের কারণ ও দুঃখ-নিরোধের পথ সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মিলে এই তৃষ্ণার উচ্ছেদ হয়। তৃষ্ণা দূর হইলে চতুর্থ স্তর লাভ হয়;

৪. অর্হৎ—এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে সাধক, যদি পূর্বেই না করিয়া থাকেন, তবে নিশ্চয় সংসার ত্যাগ করেন। সংসারের লোক যে তৃষ্ণার বশে সংসারে থাকিতে চায় সে তৃষ্ণা এ স্তরে সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয়। চিত্তের বিমুক্তি ও প্রজ্ঞা এই দুইএর অনুভবের আনন্দেই অর্হৎ মগ্ন থাকেন। অর্হত্ত্ব লাভই সাধনার চরম ফল, ইহাই নির্বাণ, এবং ইহা লাভ করিবার পথ হইতেছে 'অষ্টাঙ্গ মার্গ' অনুসরণ।

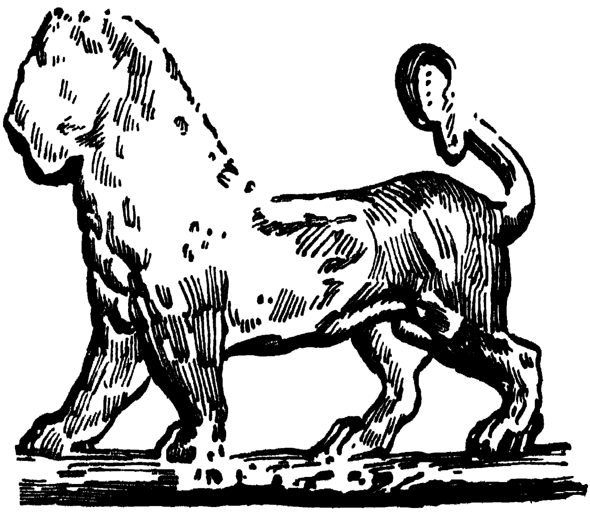
বৌদ্ধধর্মে খুব বড় স্থান অধিকার করিয়াছিল এরূপ আর দুইটি বিষয় সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। এই দুইটি বিষয় হইতেছে ধ্যান ও প্রজ্ঞা।

ধ্যান—ইন্দ্রিয় এবং মন সংযত করিয়া, লোভ ও ক্ষোভ ত্যাগ করিয়া, অবৈধ চিন্তা হইতে মুক্ত হইয়া, নিকলুষ আনন্দের সহিত, দ্বেষহীন ও সর্বজীবের প্রতি অনুকম্পাবান হইয়া, আলস্য প্রমাদ ও সন্দেহ ত্যাগ করিয়া সাধক নির্জন স্থানে আসন গ্রহণ করিয়া সুখ ও প্রীতির উদয় অনুভব করিবেন। মনে যখন আনন্দ অনুভব হইবে, শরীর তখন স্থৈর্য্য ও সুখ লাভ করিবে এবং চিত্ত একাগ্র হইবে। তখন সাধক একটির পর একটি ক্রমে ধ্যানের চারটি অবস্থা প্রাপ্ত হইবেন। প্রথম অবস্থায় বিতর্ক ও বিচার থাকিবে এবং সমগ্র দেহমন আনন্দে পূর্ণ হইবে; দ্বিতীয় অবস্থায় বিতর্ক ও বিচারের অবসান হইবে, চিত্ত একাগ্র হইয়া স্থির হইবে এবং সমগ্র দেহমন সুখ ও প্রীতিতে পরিপূর্ণ হইবে; তৃতীয় অবস্থায় প্রিয় ও অপ্রিয়ের সম্বন্ধে মধ্যস্থভাব অবলম্বন করিয়া সমগ্র দেহমন সুখ ও প্রীতিতে পূর্ণ হইবে; এবং চতুর্থ অবস্থায় সুখ দুঃখ উভয়ই ত্যাগ করিয়া, বিশুদ্ধ সমনস্কতা ও মধ্যস্থতার সহিত সাধক সমগ্র দেহকে শুদ্ধ ও পবিত্র মনদ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া বিরাজ করিবেন।

প্রজ্ঞা ও ধ্যানের সাহায্যে সাধক জ্ঞান-অন্তর্দৃষ্টিতে মনঃসংযোগ করিয়া তদ্দ্বারা স্থূল শরীরের উপাদান উপকরণ জন্ম বৃদ্ধি ও নাশ বুঝিবেন। তাহার পর তিনি একটি মনোময় দেহ সৃষ্টি করিয়া বিভূতি লাভ করিবেন, এক হইতে বহু হইবেন, বহু হইতে এক হইবেন, প্রাচীর বা পর্বতাদির বাধা ভেদ করিয়া যাইবেন, পৃথিবী হইতে বাহিরে যাতায়াত করিবেন, জলের উপর ও আকাশের মধ্য দিয়া যাইবেন, চন্দ্রসূর্য স্পর্শ করিবেন এবং অপরের মনোভাব জানিতে পারিবেন। অতঃপর তিনি নিজের পূর্বজন্ম স্মরণ করিবেন এবং অপর জীবের বিনাশ ও জন্মান্তর গ্রহণ জানিবেন। অবশেষে তিনি দুঃখ-উদয়ের কারণগুলি বিনাশের জ্ঞান লাভ করিয়া নির্বাণপ্রাপ্ত হইবেন।

পূর্বোল্লিখিত বিষয়গুলির কতখানি বুদ্ধের নিজের শিক্ষা ছিল এবং কতখানি পরবর্তী কালের বৌদ্ধ পণ্ডিত ও দার্শনিকগণের শিক্ষা, সে বিষয়ে আধুনিক পণ্ডিতগণ সন্দেহবান্। এখানে মাত্র এইটুকু বলিলে যথেষ্ট হইবে যে শাস্ত্রে যত কিছু শিক্ষা বা মতামত আছে তাহা সবই বুদ্ধকথিত, এরূপ মনে করা অসঙ্গত।

বৌদ্ধশাস্ত্রে সন্ন্যাসবাদ অতি প্রধান বিষয়। আধুনিক পণ্ডিতগণ কেহ কিন্তু বুদ্ধের বাণী ও আচরণ হইতে মনে করেন বুদ্ধ পূর্ণ সন্ন্যাসবাদী ও সংসারবিরোধী ছিলেন না। যদি তিনি পূর্ণসন্ন্যাসবাদী হইতেন তবে তিনি তাঁহার শিক্ষাকে 'মধ্যপথ' না বলিয়া বোধহয় সন্ন্যাসপথই বলিতেন। তিনি 'অত্যন্ত' ভোগ ও 'অত্যন্ত' সন্ন্যাস এই দুইটিরই পরিহার শিক্ষা দিয়াছিলেন। গৃহীগণকে তিনি সাধারণতঃ সন্ন্যাস শিক্ষা দিতেন না, "অষ্টাঙ্গিক মার্গের" ধর্মাচরণ শিক্ষা দিতেন। যাহার বৈরাগ্যোদয় ও সংসারমুক্তি লাভের কামনা হইয়াছে, মাত্র তাহাকেই তিনি সন্ন্যাসশিক্ষা দিতেন। তাঁহার শিক্ষায় নির্বাণলাভের প্রথম সোপান হইতেছে, মুখে নহে পরন্তু কার্যতঃ ধর্মাচরণ ও ধর্মাভ্যাস এবং তাহার মূল হইতেছে উদ্যম ও প্রয়াস।



সারনাথ অশোকস্তম্ভগাত্রে বুদ্ধের ধর্মপ্রচার-প্রতীক সিংহমূর্তি

৪

প্রচারব্রত

এখন আমরা পুনরায় বুদ্ধের জীবনী আলোচনা করিব। ঋষিপত্তনে বুদ্ধ একদিন প্রাতঃকালে তাঁহার কুটিরের সম্মুখে পদচারণা করিতেছেন এমন সময়ে একটি ভদ্রসন্তানকে তাঁহার দিকে আসিতে দেখিয়া তিনি কুটিরের ভিতর গিয়া আসনে বসিলেন। যুবক তাঁহার কাছে আসিয়া বলিল "কি উপদ্রব, কি বিপদ!" যুবকের এরূপ বলিবার কারণ ছিল এই—সে বারাণসীর এক ধনাঢ্য শ্রেষ্ঠীর পুত্র, তাহার নাম যশ। সে বিলাসে লালিতপালিত হইয়াছিল কিন্তু ভোগসুখে বিরক্তি বোধ হওয়ায় সে বাড়ী হইতে পলাইয়া সাধু সন্ন্যাসীদের কাছে ঋষিপত্তনে আসিয়াছিল। নিদ্রিতা নর্তকীগণের আলুথালু বসন, স্বপ্নঘোরে বিকট অঙ্গভঙ্গি প্রভৃতি দেখিয়া বুদ্ধের সংসারবিরক্তির যে কাহিনী বৌদ্ধ কাব্যে প্রচলিত আছে, পালিশাস্ত্রে তাহা এই যশের জীবনে ঘটিয়াছিল বলা হইয়াছে। যশের কথার উত্তরে বুদ্ধ বলিলেন "এখানে কোনও বিপদ নাই, কোনও উপদ্রব নাই। এস যশ, এখানে বস, আমি তোমাকে ধর্মোপদেশ দিব।" বুদ্ধ উপদেশ দিতে লাগিলেন ও যশ বিনীতভাবে তাঁহার কথা শুনিতে লাগিল। এদিকে যশের পিতা পুত্রের অন্বেষণে বাহির হইয়া তাহার জরির জুতার চিহ্ন ধরিয়া ঋষিপত্তনে উপস্থিত হইলেন। যশের পিতা আসিতেছেন দেখিয়া বুদ্ধ বোধহয় যশকে লুকাইয়া থাকিতে বলিয়াছিলেন, অথবা যশ নিজেই হয়তো লুকাইয়াছিল, শাস্ত্রে আছে বুদ্ধ মায়াবলে যশকে অদৃশ্য করিয়া ফেলিয়াছিলেন। শ্রেষ্ঠী আসিয়া যশের কথা জিজ্ঞাসা করিলে বুদ্ধ বলিলেন "গৃহপতি, এখানে বস, এখানে বসিয়া থাকিলে যশকে দেখিতে পাইবে।" তারপর তিনি শ্রেষ্ঠীর সহিত ধর্মালাপ আরম্ভ করিলেন। শ্রেষ্ঠী তাঁহাকে ভক্তি জানাইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। যশের পিতাই বুদ্ধের প্রথম গৃহী শিষ্য। তারপর বুদ্ধ যশকে বাহির করিয়া শ্রেষ্ঠীর সহিত সাক্ষাৎ করাইলেন। শ্রেষ্ঠী পুত্রকে এই বলিয়া গৃহে ফিরিতে অনুরোধ করিলেন যে তাহার মাতা শোকে মৃতপ্রায়া হইয়াছেন। যশ কিছু না বলিয়া বুদ্ধের মুখের দিকে তাকাইল। বুদ্ধ শ্রেষ্ঠীকে বলিলেন শ্রেষ্ঠীর মত

তাঁহার পুত্রেরও জ্ঞানোদয় হইয়াছে, সেও তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছে ও সংসারের মায়া কাটাইয়াছে, কাজেই কি করিয়া সে আবার গৃহে ফিরিবে? শ্রেষ্ঠী নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া লজ্জিত হইলেন ও পুত্রকে বুদ্ধের কাছে থাকিতে অনুমতি দিলেন। গৃহে ফিরিবার সময়ে শ্রেষ্ঠী বুদ্ধকে নিজগৃহে আহারের নিমন্ত্রণ করিলেন। বুদ্ধ মৌন রহিলেন—কেহ আহারের নিমন্ত্রণ করিলে বুদ্ধ মৌনসম্মতি জানাইতেন।

পরদিন পূর্বাহ্ণে বুদ্ধ চীবর ধারণ করিয়া ভিক্ষাপাত্র হাতে যশের সঙ্গে তাহার গৃহে গেলেন। সেখানে যশের মাতা ও পত্নী তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া আহার করাইলেন। আহারান্তে অন্তঃপুরিকাগণ তাঁহার উপদেশ শুনিবার জন্ম সমবেত হইলে বুদ্ধ স্ত্রীলোকদের কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন। যশের মাতা ও পত্নী তাঁহার গৃহীশিষ্যা হইলেন। ক্রমে যশের বন্ধু বারাণসীর "চারজন" শ্রেষ্ঠীপুত্র যশের পরামর্শে বুদ্ধের শিষ্য হইল ও তাহাদের অনুসরণে আরও "পঞ্চাশজন" লোক ভিক্ষু হইল। এখন পূর্বের সেই পঞ্চভিক্ষু, যশ, যশের চার বন্ধু ও শেষের পঞ্চাশ জন, বুদ্ধের মোট এই "ষাট জন" ভিক্ষুশিষ্য হইল।

একদিন তাহাদের সকলকে একত্র করিয়া বুদ্ধ বলিলেন—"ভিক্ষুগণ, আমি দৈব ও মানুষিক সকল প্রকার পাশ হইতে মুক্ত; তোমরাও দৈবমানুষিক সকলপ্রকার পাশ হইতে মুক্ত হইয়াছে। অতএব হে ভিক্ষুগণ, তোমরা বহুজনের হিতের জন্ম, বহুজনের সুখের জন্ম, সংসারের প্রতি অনুকম্পার জন্ম, দেবমানবের মঙ্গলের জন্ম, হিতের জন্ম, সুখের জন্ম চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াও। তোমাদের মধ্যে এক এক জন এক এক দিকে যাও। হে ভিক্ষুগণ, এই যে ধর্ম, যাহা আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, অন্তে কল্যাণ, যাহা কৈবল্যময় পরিশুদ্ধ ও ব্রহ্মচর্য, সেই ধর্ম ব্যাখ্যা করিয়া প্রকাশ করিয়া প্রচার কর। এমন অনেক লোক আছে যাহাদের চক্ষুতে অল্পই ধূলি আছে, কিন্তু তাহাদের কাছে ধর্ম প্রচারিত না হইলে তাহাদের মুক্তি হইবে না। ইহারা এই ধর্ম বুঝিতে পারিবে।"

তাঁহার কথামত ভিক্ষুরা চারিদিকে প্রচারে বাহির হইল। কিছুদিন পরে তাহারা শিষ্য সংগ্রহ করিয়া দীক্ষার জন্ম বুদ্ধের নিকট লইয়া আসিতে লাগিল। ইহাতে ভিক্ষু ও দীক্ষার্থী উভয়েই পথশ্রমে ক্লান্ত হইত, বিশেষতঃ

ভিক্ষুদের বারবার নূতন নূতন শিষ্য লইয়া বুদ্ধের কাছে যাতায়াতের কষ্ট পাইতে হইত। ইহা দেখিয়া বুদ্ধ এ বিষয়ে চিন্তা করিলেন ও একদিন সন্ধ্যাকালে সকলকে ডাকাইয়া বলিলেন যে ভিক্ষুরা দূরবর্তী স্থানে নিজেরাই দীক্ষাদান করিতে পারিবে। বুদ্ধ নিজে কাহাকেও দীক্ষা দিতে হইলে বলিতেন "এস ভিক্ষু, সুপ্রচারিত এই ধর্ম; সকল দুঃখের অন্ত করিবার জন্য শুদ্ধমার্গে বিচরণ কর।" কালক্রমে সংঘ গঠন ও বৃদ্ধির সঙ্গে এ বিষয়ে নিয়ম প্রণয়ন হইয়াছিল যে, মুণ্ডিতকেশ দীক্ষার্থীকে চীবর ধারণ করিয়া ভিক্ষাপাত্র হাতে লইয়া দীক্ষাদাতাকে প্রণাম করিয়া দীক্ষা প্রার্থনা করিয়া যোড়হাতে আসনে বসিতে হইবে। দীক্ষার্থীকে প্রথম প্রথম বোধহয় "আমি ধর্মের শরণ লইতেছি" এই কথা বলিতে হইত এবং ইহা কালক্রমে বর্ধিত হইয়া "বুদ্ধের শরণ লইতেছি, ধর্মের শরণ লইতেছি, সংঘের শরণ লইতেছি", এই "ত্রিশরণ"-মন্ত্রে পরিণত হইয়াছিল।

ঋষিপত্তনে বুদ্ধ প্রথম বর্ষা যাপন করিয়াছিলেন। সে যুগে সকল সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীরা সারাবৎসর নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইয়া বর্ষার কয়মাস একস্থানে বাস করিতেন। বর্ষাকালে যাতায়াতের অসুবিধা হইত, শরীর ও বস্ত্রাদি ভিজিয়া যাইত এবং সাধনার নিয়ম পালনে ব্যাঘাত ঘটিত। জৈনরা আরও এই কারণে বর্ষাকালে ভ্রমণ করিতেন না যে, এই ঋতুতে কীটপতঙ্গাদির অজস্র বংশবৃদ্ধি হয় ও তৃণলতাদি উদ্ভিদও যেখানে সেখানে জন্মে এবং লোকের চলাচলে পদদলিত হইয়া এই জীবাদির হত্যা হয়। বুদ্ধশিষ্যেরা প্রথমে বর্ষাবাস পালন করিত না, কিন্তু ইহাতে লোকে তাহাদের নিন্দা করায় বুদ্ধ বর্ষাপালন প্রবর্তন করিয়াছিলেন। বৌদ্ধেরা বর্ষাবাস হইতে অর্থাৎ কোন্ বর্ষা বুদ্ধ কোথায় যাপন করিয়াছিলেন সেই অনুসারে তাঁহার জীবনের ঘটনাবলীর সময় নির্ধারণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বর্ষার পর ভিক্ষুরা প্রায় সকলেই কোনও কারণে অসম্ভব বা অসমর্থ না হইলে, বুদ্ধ যেখানে থাকিতেন সেখানে তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিত। এই প্রথম বর্ষাবাসের পর তিনি ভিক্ষুদের বলিলেন "হে ভিক্ষুগণ, উপযুক্ত চেষ্টাদ্বারা ও উপযুক্ত চিন্তাদ্বারা আমি মুক্তিলাভ করিয়াছি; তোমরাও উপযুক্ত চিন্তা ও চেষ্টার দ্বারা মুক্তিলাভে প্রযত্ন কর।"

বর্ষার পর সকলে প্রচারে বাহির হইলেন। বুদ্ধ উরুবিল্বের দিকে যাত্রা

করিলেন। পথে রাস্তা ছাড়িয়া একটি বনের মধ্যে তিনি গাছের নীচে বসিয়া ছিলেন। কয়েকজন যুবা সেই বনে আমোদপ্রমোদ করিতে আসিয়াছিল, একজন ব্যতীত তাহাদের সকলের সঙ্গে নিজ নিজ স্ত্রী ছিল; যাহার স্ত্রী ছিল না তাহার জন্য অন্যেরা এক গণিকাকে লইয়া আসিয়াছিল। যুবকেরা যখন আমোদে মত্ত, সেই অবসরে গণিকা তাহাদের জিনিষপত্র যাহা পাইল সব লইয়া পলায়ন করিল। যুবকেরা সারা বন গণিকাকে খুঁজিতে খুঁজিতে বৃক্ষতলে উপবিষ্ট বুদ্ধকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল তিনি কোনও স্ত্রীলোককে দেখিয়াছেন কিনা। বুদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন স্ত্রীলোকে তাহাদের কি প্রয়োজন। তাহারা চুরির ব্যাপার জানাইলে বুদ্ধ বলিলেন "দেখ যুবকগণ, কোন্‌টা তোমাদের পক্ষে বেশি ভাল হইবে, স্ত্রীলোকের অন্বেষণ করা, না নিজেদের অন্বেষণ করা?" যুবকেরা তাঁহার কথার অর্থ বুঝিয়া বলিল আত্ম-অন্বেষণই বেশি ভাল। বুদ্ধ বলিলেন "বেশ, তাহাই যদি হয় তবে তোমরা এখানে বস, আমি তোমাদের ধর্মশিক্ষা দিতেছি।" এই যুবকেরা বুদ্ধের শিক্ষা গ্রহণ করিল।

কয়েকস্থানে ঘুরিয়া বুদ্ধ আবার উরুবিল্বে আসিলেন। উরুবিল্ব গ্রাম, নৈরঞ্জনা নদীর তীর ও গয়া, এই তিন স্থানে জটিল বা জটাধারী বানপ্রস্থাবলম্বী "তিনজন" কাশ্যপগোত্রীয় প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণভ্রাতা বাস করিতেন। তাঁহাদের অনেক শিষ্য ছিল, তাঁহাদের তপঃপ্রভাবও লোকে জানিত, এজন্য তাঁহারা বড় গর্বিত ছিলেন। বর্ণিত আছে জলে না ডোবা, আগুনে না পোড়া, একটি বিষধর সাপকে দমন করা প্রভৃতি নানাবিধ অলৌকিক কাণ্ড দেখাইয়া বুদ্ধ ইঁহাদের গর্ব খর্ব করেন। যাহা হউক বোধহয় অনেকদিন ধরিয়া ইঁহাদের সঙ্গে বুদ্ধের আলোচনা-তর্ক হইয়াছিল। অবশেষে এই জটাধারীরা সদলে বুদ্ধের শিষ্য হইলেন। ইঁহাদের মত খ্যাতিমান লোক বুদ্ধের দলে যোগ দেওয়ায় অনেকে বুদ্ধের কথা জানিল। উরুবিল্বে তিন মাস বাস করিয়া বুদ্ধ গয়াশীর্ষ পাহাড়ে গেলেন। সেখানে তিনি শিষ্যদের একটি অতি গম্ভীর উপদেশ দিয়াছিলেন—

"হে ভিক্ষুগণ, সবই আদীপ্ত (অর্থাৎ জ্বলিতেছে)। হে ভিক্ষুগণ, সব যাহা আদীপ্ত তাহা কি? হে ভিক্ষুগণ, চক্ষু আদীপ্ত, রূপ আদীপ্ত, চক্ষুঃসংস্পর্শ জনিত যে সুখ বা দুঃখ, অদুঃখ বা অসুখের বোধ উৎপন্ন হয় তাহাও আদীপ্ত। কিসে

আদীপ্ত? আমি বলি সবই রাগাগ্নিতে দ্বেষাগ্নিতে মোহাগ্নিতে আদীপ্ত, জন্মে জরায় মৃত্যুতে শোকে পরিদেবনে দুঃখে দৌর্মনস্যে উপায়াসে আদীপ্ত। শ্রোত্র আদীপ্ত, শব্দ আদীপ্ত, ঘ্রাণ আদীপ্ত, গন্ধ আদীপ্ত, জিহ্বা আদীপ্ত, রসাদি আদীপ্ত, কায় আদীপ্ত, স্পর্শাদি আদীপ্ত, মন আদীপ্ত, মনোধর্মাদি আদীপ্ত, মনোবিজ্ঞান আদীপ্ত, মনঃসংস্পর্শ আদীপ্ত, মনঃসংস্পর্শজনিত যে সুখ বা দুঃখ, অদুঃখ বা অসুখের বোধ উৎপন্ন হয় তাহাও আদীপ্ত। কিসে আদীপ্ত? আমি বলি রাগাগ্নিতে দ্বেষাগ্নিতে মোহাগ্নিতে আদীপ্ত, জন্মে জরায় মৃত্যুতে শোকে ··· আদীপ্ত।

"হে ভিক্ষুগণ, ইহা দেখিয়া জ্ঞানবান আর্যশিষ্যের চক্ষুতে নির্বেদ জাত হয় রূপে নির্বেদ জাত হয়, চক্ষুর্বিজ্ঞানে নির্বেদ জাত হয়, চক্ষুঃসংস্পর্শে নির্বেদ জাত হয়, চক্ষুঃসংস্পর্শজনিত যে সুখ বা দুঃখ, অদুঃখ বা অসুখের বোধ উৎপন্ন হয় তাহাতেও নির্বেদ জাত হয়। শ্রোত্রে নির্বেদ হয়, শব্দাদিতে নির্বেদ হয়, ঘ্রাণে নির্বেদ হয়, গন্ধাদিতে নির্বেদ হয়, জিহ্বাতে নির্বেদ হয়, রসাদিতে নির্বেদ হয়, কায়ে নির্বেদ হয়, স্পর্শাদিতে নির্বেদ হয়- মনে নির্বেদ হয়, মনোধর্মাদিতে নির্বেদ হয়, মনোবিজ্ঞানে নির্বেদ হয়, মনঃসংস্পর্শে নির্বেদ হয়, মনঃসংস্পর্শজনিত যে সুখ বা দুঃখ, অদুঃখ বা অসুখের বোধ উৎপন্ন হয় তাহাতেও নির্বেদ জাত হয়। নির্বেদ হইতে বৈরাগ্যের উদয় হয়, বৈরাগ্য হইতে বিমুক্তি হয়, বিমুক্তি হইতে 'আমি বিমুক্ত হইয়াছি' এই জ্ঞান জাত হয়, আর সংসারে জন্মিতে হয় না, ধর্মকার্য শেষ হয়, কর্তব্য সমাপ্ত হয়, আর ইহসংসারে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।"

বোধহয় সন্ধ্যাকালে বা রাত্রে নিকটবর্তী কোনও পাহাড়ে দাবানল দেখিয়া সংসারাগ্নিতে দহ্যমান জীবলোকের বিষয় তাঁহার মনে উদয় হইয়াছিল। আধুনিক পণ্ডিতগণ এই ব্যাখ্যানটিকে "অগ্নি-উপদেশ" নাম দিয়াছেন।

রাজগৃহে আগমন

গয়াশীর্ষ পাহাড়ে কিছুদিন থাকিবার পর আরও কয়েক স্থানে ঘুরিয়া বুদ্ধ রাজগৃহ নগরের উপকণ্ঠে যষ্টিবন নামক স্থানে আসিলেন। বোধিলাভের পর রাজগৃহে আগমন করিবেন, রাজা বিম্বিসারের কাছে সেই পূর্বপ্রতিশ্রুতি অনুসারে বুদ্ধ রাজাকে তাঁহার আগমন সংবাদ জানাইলে বিম্বিসার ভিক্ষুগণ-পরিবেষ্টিত বুদ্ধের সমীপে উপস্থিত হইলেন। বুদ্ধের সঙ্গে উরুবিল্বের

খ্যাতনামা জটিল তপস্বীদের দেখিয়া সাধারণ লোকের মনে হইয়াছিল বুদ্ধই বোধহয় জটিলদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। বুদ্ধ লোকের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া প্রকাশ্যে জটিলদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন জটিলরা বানপ্রস্থীর অগ্নিহোত্র ত্যাগ করিলেন কেন? জটিলরা বলিলেন, অগ্নিহোত্রের বলে স্বর্গে গিয়াও সংসারের সুখ ভোগ করা যাইবে, ইহা তাঁহারা পূর্বে মনে করিতেন কিন্তু এখন সংসারের অসারতা বুঝিয়া এবং নির্বাণের আস্বাদ পাইয়া তাঁহারা অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়া ত্যাগ করিয়াছেন। সকলের সম্মুখে জটিলরা যখন এইভাবে বুদ্ধের শিক্ষা স্বীকার করিলেন তখন লোকে বুঝিল কে কাহার শিষ্য।

বিম্বিসার বিদায় লইবার সময়ে বুদ্ধকে বলিলেন "ভদন্ত, ভিক্ষুসংঘের সহিত ভগবান কাল আমার ভবনে কৃপা করিয়া আহারে সম্মতি দান করুন।" বুদ্ধ মৌন রহিলেন। বুদ্ধ সম্মতি জানাইয়াছেন বুঝিয়া বিম্বিসার নগরে ফিরিয়া গেলেন। পরদিন বুদ্ধ সশিষ্যে রাজগৃহ নগরের মধ্য দিয়া রাজ-প্রাসাদে গেলেন। বিম্বিসার স্বহস্তে পরিবেশন করিয়া সকলকে নানাবিধ ভোজ্য আহার করাইলেন। পালি বর্ণনায় সর্বত্রই দেখা যায় সেকালে নিমন্ত্রণকর্তা যত বড় ব্যক্তিই হউন না কেন, স্বহস্তে নিমন্ত্রিতদের আহার্য পরিবেশন করিতেন। আহারান্তে বিম্বিসার বুদ্ধের নিকটে বসিয়া বলিলেন—এ ঘটনা সম্ভবতঃ সেই দিনই হয় নাই, পরে অন্য কোনও সময়ে হইয়াছিল—তিনি বুদ্ধের বাসের জন্য এমন একটি স্থান স্থির করিয়া দিতে চাহেন যাহা নগরের বেশি নিকটেও না হয় দূরেও না হয়, যেখানে যাতায়াত সহজে করা যায়, বুদ্ধের দর্শনার্থীদের সকলের সুবিধা হয়, যেখানে দিনে বেশি ভীড় না হয় এবং রাত্রে গোলমাল বা ভয়ও না থাকে। লোকের ভীড় হইতে দূরে, সাধুর বাসের উপযুক্ত মনে করিয়া বিম্বিসার তাঁহার 'বেণুবন' নামক প্রমোদ-উদ্যান বুদ্ধকে দিতে চাহিলেন। বুদ্ধ আপত্তি না করায় বিম্বিসার স্বর্ণময় ভৃঙ্গার হইতে বুদ্ধের হাতে জল ঢালিয়া বলিলেন "ভদন্ত, এই বেণুবন-উদ্যান আমি বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে দান করিলাম।" সেকালে ধনীদের এই প্রমোদ-উদ্যানগুলিতে ঘরবাড়ীও থাকিত। এখন হইতে বুদ্ধ রাজগৃহে আসিলে প্রায়ই 'বেণুবন-আরামে' সশিষ্যে বাস করিতেন। বোধি-লাভের পর রাজগৃহই প্রথম প্রসিদ্ধ নগর যেখানে বুদ্ধ আসিলেন এবং এখানেই জনসাধারণের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় আরম্ভ হইল।

সাধারণ্যে বুদ্ধ 'শ্রমণ গৌতম' এবং তাঁহার শিষ্যেরা 'শাক্যপুত্রীয় শ্রমণ' নামে অভিহিত হইতেন। সে যুগে লোকে সাধুসন্ন্যাসীদিগকে 'হে ভদন্ত' বলিয়া সম্বোধন করিত এবং ভক্তেরা তাঁহাদের উল্লেখ করিতে হইলে 'ভগবান' বলিত। 'ভদন্ত' শব্দটি 'ভবৎ' শব্দ হইতে নহে, 'ভদ্র' শব্দ হইতে নিষ্পন্ন। ব্রাহ্মণেরা কিন্তু বুদ্ধকে শুধু 'গৌতম' বলিয়া সম্বোধন করিতেন সম্মানের তারতম্যে ইহা 'হে গৌতম' বা বড়জোর 'ভদন্ত গৌতম' পর্যন্ত উঠিত, তাহার বেশী নহে। বুদ্ধ নিজেকে সাধারণতঃ 'শ্রমণ গৌতম' এবং কখনও কখনও 'তথাগত' বলিয়া উল্লেখ করিতেন মনে হয়।

সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন

রাজগৃহ নগরের নিকটবর্তী নালন্দা-গ্রামে কোলিত ও উপতিষ্য নামে দুইজন সম্পন্ন অবস্থার ব্রাহ্মণ যুবক ছিলেন। ইঁহারা দুইজনেই সুপণ্ডিত প্রতিভাবান ও মেধাবী ছিলেন ও উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। একবার রাজগৃহের একটি পাহাড়ের উপর হইতে কোনও পর্বোপলক্ষে সম্মিলিত নীচের জনসমুদ্র দেখিয়া তাঁহাদের মনে হইল এত যে লোক, ইহাদের সকলকেই একদিন মরিতে হইবে। তাঁহারা মৃত্যু ও জীবনের অন্যান্য গভীর বিষয় সম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং পরস্পরের সহিত নিজ নিজ চিন্তার ফল আলোচনা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মনে হইল যে সকল বস্তুরই যখন বিনাশ আছে, তখন অবিনাশীও হয়তো কিছু থাকা সম্ভব। তদবধি তাঁহারা এই 'অ-মৃতের' সন্ধানে রহিলেন। সেই সময়ে সঞ্জয় নামে একজন প্রসিদ্ধ পরিব্রাজক আচার্য ছিলেন; বন্ধুদ্বয় সঞ্জয়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। সঞ্জয়ের শিষ্যদলের মধ্যে অনেকেই এই ব্রাহ্মণ যুবাদ্বয়ের বিদ্যাবুদ্ধিতে মুগ্ধ ছিল ও সঞ্জয় নিজেও তাঁহাদের সমাদর করিতেন। বর্ণিত আছে অশ্বজিৎ নামে বুদ্ধের সেই 'পঞ্চভিক্ষুর' মধ্যে একজন একদিন ভিক্ষায় বাহির হইয়াছিল এবং তাহার নম্র সংযত গাম্ভীর্যময় ভাব দেখিয়া পথে উপতিষ্য তাহার সহিত আলাপ করিলেন এবং তাহার গুরু কে, তিনি কি শিক্ষা দেন প্রভৃতি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন। উপতিষ্যের সহিত কোলিতের সাক্ষাৎ হইলে উপতিষ্যের মুখে আনন্দের আভা দেখিয়া কোলিত জিজ্ঞাসা করিলেন "আয়ুষ্মন্, তবে কি তুমি অমৃত লাভ করিয়াছ ?"

"হাঁ আয়ুষ্মন্‌, আমি অমৃত লাভ করিয়াছি।"

"আয়ুষ্মন্‌, কি করিয়া তুমি অমৃত লাভ করিলে ?"

উপতিষ্য বন্ধুকে অশ্বজিতের সহিত তাঁহার সাক্ষাতের কথা বলিলেন এবং উপতিষ্যের মুখে বুদ্ধের বাণী শুনিয়া কোলিতেরও তাহাতে বিশ্বাস হইল।

এই বন্ধুদ্বয়ের মত বিদ্বান ও বুদ্ধিমান লোক যে অপরের মুখে শুনিয়া একজন অপরিচিত গুরুর বাণীতে বিশ্বাস করিয়া ফেলিলেন ইহা সম্ভবপব মনে হয় না। সেই কালে তত্ত্বজিজ্ঞাসুরা এক গুরুর শিষ্য হইলেও অপর বহু আচার্যের উপদেশ শুনিতে যাইতেন এবং তাঁহাদের সহিত আলাপ আলোচনা তর্কবিতর্কও করিতেন, এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত বৌদ্ধ ও জৈন শাস্ত্রে আছে। বুদ্ধের উপদেশ শুনিতে আসিয়া বোধহয় উপতিষ্য ও কোলিত বুদ্ধের সহিত আলাপ আলোচনা করিয়া তাঁহার শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কেহ এরূপও মনে করেন যে, বুদ্ধ ইঁহাদের খ্যাতি শুনিয়া অশ্বজিৎকে পাঠাইয়া ইঁহাদেব স্বদলে আনিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। যাহা হউক, বন্ধুদ্বয়ের বুদ্ধশিষ্যত্ব গ্রহণের কথা শুনিয়া আচার্য সঞ্জয় বড়ই ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত হইয়াছিলেন। তিনি অনেক অনুযোগ করিলেন, দলপতি করিয়া দিবার লোভ দেখাইলেন, কিন্তু বন্ধুদ্বয় নিজেদের সিদ্ধান্ত ত্যাগ না করিয়া বুদ্ধের সহিত যোগ দিলেন। বন্ধুদ্বয়ের সহিত সঞ্জয়ের আরও অনেক শিষ্য বুদ্ধের দলে যোগ দিল। নবীন প্রচারক বুদ্ধের ইহাতে উৎসাহ হইবারই কথা। গুণী লোক গুণের মর্যাদা বুঝেন, বুদ্ধ এই শিষ্যদ্বয়ের গুণবত্তা ও শক্তিব পরিচয় পাইয়াছিলেন এবং প্রথম হইতেই স্বশিষ্যদলেব মধ্যে ইঁহাদের প্রধান স্থান দিয়াছিলেন। অন্য ভিক্ষুবা ইহাতে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিল কিন্তু বুদ্ধ বুঝাইয়া তাহাদেব শান্ত কবিয়াছিলেন। উপতিষ্যের মাতার নাম ছিল রূপসারি, এইজন্য লোকে উপতিষ্যকে 'সারিপুত্র' বলিত। কোলিত গোত্রনামে 'মৌদ্‌গল্যায়ন' বলিয়া পরিচিত ছিলেন। বৌদ্ধসাহিত্যে তাঁহারা এই দুই নামেই অভিহিত হইয়াছেন এবং আমরাও তাঁহাদের অতঃপর এই নামে উল্লেখ করিব। ইঁহাবা বুদ্ধের ধর্মপ্রচারে সবিশেষ সহায়তা করেন এবং সর্ববিষয়ে বুদ্ধের দক্ষিণ-হস্তস্বরূপ ছিলেন। ইঁহাদের কথা আমাদের বহুবার বহু উপলক্ষে বলিতে হইবে এবং ক্রমে আমরা ইঁহাদের পদমর্যাদা-গুরুত্ব বুঝিতে পারিব। এই দুইজন না হইলে বুদ্ধের প্রচারকার্য বোধহয় অতি অল্পই প্রসার লাভ করিত।

রাজগৃহের অনেক শিক্ষিত যুবা বুদ্ধের শিষ্য হইয়াছিল। বুদ্ধের শিক্ষার প্রসার ও বহুলোক সংসার ছাড়িয়া ভিক্ষু হইতেছে দেখিয়া রাজগৃহের জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষ প্রকাশিত হইল। তাহারা বলিতে লাগিল "শ্রমণ গৌতমের জন্য লোকে পুত্রোৎপাদন করিতেছে না, শ্রমণ গৌতমের জন্য বহু স্ত্রীলোকের বৈধব্যদশা হইয়াছে এবং তাঁহার জন্য অনেক পরিবার নির্বংশ হইয়া যাইতেছে। জটিলেরা, সঞ্চয়েব পরিব্রাজকেরা ও মগধের কুলপুত্রেরা সকলেই তাঁহার শিষ্য হইতেছে।" বুদ্ধের শিষ্যেরা পথে ভিক্ষায় বাহির হইলে লোকে একটা ছড়া বলিয়া তাহাদের ক্ষেপাইত—"মাগধদের গিরিব্রজে (অর্থাৎ রাজগৃহে) মহাশ্রমণ (অর্থাৎ বুদ্ধ) আসিয়াছেন; তিনি সঞ্জয়ের সব শিষ্যদের ভাঙ্গাইয়া লইয়াছেন, এবার তাঁহার কাহাকে ভাঙ্গাইয়া লইবার পালা?" ভিক্ষুরা একথা বুদ্ধকে জানাইলে তিনি তাহাদের বিরক্ত হইতে নিষেধ করিয়া বলিলেন অচিবে এই নিন্দাবাদ কাটিয়া যাইবে। তিনি নিজে আর একটি ছড়া বাঁধিয়া লোকে ক্ষেপাইলে ভিক্ষুদের উহা আবৃত্তি করিতে বলিলেন—"মহাবীর তথাগতেরা সদ্ধর্ম দ্বারা লোককে চালান; যে বিজ্ঞ ব্যক্তি ধর্মের দ্বারা লোককে চালান, তাঁহাকে কে নিন্দা করিতে পারে?" ভিক্ষুরা পথের লোকের ছড়ার উত্তরে এই ছড়া বলিতে লাগিলে বুদ্ধ ধর্মপ্রচাবই চাহেন, আব কিছু নহে, বুঝিয়া লোকে নিরস্ত হইল। রাজগৃহের লোকেব উত্তেজনা হইতে মনে হয় বুদ্ধের শিক্ষা লোকসমাজে কিছু চাঞ্চল্যেব সৃষ্টি করিয়াছিল।

বিম্বিসারের সনির্বন্ধ অনুবোধে বুদ্ধ উপর্যুপরি তিন বর্ষা রাজগৃহে বেণুবন-আরামে যাপন করিয়াছিলেন। বোধিলাভ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রথম বিশ বৎসর বুদ্ধের জীবনের ঘটনাবলীর কিছু কিছু সময়নির্ণয় করা যায় তাহার পরের প্রায় পঁচিশ বৎসরের কোন্ ঘটনা কখন ঘটিয়াছিল তাহা ঠিক জানা যায় না। ইহার কারণ এই যে, ঘটনাবলীর সময়নির্ণয়ের সূত্র হইতেছে তিনি কোন্ বর্ষা কোথায় যাপন করিয়াছিলেন তাহার বিবরণ। জীবনের শেষ পঁচিশ বৎসর তিনি কোন্ বর্ষা কোথায় যাপন করিয়াছিলেন তাহার কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না, অনুমান হয় তিনি ইহার সব না হইলেও অধিকাংশ শ্রাবস্তীতে কাটাইয়াছিলেন। প্রথম বিশ বর্ষা সম্বন্ধেও কিন্তু পালি তিব্বতী ও সিংহলী গ্রন্থে মতভেদ আছে।

কপিলবাস্তুতে গমন

পুত্র অভীষ্টসিদ্ধি লাভ করিয়াছে শুনিয়া পিতা শুদ্ধোদন তাহাকে গৃহে ফিরাইয়া আনিবার জন্য রাজগৃহে লোক পাঠাইলেন। এই লোকেরা রাজগৃহে আসিয়া ভিক্ষুদের ভাবগতি দেখিয়া বুদ্ধকে আর গৃহে ফিরিবার কথা বলিতে ভরসা করিল না। অবশেষে শুদ্ধোদন কালুদায়ী নামক সিদ্ধার্থের এক বাল্যবন্ধুকে লোকজন সঙ্গে দিয়া বুদ্ধকে গৃহে ফিরাইবার জন্য রাজগৃহে পাঠাইলেন।

কালুদায়ী বুদ্ধিমান লোক ছিল এবং বাল্যবন্ধুর প্রকৃতি ভালই জানিত বলিয়া বুঝিল যে সোজাসুজি বলিলে কোনও ফল হইবে না, তাই সে বেণুবন-আরামে গিয়া বুদ্ধের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কিছুদিন তাঁহার উপদেশাদি মন দিয়া শুনিবার ভান করিল। তখন শীত শেষ হইয়া বসন্ত আরম্ভ হইতেছে। সিদ্ধার্থের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যপ্রিয়তার কথা কালুদায়ীর জানা ছিল; সে বসন্তকালে রাজগৃহ হইতে কপিলবাস্তু যাইবার পথে অরণ্যানীর কিরূপ পুষ্পপল্লবশোভা হয়, তাহা মধ্যে মধ্যে বুদ্ধের কাছে সবিস্তারে বর্ণনা করিতে লাগিল। বুদ্ধও কম চতুর ছিলেন না, তিনি বাল্যবন্ধুর উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন তাহার হঠাৎ এরূপ কবিত্বাবেগ হইবার কারণ কি। কালুদায়ী তখন শুদ্ধোদনের তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছার কথা জানাইলে বুদ্ধ ভিক্ষুদের কপিলবাস্তু যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে বলিলেন।

কালুদায়ী পূর্বেই যাত্রা করিয়া কপিলবাস্তুতে ফিরিয়া শুদ্ধোদনকে সংবাদ দিলে শাক্যেরা নগরের বাহিরে ন্যগ্রোধ-আরাম' নামক একটি উদ্যানে সশিষ্য বুদ্ধের বাসের ব্যবস্থা করিয়া বুদ্ধেব সমুচিত অভ্যর্থনার আয়োজন করিল। প্রথমে বালকবালিকাদের দল, তাহাব পিছনে অভিজাত-তনয়রা ও শেষে রাজবংশীয়েরা সুবেশ পরিয়া মাল্য ও গন্ধদ্রব্য হাতে অগ্রগমন করিয়া সদলে বুদ্ধকে ন্যগ্রোধ-আরামে অভ্যর্থনা করিল। বুদ্ধ বয়সে ছোট বলিয়া শাক্যবংশীয় বয়োজ্যেষ্ঠেরা বুদ্ধকে প্রণামাদি করিলেন না। যাহাকে জন্মিতে দেখিয়াছি, বালক্রীড়া করিতে দেখিয়াছি, তাহাকে হঠাৎ 'বুদ্ধ' বলিয়া কে সহজে মানিতে চায়? বুদ্ধ সমাগত জনমণ্ডলীকে উপদেশ দিলেন। নগরবাসীরা নগরে ফিরিয়া গেল। যাইবার সময়ে কেহ তাঁহাকে আহারের নিমন্ত্রণ করিল না, শুদ্ধোদনও কিছু বলিলেন না। পুত্র তাঁহার গৃহেই আহার করিবে ইহা

আর নূতন কথা কি, এই ভাবিয়া বোধহয় তাঁহার এ সম্বন্ধে কোনও কথা মনে হয় নাই।

পরদিন অভ্যাসমত যথাসময়ে বুদ্ধ ভিক্ষায় বাহির হইয়া কপিলবাস্তুর গৃহে গৃহে ভিক্ষা করিতে করিতে পিতৃভবনের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ইহাতে নগরে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। শুদ্ধোদনভবনের বাতায়নে পুরনারীগণ ভীড় করিয়া এদৃশ্য দেখিতে লাগিল। রাহুলমাতা শুদ্ধোদনকে সংবাদ দিলে শুদ্ধোদন ব্যস্তসমস্ত হইয়া স্রস্তবসন সম্বরণ করিতে করিতে ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া অভিজাতবংশের পক্ষে এরূপ অপমানকর কার্যের জন্য পুত্রকে ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন। বুদ্ধ শান্তভাবে বলিলেন সকল ভিক্ষুরই ভিক্ষায় বাহির হওয়া উচিত। শুদ্ধোদন পুত্রকে বংশমর্যাদা স্মরণ করাইলে বুদ্ধ উত্তর দিলেন শুদ্ধোদন ও তাঁহার বংশ উচ্চকুলসম্ভূত সন্দেহ নাই, কিন্তু রাজবংশ ও বুদ্ধবংশ বিভিন্ন, দুইএর মধ্যে কোনও সাদৃশ্য নাই, দুইএর ব্যবহারও বিভিন্ন। পথে দাঁড়াইয়া শুদ্ধোদনের সহিত বুদ্ধের এই কথোপকথন হইতেছিল, তারপর ভিক্ষার প্রশংসা করিতে করিতে ও পিতাকে উপদেশ দিতে দিতে বুদ্ধ শুদ্ধোদনের সঙ্গে গৃহে প্রবেশ করিলেন।

অন্তঃপুর হইতে পালিকামাতা মহাপ্রজাবতী গৌতমীও বহির্ভবনে আসিয়া বুদ্ধের কথা শুনিতে লাগিলেন। শুদ্ধোদন ও মহাপ্রজাবতী সশিষ্য বুদ্ধকে অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া আহার করাইলেন। আহারান্তে পরিজনবর্গ ও অন্তঃপুরিকারা বুদ্ধকে ঘিরিয়া বসিলেন। রাহুলমাতা কিন্তু নিজকক্ষেই রহিলেন, সেস্থানে আসিলেন না। পুরনারীরা তাঁহাকে আসিয়া প্রণামাদি করিতে ও বুদ্ধের উপদেশ শুনিতে বলিলে রাহুলমাতা বলিলেন "আমার যদি কোনও মূল্য থাকে, তবে আমার স্বামী নিজেই আমার নিকট আসিবেন, তিনি আসিলে আমি তাঁহাকে প্রণাম করিব।" এই কথা বুদ্ধকে জানান হইলে বুদ্ধ বলিলেন "ইহাতে রাহুলমাতার কোনও দোষ হয় নাই, তিনি নিজের ইচ্ছামত প্রণামাদি করিতে পারেন।" এই কথা বলিয়া সারিপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়নকে সঙ্গে লইয়া বুদ্ধ রাহুলমাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন। রাহুলমাতার উক্তিকে বৌদ্ধরা গর্বিত মনে করিয়া অত্যন্ত ভুল এবং তাঁহার প্রতি অন্যায় করিয়াছেন। রাহুলমাতার উক্তির প্রকৃত অর্থ কি ছিল তাহা আমরা পরে বুঝিতে পারিব।

যে কক্ষে রাহুলমাতা ছিলেন সেখানে আসিয়া বুদ্ধ তাঁহার জন্য প্রস্তুত আসনে বসিলে রাহুলমাতা দ্রুতপদে আসিয়া বুদ্ধের পদযুগল জড়াইয়া ধরিলেন এবং নিজের মস্তকে বুদ্ধের চরণ ধারণ করিয়া ভূলুণ্ঠিতা হইয়া বুদ্ধকে বন্দনা করিলেন। ক্ষণকাল পরে আত্মসম্বৃতা হইয়া সারিপুত্র মৌদ্‌গল্যায়ন ও শুদ্ধোদনকে দেখিয়া লজ্জিত হইয়া রাহুলমাতা দূরে সরিয়া অধোমুখে নীরবে দাঁড়াইয়া অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন। শুদ্ধোদন বুদ্ধকে বলিলেন যেদিন সিদ্ধার্থ গৃহত্যাগ করেন সেই দিন হইতে রাহুলমাতা সকল প্রকার আমোদ ও বিলাস ত্যাগ করিয়াছেন, যেদিন শুনিলেন স্বামী দিবসে একবার মাত্র ভোজন করিতেছেন, যেদিন শুনিলেন স্বামী কেশচ্ছেদন করিয়াছেন বা ভূমিশয্যা গ্রহণ করিয়াছেন, সেদিন হইতে তিনিও অনুরূপ কার্য করিয়া স্বামীর অনুগামিনী হইয়াছেন। শুদ্ধোদনের মুখে পূর্বপত্নীর এই আচরণের কথা শুনিয়া বুদ্ধ বলিলেন "ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই, রাহুলমাতা তাঁহারই উপযুক্ত আচরণ করিয়াছেন।"

মহাপ্রজাবতী ও রাহুলমাতা উভয়েই পরে ভিক্ষুণী হইয়াছিলেন এবং অনেক সময়ে বুদ্ধের অতিসান্নিধ্যে বাস করিয়াছিলেন। অন্য শিষ্যশিষ্যাদের সম্বন্ধে অনেক গল্প, অনেক কাহিনী বৌদ্ধশাস্ত্রে স্থান পাইয়াছে কিন্তু ভিক্ষুণী মহাপ্রজাবতীর কথা অল্পই আছে আর ভিক্ষুণী রাহুলমাতার কথা নাই বলিলেই হয়। ভিক্ষুণীচিত্তের অন্তরালে মাতা বা পত্নীহৃদয়ের কোনও স্ফুরণ অবশ্য সন্ন্যাসধর্মের বিরোধী, তাহার উপর আবার বুদ্ধের সহিত পূর্বের সাংসারিক সম্বন্ধ থাকায় মহাপ্রজাবতী বা রাহুলমাতার কথা সন্ন্যাসীরা—বোধহয় পাছে কোনও ফাঁকে মারের চক্রান্তে পড়িয়া যাইতে হয় এই ভয়ে—সযত্নে এড়াইয়া চলিতেন, এবং স্ত্রীপুরুষের পতি-পত্নীসম্বন্ধ তাঁহাদের দৃষ্টিতে অতিদূষ্য পরিগণনীয় হওয়ায় তাঁহারা যেখানেই পারিয়াছেন রাহুলমাতার চরিত্র বিকৃতভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। রাহুলমাতা সম্পর্কে ইহাও ভাবিলে চিত্ত ব্যথিত হয় যে যিনি স্বামীর উচ্চাশাপূরণে এত উৎসাহ দিয়াছিলেন এবং ভবিষ্যতে সাধনাসিদ্ধ স্বামীর সহিত সহজীবনের এত আশা মনে পোষণ করিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত সফলমনোরথ স্বামীর আর কোনও লৌকিক সম্বন্ধই রহিল না।

মহাপ্রজাবতীর গর্ভে শুদ্ধোদনের নন্দ-নামক একটি পুত্র হইয়াছিল। এই

সময়ে স্বীয় পিতৃব্যকন্যা জনপদকল্যাণীর সহিত নন্দের বিবাহ হইবার কথা ছিল। বুদ্ধ একদিন তাঁহার ভিক্ষাপাত্রটি নন্দকে ধরিতে দিলে নন্দ উহা হাতে ধরিয়া রহিল। বুদ্ধ পিতৃভবনে সকলের সহিত কথাবার্তা বলিতে লাগিলেন, এখানে ওখানে ঘোরাফেরা করিতে লাগিলেন কিন্তু পাত্রটি লইবার আর নাম করিলেন না এবং নন্দও ভিক্ষাপাত্র হাতে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে রহিল। অবশেষে বুদ্ধ ন্যগ্রোধ-আরামে ফিরিয়া চলিলেন। ভিক্ষাপাত্রটি বুদ্ধকে ফিরাইয়া লইতে বলিতে নন্দের সাহস হইল না, সেও পাত্র হাতে তাঁহার পিছনে পিছনে চলিল। জনপদকল্যাণী বাতায়নে দাঁড়াইয়া প্রসাধন করিতে-ছিল, সে নন্দকে ঐভাবে বুদ্ধের পিছনে পিছনে যাইতে দেখিয়া চীৎকার করিয়া তাহাকে ফিরিয়া আসিতে বলিল। ফিরিবার ইচ্ছা নন্দের খুবই ছিল, কিন্তু বুদ্ধ তাহাকে ভিক্ষাপাত্র ধরিতে দিয়াছেন, তিনি তাহা ফিরাইয়া না লইলে সে কি করিয়া চলিয়া আসে? এদিকে চতুর বুদ্ধ কোনও দিকে না তাকাইয়া ন্যগ্রোধ-আরামে উপস্থিত হইলেন, নন্দও পাত্র হাতে সেখানে আসিল। বুদ্ধ নন্দকে সংসারত্যাগ করিতে বলিলেন, নন্দ অস্বীকৃত হইতে না পারিয়া ভিক্ষু হইল, কিন্তু যত দিন যাইতে লাগিল জনপদকল্যাণীর কথা ভাবিয়া ভাবিয়া নন্দ শুখাইয়া উঠিল। তাহার অবস্থা দেখিয়া বুদ্ধ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন জনপদকল্যাণীর মত সুন্দরী কেহ আর আছে কিনা; সে বলিল সমগ্র পৃথিবীতেও এরূপ সুন্দরী নাই। বুদ্ধ তাহাকে একটি বনের মধ্যে লইয়া গেলেন, সেখানে দাবানলে দগ্ধ মাঠে একটি বানরী পুড়িয়া মরিয়া পড়িয়া ছিল। বর্ণিত আছে তারপর বুদ্ধ নিজের ঋদ্ধিবলে একটি পরমা-সুন্দরী অপ্সরা সৃষ্টি করিয়া নন্দকে দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন অপ্সরা ও জনপদকল্যাণীর মধ্যে কে অধিক সুন্দরী। নন্দ বলিল অপ্সরার তুলনায় জনপদকল্যাণী অগ্নিদগ্ধা বানরীর মত। বুদ্ধ নন্দের এই অপ্সরাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিলে নন্দ জিজ্ঞাসা করিল কি করিলে অপ্সরা লাভ হয়। বুদ্ধ বলিলেন তাঁহার কথামত চলিলে নন্দের অপ্সরা লাভ হইবে। অপ্সরালাভের লোভে নন্দ সর্বদা বুদ্ধের কাছে কাছে থাকিয়া তাঁহার উপদেশ পালন করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুদিন পরে অপর ভিক্ষুরা অপ্সরালাভের লোভে নন্দের সংসারে ফিরিবার ইচ্ছা ত্যাগ করার কথা জানিয়া তাহাকে পরিহাস করিতে আরম্ভ করিল। ইহাতে লজ্জিত হইয়া নন্দ নির্জনে

বসিয়া একান্তমনে সাধনা করিতে লাগিল ও ক্রমে তাহার বাসনা দূর হইল। এইরূপে তাহার চৈতন্যোদয় হইলে সে বুদ্ধকে বলিল সে আর অপ্সরা চাহে না। বুদ্ধ ইহাতে আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিলেন পূর্বে নন্দ ভাঙ্গাছাদ ঘরের মত ছিল, ভিতরে বাসনা-বৃষ্টিজল পড়িত কিন্তু এখন সে ভাল পাকাছাদ ঘরের মত সুরক্ষিত হইয়াছে। এই কাহিনীটিতে বুদ্ধের রঙ্গপ্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। বোধহয় এই বৈমাত্রেয় অনুজের সহিত তাঁহার পূর্বে রঙ্গসম্বন্ধ ছিল, তাই তিনি রঙ্গচ্ছলেই তাহার হিতসাধন করিতে চাহিয়াছিলেন।

প্রথম দিনের পর বুদ্ধ বোধহয় কপিলবাস্তুতে আর ভিক্ষায় বাহির হন নাই, পিতৃগৃহেই তাঁহার প্রত্যহ আহারের নিমন্ত্রণ থাকিত। একদিন তিনি যখন আহারে বসিয়াছেন তখন অন্যকক্ষে রাহুলমাতা পুত্রকে বসনভূষণে সাজাইয়া বলিলেন "রাহুল, উনিই তোমার পিতা, উঁহার মহামূল্য সম্পত্তি আছে, তুমি উঁহার নিকট হইতে তোমার পৈতৃক ধন চাহিয়া লও।" রাহুল পিতামহ শুদ্ধোদনকেই জানিত, সে বলিল তাহার আর কোনও পিতা নাই। রাহুলমাতা তখন তাহাকে লইয়া ভোজনে উপবিষ্ট বুদ্ধকে বাতায়নপথে দেখাইয়া বলিলেন "রাহুল, ঐ শ্রমণই তোমার পিতা"। রাহুল তখন বুদ্ধের নিকটে গিয়া "শ্রমণ, তোমার চেহারা তো বেশ সুন্দর" প্রভৃতি বালসুলভ সরলতাময় অনেক কথা বলিতে লাগিল। আহারান্তে বুদ্ধ চলিয়া যাইবার সময়ে "শ্রমণ, আমার পিতৃধন আমাকে দেও" বলিতে বলিতে রাহুল তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল, তাহাকে নিবারণ করিবার প্রয়োজন কাহারও মনে হইল না। বুদ্ধও বোধহয় ইচ্ছা করিয়াই কিছু বলিলেন না। পিতার অনুসরণ করিতে করিতে রাহুল ন্যগ্রোধারামে উপস্থিত হইল। বুদ্ধ সারিপুত্রকে বলিলেন "রাহুল আমার নিকট ঐহিক ধন চাহিতেছে, আমি উহা অপেক্ষা এমন উত্তম ধন তাহাকে দিব যাহা জীবনে কখনও নষ্ট হইবে না।" তিনি রাহুলকে দীক্ষা দিতে বলিলেন। সারিপুত্র তাহাকে দীক্ষাদান করিলেন। রাহুল সারিপুত্রের শিক্ষাধীন রহিল। রাহুলমাতা যে রাহুলকে বুদ্ধের নিকট হইতে পৈতৃক ধন চাহিয়া লইতে শিখাইয়া দিয়াছিলেন, বৌদ্ধেরা তাহা এমন ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যেন শুদ্ধোদনের আলয়ে সঙ্গোপনে রক্ষিত বুদ্ধের কোনও গুপ্তধন ছিল এবং সেই গুপ্তধনের কথা



বুদ্ধসম্মুখে পুত্রসহ রাহুলমাতা—অজন্তা চিত্র

অর্থলোভিনী রাহুলমাতা এইভাবে জানিয়া লইতে চাহিয়াছিলেন। রাহুল-মাতার চরিত্রের যে পরিচয় তাঁহার আচরণ ও তাঁহার সম্বন্ধে বুদ্ধের উক্তি হইতে আমরা জানিতে পাই, তাহাতে এরূপ হীন প্রবৃত্তি তাঁহার হইয়াছিল বলিয়া কখনই মনে হয় না। রাহুলমাতার বাক্য এবং আচরণে মনে হয় বুদ্ধের

প্রতি তাঁহার যথার্থ ভক্তি ছিল এবং বুদ্ধের মহত্ত্বে তিনি পূর্ণ বিশ্বাসিনী ছিলেন। মনে হয় 'পৈতৃক ধন' দ্বারা রাহুলমাতা পুত্রমুখে স্বামীকে ইহাই জানাইতে চাহিয়াছিলেন যে, বুদ্ধ তপস্যাসিদ্ধির দ্বারা যাহা লাভ করিয়াছেন সেই মহামূল্য সম্পদ যেন তিনি পুত্রকেও দান করেন। ইহাতে বুদ্ধের প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস প্রকাশিত হইয়াছে।

রাহুলের সন্ন্যাসগ্রহণের কথা শুনিয়া শুদ্ধোদন মর্মাহত হইলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র সিদ্ধার্থ সংসার ত্যাগ করিল, দ্বিতীয় পুত্র নন্দ এবং পৌত্র রাহুলও সেই পথে গেল, তাঁহার বংশরক্ষার কেহ রহিল না। তিনি শোকার্ত হইয়া ন্যগ্রোধারামে গিয়া বুদ্ধের নিকট অনেক কাতরতা জানাইলেন এবং সন্তানস্নেহ কিরূপ তাহা বুঝাইবার জন্য বলিলেন যে, উরুবিল্বে তপস্যার সময়ে বুদ্ধের মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া তিনি বিশ্বাস করেন নাই—"পুত্রশোক মানুষের চর্মভেদ করিয়া মাংসভেদ করে, মাংসভেদ করিয়া অস্থিভেদ করে, অস্থিভেদ করিয়া মজ্জায় প্রবেশ করে।" তিনি নিজে যে গুরুতর শোক পাইলেন, আর কোনও পিতাকে যাহাতে তাহা না পাইতে হয় এজন্য শুদ্ধোদন বুদ্ধের নিকট প্রার্থনা করিলেন যে ভবিষ্যতে যেন পিতামাতার বিনা অনুমতিতে কাহাকেও দীক্ষা না দেওয়া হয়। বুদ্ধ ইহাতে স্বীকৃত হইয়া শিষ্যদের ডাকিয়া একথা জানাইলেন।

পত্নীসম্বন্ধে বুদ্ধের মনোভাবের সামান্য কিছু পরিচয় আমরা পাইয়াছি। পালিকামাতা সম্বন্ধেও যে তাঁহার চিত্তে সুপ্ত কোমলতা ছিল, তাহারও পরিচয় আমরা পরে পাইব। পুত্রসম্বন্ধে কি বুদ্ধের মনোভাব সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল? গৃহত্যাগের পূর্বে তিনি নিজেকে বুঝাইয়াছিলেন যে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া তিনি রাহুলকে দেখিবেন। পূর্বমনোভাবে পুত্রকে দেখার প্রয়োজন তাঁহার আর ছিল না, কিন্তু স্বভাবজাত পুত্রস্নেহ কি সম্পূর্ণই তাঁহার মন হইতে নির্বাসিত হইয়াছিল? সপ্ত বা অষ্টবর্ষীয় অন্য কোনও বালক তাঁহার নিকট ধন, এমন কি স্পষ্টভাবে সন্ন্যাসও চাহিলে তাহাকে দীক্ষাদান দ্বারা নির্বাণ-সুখমার্গ প্রদর্শনের কথা কি তাঁহার মনে হইত? পরবর্তীকালের একটি বিবরণে দেখা যায় একবার বুদ্ধ যখন রাজগৃহে বাস করিতেছিলেন, রাহুল তখন রাজগৃহ ও নালন্দার মধ্যবর্তী আম্রযষ্টিকা-গ্রামে অবস্থিতি করিতেছিলেন। একরাত্রে কাহাকেও কিছু না বলিয়া বুদ্ধ সহসা



ভিক্ষুবুদ্ধ—অজন্তা চিত্র

একাকী রাহুলের আবাসে উপস্থিত হইয়া রাহুলকে মিথ্যাভাষণের দোষ সম্বন্ধে বিস্তৃত উপদেশ দেন। তিনি অবশ্যই শুনিতে পাইয়াছিলেন যে রাহুল কোনও কারণে কাহাকেও কোনও বিষয়ে মিথ্যাকথা বলিয়াছিলেন। শাস্ত্রবর্ণিত অন্যান্য বহুঘটনায় দেখা যায় শিষ্যগণের কোনও বিষয়ে দোষত্রুটি হইলে অপরাধী তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে বা গুরুতর অপরাধে তাহাকে ডাকাইয়া বুদ্ধ তাহাকে তিরস্কার করিতেন বা উপদেশ দিতেন, কিন্তু এক্ষেত্রে বোধহয় সুপ্ত স্বভাবস্নেহে প্রণোদিত হইয়া রাহুলের হিতাকাংক্ষায় তিনি সামান্য কারণে স্বয়ংই অসময়ে তাহার নিকটে না যাইয়া পারেন নাই। সাধারণতঃ আমাদের স্নেহপ্রেমাদি বৃত্তি আত্মসুখকৈন্দ্রিক হয়, আত্মতৃপ্তির অভিলাষে আমরা অপরকে ভালবাসি, কিন্তু শুদ্ধপ্রেম শুধু প্রেমাস্পদেরই যথার্থ মঙ্গল কামনা করে, তাহা পরসুখকৈন্দ্রিক হয়। রাহুল সম্ভবতঃ পিতামহ-পিতামহী প্রভৃতির নিকটে শৈশবে অত্যধিক আদর পাইয়া কিছু চঞ্চলপ্রকৃতি হইয়াছিল এবং সংঘেও বুদ্ধের পুত্র বলিয়া অপরেরা তাহার সম্বন্ধে বিশেষ ক্ষমাশীল ছিলেন।

জন্মস্থান হইতে এইবারের মত বিদায় লইয়া বুদ্ধ রাজগৃহে ফিরিয়া চলিলেন। পথে তিনি অনুপ্রিয় গ্রামে—যেখানে গৃহত্যাগের পর তিনি প্রথমে আসিয়াছিলেন—বিশ্রাম করিলেন। কয়েকজন শাক্যযুবক উপালি নামক এক নাপিতকে সঙ্গে লইয়া কপিলবাস্তু হইতে এই গ্রামে বুদ্ধের নিকটে সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য আসিল। বুদ্ধ যে বনে ছিলেন সেখানে প্রবেশ করিবার পূর্বে শাক্যযুবকেরা তাহাদের মূল্যবান পরিচ্ছদাদি উপালির হাতে দিয়া কপিলবাস্তুতে লইয়া যাইতে বলিল এবং সাধারণ বস্ত্রে বুদ্ধের নিকট যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। উপালি কিছুপথ গিয়া ভাবিল শাক্যরা যেরূপ ক্রোধী, এই বস্ত্রাদি যুবকদের গৃহে লইয়া গেলে তাহাদের পরিজনবর্গ তাহাকে মারিয়া ফেলিবে। এই ভাবিয়া উপালি সেই বস্ত্রাদি একটি গাছে বাঁধিয়া রাখিয়া দৌড়িয়া আসিয়া যুবকদের বলিল যে সেও তাহাদের সঙ্গে সন্ন্যাসগ্রহণ করিবে। তখন সকলে মিলিয়া বুদ্ধের নিকটে আসিয়া দীক্ষা প্রার্থনা করিল এবং বলিল যে তাহাদের আভিজাত্যগর্ব নাশ করিবার জন্য নাপিত উপালিকেই সকলের প্রথমে দীক্ষা দেওয়া হউক, উপালির পর তাহারা দীক্ষা লইবে। বুদ্ধ ইহাতে সম্মতি দিলেন।

এই যুবকদের মধ্যে দেবদত্ত ও আনন্দ নামক বুদ্ধের দুই পিতৃব্যপুত্র ছিলেন, সাধারণতঃ এরূপ বর্ণনা করা হয়। দেবদত্ত বোধহয় হইতে পারেন, কিন্তু আনন্দ ইহার অনেক পরে বুদ্ধের শিষ্য হইয়াছিলেন। বুদ্ধের জীবনের শেষ বিশ-পঁচিশ বৎসর আনন্দ ছায়ার মত সর্বদা বুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। তিনি বুদ্ধকে শুধু ভক্তিই করিতেন না, খুব ভালও বাসিতেন। আনন্দের কথা আমরা পরে বলিব। বুদ্ধের সঙ্গে আনন্দের এই ঘনিষ্ঠ যোগের ফলে শাস্ত্রে দেখা যায় যেখানেই বুদ্ধ সেখানেই আনন্দ, আনন্দ ছাড়া বুদ্ধসম্বন্ধে কিছু যেন বলাই যায় না। এইজন্য ভক্তস্মৃতিতে আনন্দের সন্ন্যাসগ্রহণকাল গণনায় বিপর্যয় হইয়া থাকিবে।

বুদ্ধের প্রকৃতি, আকৃতি ও দিনচর্যা

বুদ্ধ কৌশলী ছিলেন। যশকে লুকাইয়া রাখা, নন্দকে ভিক্ষাপাত্র ধরিতে দেওয়া এবং অপ্সরা লাভের লোভ দেখান প্রভৃতি ইহার নিদর্শন। পরে আমরা দেখিতে পাইব যে, সিংহ নামক লিচ্ছবি সেনাপতিকে তিনি ঔদার্যের পর ঔদার্য দেখাইয়া এবং রোজ নামক একজন মল্লবংশীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সৌজন্যে অভিভূত করিয়া বশ করিয়াছিলেন। ক্ষত্রিয়সুলভ আর একটি মনোবৃত্তিও তাঁহার প্রবল ছিল—ক্ষমা করুণা প্রভৃতি গুণের সঙ্গে তাঁহার প্রকৃতিতে বিজিগীষাও ছিল; গুরু উদ্রক ও আলারকে ধর্ম বুঝাইবার ইচ্ছা, সকলের সম্মুখে জটিল তপস্বীদের তাঁহার শিষ্যত্বস্বীকার দেখান, পিতাকে জয় করিবার উদ্দেশ্যে কপিলবাস্তুতে গমন ও ভিক্ষা প্রভৃতিতে এভাব প্রকাশ পায়; পরে আমরা দেখিব যে তিনি লোকের নিষেধ না মানিয়া একাই অঙ্গুলিমাল নামক একজন দুর্দান্ত দস্যুর সম্মুখীন হইয়া তাহাকে বশীভূত করিয়া শিষ্যত্বস্বীকার করাইয়াছিলেন।

তাঁহার রহস্যবোধ প্রখর ছিল; আনন্দের সহিত তিনি কখন কখনও হাস্যপরিহাস করিতেন। নিজে ছড়া বাঁধিয়া অপরের ছড়ার উত্তর দেওয়া অরসিক লোকে পারে না। আমাদের দেশে সাধুসন্ন্যাসীদের মধ্যে সচরাচর দেখা যায় না এমন কয়েকটি প্রকৃতিবৈশিষ্ট্যও তাঁহার ছিল, যথা তীক্ষ্ণ সৌন্দর্য্যবোধ, পারিপাট্যপ্রিয়তা প্রভৃতি। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বর্ণনা করিয়া বাল্যসঙ্গীর তাঁহাকে ভুলাইবার চেষ্টা আমরা দেখিয়াছি। বুদ্ধ একবার

বলিয়াছিলেন যে তিনি এতস্থানে ভ্রমণ করিয়াছেন কিন্তু যথার্থ সুরম্য স্থান একটিও দেখেন নাই, তাঁহার রসবোধ এমনই তীক্ষ্ণ ছিল। সুবেশধারী লিচ্ছবিদের তিনি দেবতাদের সহিত উপমা দিয়াছিলেন। দূর হইতে বৈশালী নগরীর শোভা দেখিয়া একবার তিনি আনন্দকে সে সৌন্দর্য দেখিতে বলিয়াছিলেন। তিনি গণ্ডগোল সহ্য করিতে পারিতেন না এবং নির্জনতা ভালবাসিতেন, কিন্তু ঘোর নির্জনতাও আবার তাঁহার অপ্রিয় ছিল, এইজন্য তিনি তপস্যারম্ভকালে প্রাগ্‌বোধি পাহাড় ছাড়িয়া উরুবিল্বে আসিয়াছিলেন। পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে অগ্রাহ্য করিয়া নাক-কান-চোখে কোনও অনুভূতি গ্রহণ না করা আমাদের দেশে সাধনার উচ্চাবস্থার দ্যোতক বলিয়া মনে করা হয়, কিন্তু এবিষয়ে বুদ্ধের প্রকৃতি বিপরীত ছিল, যাহা কর্কশ বা অসুন্দর তাহাতে তাঁহার অস্বস্তি ও বিরক্তি জন্মিত। তিনি সুন্দর সুখকর মৃদু অবস্থার মধ্যে থাকিতে ভালবাসিতেন; নগরের কোলাহল ও অরণ্যের ঘোর নির্জনতা এ দুইএর কোনটিই তাঁহার প্রকৃতির অনুকূল ছিল না। নগরের কিছু বাহিরে উদ্যানগুলিতেই তিনি থাকিতে ভালবাসিতেন; ঋষিপত্তনের মৃগদাব, রাজগৃহের বেণুবন ও গৃধ্রকূট, বৈশালীর মহাবন, কৌশাম্বীর শিংশপাবন, শ্রাবস্তীর জেতবন প্রভৃতি মনোরম স্থানেই তাঁহার অধিকাংশ উপদেশ ও শিক্ষা প্রদত্ত হইয়াছিল। গৃধ্রকূট যে তাঁহার এত প্রিয়স্থান ছিল তাহার একটি কারণ এই মনে হয় যে, গৃধ্রকূট হইতে তিনি রাজগৃহ নগর সর্বদা দেখিতে পাইতেন—ইহাতে লোকসমাজের সহিত তাঁহার সমপ্রাণতা সূচিত হয়।

পথ শ্মশানাদি স্থান হইতে সংগৃহীত জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডাবলীর সমাবেশে প্রস্তুত ভিক্ষুদের চীবর প্রণয়ন ও ধারণ সম্বন্ধীয় ব্যবস্থাগুলি হইতে বুদ্ধের রুচিবোধ, ভিক্ষুদের উপবেশন শয়ন স্নান প্রভৃতির নিয়মগুলি হইতে তাঁহার পারিপাট্য ও পরিচ্ছন্নতাবোধ এবং সংঘসংক্রান্ত নানা নিয়মাবলী হইতে বহুজনের সম্মিলিত কর্মে তাঁহার শৃঙ্খলা-স্থাপনেচ্ছার পরিচয় পাওয়া যায়। একটি কথা মনে রাখিলে আমরা বুদ্ধচরিত্রের মূলসূত্র ধরিতে পারিব, তাহা এই—তিনি সুযোগ্য ক্ষত্রিয়সন্তানের সমুদয় শিক্ষা বিদ্যা বুদ্ধি শৌর্য কৌশল নিপুণতা লোকচরিত্রজ্ঞান কর্মদক্ষতা প্রভৃতি নিজের অহমিকা ও সুখবর্ধনে প্রয়োগ না করিয়া বৃহত্তর উদ্দেশ্যে বহুজনের মঙ্গলকামনায় প্রয়োগ করিয়াছিলেন; সুপটু ক্ষত্রিয় যে শক্তিতে অন্যকে নিজের বশীভূত করে, সেই শক্তি তিনি

লোককে ধর্মের বশীভূত করিতে নিয়োগ করিয়াছিলেন। ক্ষত্রিয়চরিত্রে ভাল যাহা যাহা, তাহার সহিত তিনি যথার্থ ব্রাহ্মণত্বের মিলনসাধন করিয়াছিলেন। গীতার এই কথারই প্রকাশ বুদ্ধের জীবনে দেখি—'অবিদ্বান ব্যক্তিগণ কর্মে আসক্ত হইয়া যেরূপে কর্ম করে, লোকসংগ্রহ (অর্থাৎ সমাজস্থিতি)-চিকীর্ষু হইয়া বিদ্বান ব্যক্তিরও অনাসক্তভাবে সেইরূপে কর্ম করা উচিত।'

বুদ্ধ যে মধ্যপথের কথা বলিতেন তাহা একটি দৃষ্টান্তে খুব স্পষ্ট হইয়াছে। সোন নামক এক যুবাভিক্ষু অত্যধিক কৃচ্ছাভ্যাস করিয়াও কোনও ফললাভ না করিতে পারায় সংসারের ভোগসুখে ফিরিয়া যাইবে স্থির করিয়াছিল। বুদ্ধ একথা জানিতে পারিয়া তাহাকে বলিলেন "সোন, গৃহত্যাগের পূর্বে কি তুমি বীণা বাজাইতে পারিতে?"

"হাঁ ভদন্ত, পারিতাম",

"সোন, তোমার কি মনে হয়? তোমার বীণার তারগুলি যদি খুব আঁট করিয়া বাঁধা থাকে, তবে কি তাহাতে ঠিক সুর বাহির হয় বা ভাল করিয়া বাজান যায়?"

"না ভদন্ত, তাহা যায় না?"

"সোন, তোমার কি মনে হয়? তোমার বীণার তারগুলি যদি খুব ঢিল করিয়া বাঁধা থাকে, তবে কি তাহাতে ঠিক সুর বাহির হয় বা ভাল করিয়া বাজান যায়?"

"না ভদন্ত, তাহা যায় না,"

"সোন, কিন্তু তোমার কি মনে হয়? যদি তোমার বীণার তারগুলি বেশি আঁট বা বেশি ঢিল করিয়া না বাঁধিয়া ঠিকমত টানিয়া বাঁধা হয়, তবে কি তাহাতে ঠিক সুর বাহির হয় ও ভাল বাজান যায়?"

"হাঁ ভদন্ত, যায়,"

"সোন, সেইরূপ অতিপ্রয়াসে ঔদ্ধত্য জন্মে এবং অত্যল্পপ্রয়াসে আলস্য জন্মে।"

যদিও তিনি দর্প দম্ভ আত্মাভিমান প্রভৃতি হইতে মুক্ত ছিলেন তথাপি কেহ তাঁহাকে অপদস্থ বা লঘু করিবার প্রয়াস পাইলে অথবা অযথা নিজ গৌরব বৃদ্ধির চেষ্টা করিলে বুদ্ধ কিছু জোরের সহিত প্রত্যুত্তর দিয়া

তাহার দর্পরোধ করিতেন। বিরুদ্ধবাদী বা ভ্রান্ত তার্কিকদের তিনি যুক্তিবাক্য-বলে পরাভূত করিতেন, কিন্তু ইহাতে সময়ে সময়ে কিছু উষ্ণতাও থাকিত। অপরের গুণ দেখিলে তিনি তাহার সুখ্যাতি না করিয়া পারিতেন না, সেইরূপ অপরের দোষত্রুটিরও তিনি সমুচিত ভর্ৎসনা করিতেন। তিনি ভালকথা বলিতে খুব ভালবাসিতেন এবং মৌনব্রতাবলম্বী কয়েকজন শিষ্যকে তিরস্কার ও মূক পশুর সহিত তুলনা করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত যাহারা দেখা করিতে আসিত তাহাদের সহিত তিনি সদালাপ করিতেন এবং প্রায়ই শিষ্যদের কথাবার্তার মধ্যে "ভিক্ষুগণ, তোমরা কি বিষয়ে আলোচনা করিতেছ?" বলিয়া তাহাতে যোগদান করিয়া তাহাদের দৃষ্টি উন্নত করিবার চেষ্টা করিতেন। পথে চলিবার সময়েও তিনি ধর্মালাপ করিতেন—ব্রহ্মজালসুত্ত নামক প্রসিদ্ধ উপদেশটি তিনি রাজগৃহ হইতে নালন্দার পথে শিষ্যদের বলিয়াছিলেন।

তাঁহার প্রকৃতিতে একটা প্রবল আকর্ষণীশক্তি ছিল—এক সন্ন্যাসী তাঁহার সম্বন্ধে জৈনগুরু মহাবীরকে বলিয়াছিলেন "শ্রমণ গৌতম মায়াবী, তিনি লোককে মায়ায় ভুলাইয়া শিষ্য করেন, আপনার শিষ্যরা যেন শ্রমণ গৌতমের কাছে না যায়।"

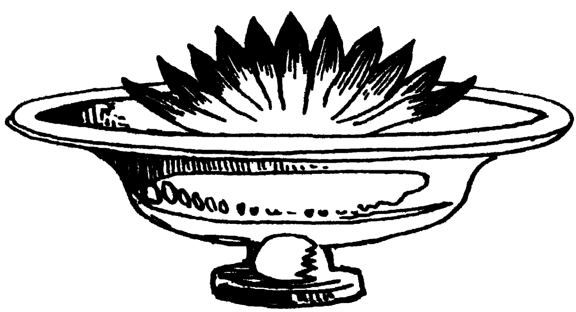
তাঁহার শরীর দীর্ঘাকৃতি, বর্ণ উজ্জ্বল ও গৌর এবং মুখশ্রী সুন্দর ছিল। শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে তাঁহার 'বত্রিশটি মহাপুরুষ-লক্ষণ' ও 'আশিটি ছোট লক্ষণ' ছিল। বর্ণিত আছে যে তিনি বাস্তবিকই মহাপুরুষ কিনা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য বড় বড় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা এই লক্ষণগুলি অনুসন্ধান করিতেন ও এগুলি দেখিয়া তাঁহার মহাপুরুষত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতেন। এই লক্ষণগুলি সবই শরীরসম্বন্ধীয়; সম্ভবতঃ তাঁহার দৈহিক এবং আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য হইতেই এগুলির কোন কোনটির উদ্ভব হইয়াছিল। এই লক্ষণগুলির সবের বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন, কতকগুলির কথা বলিব—তাঁহার মাথার উপরে মধ্যস্থল সুপুষ্ট উচ্চ ছিল, কেশ মুণ্ডিত থাকিত, বাড়িলে কুঞ্চিত হইয়া বাম হইতে দক্ষিণে তরঙ্গায়িত হইত; কপাল প্রশস্ত ও মসৃণ ছিল; ভ্রূ যুগ্ম ছিল এবং ভ্রূযুগলের সন্ধিস্থলে এক গোছা কেশ জন্মিয়াছিল, বার্দ্ধক্যে ইহা তুষার-শুভ্র দেখাইত; চক্ষু দীর্ঘপক্ষ্ম, চক্ষুতারকা ঘনকৃষ্ণবর্ণ এবং দন্ত সুসন্নিবিষ্ট ছিল। তিনি প্রশস্তবক্ষ প্রশস্তস্কন্ধ ও দীর্ঘবাহু ছিলেন এবং দীর্ঘ পদক্ষেপে চলিতেন। তাঁহার চলন ধীরতা ও গাম্ভীর্যযুক্ত এবং কণ্ঠস্বর মৃদু অথচ গম্ভীর ছিল।

বুদ্ধকে চিরজীবন তাঁহার প্রচারকার্যে সর্বদা স্থান হইতে স্থানান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত। বর্ষাবাসের সময়ে যখন ভ্রমণ বন্ধ করিয়া তিনি একস্থানে বাস করিতেন, তখন তাঁহার দৈনিক কার্যাবলী কিরূপ ছিল তাহা প্রসিদ্ধ টীকাকার বুদ্ধঘোষ রচিত সুমঙ্গলবিলাসিনী নামক দীঘনিকায়-টীকায় এইরূপ বর্ণিত আছে—তিনি অতিপ্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিতেন। যে ভিক্ষুর উপর তাঁহার পরিচর্যার ভার থাকিত, তাহার আনীত জলে হাতমুখ ধুইয়া তিনি চীবর পরিধান করিতেন এবং নির্জন স্থানে আসনে উপবেশন করিয়া বা পায়চারি করিয়া ধ্যান করিতেন। তারপর তিনি বহির্বাস পরিধান করিয়া ভিক্ষাপাত্র হাতে ভিক্ষায় বাহির হইতেন; কখনও তিনি একাকীই যাইতেন, কখনও সঙ্গে ভিক্ষুদের অন্য কেহ কেহ থাকিত। কেহ পূর্ব হইতে নিমন্ত্রণ করিয়া রাখিলে তিনি সেখানেই যাইতেন, নতুবা পথে-পথে গৃহে-গৃহে নতমুখে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করিতেন। প্রত্যহ তিনি একই পথে যাইতেন না, এক-এক দিন এক-এক পল্লীতে ভিক্ষা করিতেন। এসময়ে তিনি লোকজনের সহিত কথাবার্তা বলিতেন এবং শিক্ষা ও উপদেশ দিতেন। ভিক্ষার জন্য কোনও গৃহস্থের দ্বারে উপস্থিত হইলে কখন কখনও গৃহস্থ তাঁহাকে সম্বর্ধনা করিত, তাঁহার হাত হইতে ভিক্ষাপাত্র গ্রহণ করিত, আসন বিছাইয়া তাঁহাকে বসিতে দিয়া আহার দান করিত। আহারান্তে বুদ্ধ গৃহস্থ ও তাহার পরিজনবর্গকে ধর্মোপদেশ দিতেন। তারপর আবাসস্থানে ফিরিয়া হাতপা ধুইয়া বাহিরে বসিয়া তিনি অন্য ভিক্ষুদের আহারসমাপনের অপেক্ষা করিতেন। ভিক্ষালব্ধ আহার সমাধা হইলে অন্য শিষ্যেরা আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিত। এই সময়ে তিনি শিষ্যদের সহিত কথাবার্তা বলিতেন, তাহাদের উৎসাহ ও উপদেশ দিতেন এবং তাহাদের ধ্যানের বিষয় নির্ধারণ করিয়া দিতেন। মধ্যাহ্ন অতীত হইলে তিনি নিজের গুহা, কুটির বা কক্ষে গিয়া একাকী বিশ্রাম করিতেন। তাঁহার কক্ষে ভিক্ষুরা গন্ধপুষ্প রাখিয়া দিত। বিশ্রামান্তে অপরাহ্ণে তিনি আবার ধ্যানে বসিয়া অপর লোকের অবস্থা ও সংসারের সুখদুঃখের কথা চিন্তা করিতেন। বৈকালে দর্শনার্থীরা গন্ধপুষ্প ও মাল্য লইয়া তাঁহার কাছে আসিত, এই সময়ে তিনি তাহাদের সহিত কথাবার্তা আলাপ আলোচনা তর্কবিতর্ক করিতেন ও তাহাদের উপদেশ দিতেন। দর্শনার্থীরা চলিয়া গেলে তিনি স্নানে যাইতেন, এই সময়ে পরিচারক ভিক্ষু তাঁহার কক্ষ

পরিষ্কৃত করিত। সন্ধ্যাকালে তিনি একাকী বসিয়া ভিক্ষুদের জন্য অপেক্ষা করিতেন, তাহারা আসিয়া তাহাদের ধ্যানের ফলাফল তাঁহাকে জানাইত, তাঁহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিত ও তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিত। অন্য দর্শনার্থীরাও কেহ এই সময়ে আসিত। লোকজন সকলে বিদায় লইলে তিনি আবার বসিয়া বা পায়চারি করিয়া ধ্যান করিতেন। ধ্যানান্তে তিনি শয্যাগ্রহণ করিয়া নিদ্রা যাইতেন। প্রত্যূষে নিদ্রাভঙ্গে উঠিয়া তিনি পুনরায় সংসারের লোকের অবস্থা পর্যালোচনা করিতেন।

নানাস্থানে ক্রমাগত ভ্রমণে তাঁহার ব্যায়ামের অভাব হইত না এবং তিনি মুক্তস্থানে পায়চারি করিয়া বেড়াইতে ভালবাসিতেন। তিনি দিবসে একবার মাত্র আহার করিতেন। এইসকল নিয়মনিষ্ঠায় তাঁহার দীর্ঘজীবন লাভের সহায়তা হইয়াছিল। পীড়া বা রোগ জীবনে তাঁহার হয় নাই বলিলেই হয়, সামান্য অসুস্থতার জন্য কয়েকবার মাত্র চিকিৎসার প্রয়োজন হইয়াছিল।

[মহাবগ্গ ও চুল্লবগ্গ ; অঙ্গুত্তরটীকা ১।৩০১ ; ধম্মপদট্‌ঠকথা ; জাতক ১।৮৭ ; থেরগাথা ৫২৭-৫৩৬ (টীকা) ; উদান ৩।২ ; মহাবস্তু।]



পুষ্পপাত্র—অজন্তা চিত্র

৫

ধর্মের লক্ষ্য

পাঠককে পুনরায় স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে এখানে আমাদের বিচার্য বিষয় 'বৌদ্ধধর্ম' নামে প্রচলিত দার্শনিক মতবাদ নহে, বুদ্ধ নিজে যাহাকে 'ধম্ম' বলিতেন তাহাই আমরা কিছু বুঝিবার চেষ্টা করিব। বুদ্ধের ধর্মের লক্ষ্য কি ছিল তাহা যথাসম্ভব তাঁহার নিজের কথা দ্বারাই বিচার করিতে হইবে। যে যে স্থানে এ সম্বন্ধে বিশেষ সংবাদ পাওয়া যায় তাহা আমরা সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিতেছি।

মজ্‌ঝিমনিকায়ের চুল-মালুঙ্ক্যোবাদে বর্ণিত আছে মালুঙ্ক্যপুত্র নামক এক বুদ্ধশিষ্য তাঁহার নিকট আসিয়া বলিল তাহার কাছে ইহা আশ্চর্য মনে হয় যে, বুদ্ধের উপদেশে কতকগুলি অতি গভীর ও প্রয়োজনীয় তত্ত্ব সম্বন্ধে কোনও সুমীমাংসা থাকে না, যেমন জগৎ অনন্ত কি সান্ত, মৃত্যুর পর তথাগতের কোনও অস্তিত্ব থাকে কিনা ইত্যাদি। মালুঙ্ক্যপুত্র আরও বলিল যে এইগুলির কোনও মীমাংসা না হওয়া তাহার ভাল লাগে না ও ঠিক মনে হয় না, তাই সে বুদ্ধের কাছে তাহার সমস্যা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছে, বুদ্ধ অনুগ্রহ করিয়া ইহার যদি পারেন উত্তর দিন, কারণ কোনও লোক যদি কোনও বিষয় সম্বন্ধে না জানে বা না বুঝে এবং সে যদি খাঁটি লোক হয়, তবে তাহা স্বীকার করে।

বুদ্ধ বলিলেন "মালুঙ্ক্যপুত্র, তোমাকে আমি পূর্বে কি বলিয়াছি? আমি কি তোমাকে বলিয়াছি—'এস মালুঙ্ক্যপুত্র, আমার শিষ্য হও, আমি তোমাকে শিক্ষা দিব জগৎ অনন্ত না সান্ত, সসীম না অসীম দেহ ও প্রাণ এক না ভিন্ন মৃত্যুর পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা না'?"

"না ভদন্ত, আপনি তাহা বলেন নাই",

"মালুঙ্ক্যপুত্র, আর তুমিই বা কি আমাকে বলিয়াছিলে—'আমি আপনার শিষ্য হইতেছি, আপনি আমাকে শিক্ষা দিন জগৎ অনন্ত না সান্ত, সসীম না অসীম, দেহ ও প্রাণ এক না ভিন্ন, মৃত্যুর পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা না'?"

"না ভদন্ত, আমিও তাহা বলি নাই,"

"দেখ মালুক্ষ্যপুত্র, কোনও ব্যক্তি যদি বিষাক্ত বাণদ্বারা বিদ্ধ হয় এবং তাহার আত্মীয়স্বজনেরা সুদক্ষ চিকিৎসককে ডাকিয়া আনিলে আহত ব্যক্তি যদি বলে 'যতক্ষণ পর্যন্ত আমি না জানিতেছি আমাকে যে বাণবিদ্ধ করিল, সে লোকটি কে, অভিজাতবংশীয়, না ব্রাহ্মণ, না বৈশ্য, না শূদ্র, ততক্ষণ আমি আমার ক্ষতের চিকিৎসা করিতে দিব না,' অথবা যদি বলে 'যতক্ষণ পর্যন্ত আমি না জানিতেছি আমাকে যে বাণবিদ্ধ করিল তাহাকে লোকে কি বলিয়া ডাকে, সে কোন্ গোত্রের, দীর্ঘাকার না হ্রস্বাকার না মধ্যমাকার, বা যাহা দিয়া আমাকে মারিল সে অস্ত্রটা কি ভাবে নির্মিত হইল, ততক্ষণ আমি আমার ক্ষতের চিকিৎসা করিতে দিব না', তাহা হইলে তাহার অবস্থা কি হয়? লোকটি বাণাহত হইয়া প্রাণত্যাগ করে। জগৎ অনন্ত না সান্ত, সসীম না অসীম, দেহ ও প্রাণ এক না ভিন্ন, মৃত্যুর পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা না, এসকল বিষয়ে বুদ্ধ তাঁহার শিষ্যদের কোনও শিক্ষা দেন নাই। কেন? কারণ এসব জানিলে শুদ্ধতাবৃদ্ধি বা শান্তি বা জ্ঞানলাভ হয় না। যাহাতে শান্তি ও জ্ঞান লাভ হয়, সে সম্বন্ধে বুদ্ধ নিজের শিক্ষা দিয়াছেন—দুঃখের সত্য কি, দুঃখের উদয়ের সত্য কি, দুঃখের নিবৃত্তির সত্য কি এবং দুঃখনিবৃত্তির পথের সত্য কি। অতএব মালুক্ষ্যপুত্র, যাহা আমি প্রকাশ করি নাই তাহা অপ্রকাশিতই থাকুক এবং যাহা প্রকাশ করিয়াছি তাহাই প্রকাশিত হউক।"

বুদ্ধের এই উক্তি বড় মূল্যবান। ইহাতে আমরা দুইটি বিষয় দেখি। প্রথমতঃ, বুদ্ধ সব প্রশ্ন সম্বন্ধে—তাহাতে লোকের যতই আগ্রহ থাকুক না কেন—উত্তর দেওয়া প্রয়োজন বোধ করিতেন না, এবং দ্বিতীয়তঃ, তাঁহার কার্য উদ্দেশ্য ও ব্রত ছিল যাবতীয় দার্শনিক সমস্যার সুমীমাংসা নহে, পরন্তু চিকিৎসক কর্তৃক বিষাক্তবাণবিদ্ধ লোকের প্রাণরক্ষা করার মত দুঃখবিদ্ধ মানুষকে দুঃখমুক্ত করা। বুদ্ধ নিজেকে একজন খুব বড় দার্শনিক বলিয়া প্রচার করিতেন না; একটা অতি গুরুতর প্রয়োজন নিষ্পন্ন করার ব্যবহারিক মূল্যের প্রতিই তাঁহার দৃষ্টি ছিল, ইহাকেই তিনি তাঁহার জীবনের পরমব্রত ও অপরের প্রধান প্রয়োজন মনে করিতেন। মানুষকে দুঃখনিবৃত্তির পথ দেখানই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, যাহাতে ইহার সহায়তা হয় তাহাকেই তিনি মুখ্য মনে করিতেন, আর সবই তাঁহার দৃষ্টিতে গৌণ ছিল। যাহাতে

এই উদ্দেশ্য সাধনের কোনরূপ অন্তরায় ঘটে তাহাকেই তিনি নিষ্প্রয়োজন ও নিরর্থক বিবেচনা করিতেন। মানবের এই প্রয়োজন বুঝাইবার জন্য একটি উদাহরণে তিনি বলিয়াছিলেন যে, কোনও গৃহে যদি আগুন লাগে ও সেই গৃহে যদি শিশুগণ থাকে, তবে তাহাদের পিতা যেমন খেলনার লোভ দেখাইয়া শিশুদিগকে ঘরের বাহিরে আনিয়া তাহাদের প্রাণরক্ষা করেন, সেইরূপ দুঃখানলে দহ্যমান সংসার হইতে মুক্তি পাওয়াই অবোধ লোকের প্রধান কর্তব্য। এখানেও দেখা যায় তাঁহার উক্তির মূলে একটি গুরুতর প্রয়োজন নিষ্পন্ন করার উদ্দেশ্য নিহিত রহিয়াছে। অতএব মুক্তিই তাঁহার ধর্মের প্রধান লক্ষ্য ছিল। তিনি সংসারের লোককে বিষাক্তবাণবিদ্ধ ব্যক্তির মত বা দহ্যমানগৃহমধ্যস্থ অবোধ শিশুর মত মনে করিতেন। নানারূপ বড় বড় কথার বৃথা আলোচনা করিয়া ফল নাই, করিবার সময়ও নাই; কি করিয়া মুক্তি পাইব, বিষ নাশ করিয়া নীরোগ হইব; সেইটাই তিনি মানবের প্রধান কর্তব্য মনে করিতেন। এই অর্থেই তিনি বলিয়াছিলেন "হে ভিক্ষুগণ, যেমন মহাসমুদ্রের একমাত্র রস লবণরস, সেইরূপ এই ধর্ম ও নিয়মের একমাত্র রস বিমুক্তিরস"।

বিমুক্তি প্রধান কথা হইলেও অন্য কতকগুলি প্রশ্ন সম্বন্ধে—যাহা বুদ্ধ অপ্রধান মনে করিলেও অপরে অতি প্রয়োজনীয় মনে করিত—বুদ্ধ কি বলিতেন জানিতে কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। এ সম্বন্ধে বুদ্ধ কি বলিয়াছিলেন দেখা যাউক। সংযুক্তনিকায়ে বর্ণিত আছে কোশলরাজ প্রসেনজিৎ একবার সাকেত নগর হইতে শ্রাবস্তীতে যাইবার পথে বুদ্ধশিষ্যা ভিক্ষুণী ক্ষেমার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। ক্ষেমা জ্ঞানবতী বলিয়া প্রসিদ্ধা ছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে প্রসেনজিৎ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আর্যে, মৃত্যুর পর কি তথাগতের অস্তিত্ব থাকে ?"

"মহারাজ, ভগবান এমন কথা প্রকাশ করেন নাই যে মৃত্যুর পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে";

"আর্যে, তবে কি মৃত্যুর পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না ?"

"মহারাজ, ভগবান এমন কথাও প্রকাশ করেন নাই যে মৃত্যুর পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না;"

"আর্যে, তবে কি মৃত্যুর পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকেও, থাকেও না ?"

"মহারাজ, ভগবান এরূপও প্রকাশ করেন নাই যে মৃত্যুর পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকেও, থাকেও না ;"

"আর্যে, কি হেতু ও কি কারণে ভগবান ইহা প্রকাশ করেন নাই ?"

"মহারাজ, অনুমতি করুন আমি আপনাকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি —আপনার কি এরূপ কোনও হিসাবনবীশ বা ধনাধ্যক্ষ আছে, যে গঙ্গার বালুরাশি গণিয়া বা মহাসমুদ্রের জলরাশি মাপিয়া বলিতে পারে এতগুলি বালুকাকণা বা এত জল আছে ?"

"না আর্যে, আমার এরূপ লোক নাই ;"

"ভাল, কেন ইহা বলা যায় না ? কারণ মহাসমুদ্র গভীর অগাধ অতল। মহারাজ, সেইরূপ তথাগতের অস্তিত্বও 'স্কন্ধ'গুলির দ্বারা পরিমাপ করিলে তথাগতে এই 'স্কন্ধ'গুলির বিলুপ্তি ঘটে, তাহাদের মূলোচ্ছেদ হইয়া যায়, তালগাছ কাটিয়া ফেলিয়া রাখার মত এগুলিও ভবিষ্যতে আর জন্মিতে পারে না। মহারাজ, তথাগতের অস্তিত্ব জাগতিক মানে পরিমাপিত হইবে, এ অবস্থা হইতে তিনি মুক্তিলাভ করিয়াছেন ; তিনি গভীর মহাসমুদ্রের মত অতল ও অগাধ। মৃত্যুর পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে একথা ঠিক নহে, মৃত্যুর পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না একথাও ঠিক নহে।"

পরে প্রসেনজিৎ বুদ্ধকে এই প্রশ্ন করিয়া হুবহু একই উত্তর পাইয়াছিলেন। ইহাতে দেখা যায় যে থাকা না থাকা সম্বন্ধীয় আমাদের সাধারণ ধারণা দ্বারা মৃত্যুর পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে বা না থাকে, তাহা বুঝা যায় না। যদি থাকে, তবে সে থাকার অর্থ আমাদের জ্ঞানবুদ্ধির গোচর নহে। সংযুক্ত-নিকায়ে বর্ণিত আছে একবার বৎসগোত্র নামক এক পরিব্রাজক বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "ভদন্ত গৌতম, আত্মা কি আছে ?" বুদ্ধ তাঁহার প্রশ্নের কোনও উত্তর না দেওয়ায় তিনি বলিলেন, "তবে কি আত্মা বলিয়া কিছুই নাই ?" বুদ্ধ তথাপি কোনও উত্তর দিলেন না। তখন বৎসগোত্র সেখান হইতে উঠিয়া চলিয়া গেলেন। বৎসগোত্র কিছুদূর চলিয়া গেলে আনন্দ বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলেন বুদ্ধ বৎসগোত্রের প্রশ্নের কোনও উত্তর দিলেন না কেন ? বুদ্ধ বলিলেন "আমি যদি বৎসগোত্রকে বলিতাম আত্মা আছে তবে তাহাতে শাশ্বতবাদী শ্রমণব্রাহ্মণগণের মতের সমর্থন করা হইত, আর যদি বলিতাম আত্মা নাই তবে তাহাতে উচ্ছেদবাদী শ্রমণ-

ব্রাহ্মণগণের মতের সমর্থন করা হইত। আমি যদি বলিতাম আত্মা আছে তবে তাহাতে কি আমার উদ্দেশ্যসিদ্ধি হইত—সবই যে অনাত্ম, তাহার কি এ জ্ঞান জন্মিত ?"

"না ভদন্ত, তাহার এ জ্ঞান জন্মিত না" ;

"আনন্দ, কিন্তু আমি যদি বলিতাম আত্মা নাই, তবে সে এক বিপদ হইতে আর এক বিপদে পড়িত, সে ভাবিত 'পূর্বে আমার আত্মা ছিল না কি ? কিন্তু এখন আর তাহা নাই কি' ?"

ইহাতে মনে হয় বিষয়টি এইভাবে লইতে হইবে যে, বুদ্ধ এসম্বন্ধে হাঁও বলেন নাই, নাও বলেন নাই ; তিনি ইহা প্রকাশ করেন নাই, কেননা ইহাতে তাঁহার উদ্দেশ্যসিদ্ধি হইত না, লোকের কোনও লাভ হইত না। সুদক্ষ চিকিৎসক হয়তো যেমন বাণবিদ্ধ ব্যক্তিকে বলিতেন 'ক্ষতের বিষনাশ করিয়া তোমার প্রাণরক্ষাই তোমার ও আমার কাজ ; কে বাণ মারিল, তাহার বাড়ী কোথায়, এসবে এখন তোমারও কাজ নাই আমারও কাজ নাই, এসব সংবাদ জানিলে তোমার বিষ দূর হইবে না', সেইরূপ বুদ্ধেরও প্রধান ও একমাত্র লক্ষ্য ছিল যাহাতে লোকের বাস্তবিক উপকার হইবে তাহা বলা, তাহার নানাবিষয়ক নিরর্থক কৌতূহল চরিতার্থ করা নহে। দীঘনিকায়ের পোট্‌ঠপাদসুত্তে বুদ্ধ বলিয়াছেন আত্মাপ্রভৃতি বিষয়ে তিনি প্রশ্নের উত্তর এইজন্য দেন না যে এসবের আলোচনায় প্রকৃত সমস্যার সমাধান হইবে না ; অষ্টাঙ্গ মার্গের ফল সম্বন্ধে তিনি সুনিশ্চিত, তিনি এই মার্গের কথাই লোককে বলেন। কিন্তু প্রশ্ন উঠে তিনি এসব সম্বন্ধে নীরব ছিলেন বলিয়া কি বুঝিতে হইবে যে তিনি যাহা বলিতেন তাহার বেশি কিছু আর জানিতেন না, বা তাহা ছাড়া আর কিছু যে আছে তাহা মানিতেন না ? তাঁহার আর একটি উক্তিতে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। সংযুক্তনিকায়ে বর্ণিত আছে বুদ্ধ একসময়ে যখন কৌশাম্বী নগরের শিংশপাবনে ছিলেন তখন তিনি কয়েকটি শিংশপাপত্র হাতে লইয়া শিষ্যদের বলিয়াছিলেন "হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি মনে কর ? কোন্‌টা অধিক—আমার হাতের মধ্যে যে কয়টি শিংশপাপত্র রহিয়াছে তাহা, না শিংশপাবনে অন্য যে সমুদায় পত্র আছে তাহা ?"

"ভদন্ত, ভগবানের হাতে যে কয়টি পত্র রহিয়াছে তাহা অধিক নহে, ঐ বনে অন্য যে সকল পত্র আছে তাহাই অধিক ;"

"ভিক্ষুগণ, সেইরূপ আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা বলিয়াছি তাহা অপেক্ষা অধিক আরও অনেক বিষয় আছে, যাহার কথা আমি জানিয়াছি অথচ তোমাদিগকে বলি নাই। হে ভিক্ষুগণ, কেন আমি তোমাদিগকে এ সবের কথা বলি নাই? কারণ, হে ভিক্ষুগণ, ইহাতে তোমাদের কোনও লাভ হইবে না, ইহাতে শুদ্ধতাবৃদ্ধি হইবে না, ইহাতে সাংসারিক বিষয় ছাড়িয়া বাসনা-দমনের চেষ্টা হইবে না, ইহাতে ক্ষণস্থায়িত্ব নাশ হইবে না, ইহাতে শান্তিলাভ প্রজ্ঞালাভ বোধিলাভ এবং নির্বাণলাভ হইবে না, তাই আমি তোমাদের নিকট এসকল প্রকাশ করি নাই। কিন্তু, হে ভিক্ষুগণ, তোমাদের নিকট আমি কি প্রকাশ করিয়াছি? 'দুঃখ ইহা—', ভিক্ষুগণ, এই কথা আমি তোমাদের নিকট প্রকাশ করিয়াছি; 'দুঃখ-উৎপত্তির কারণ ইহা—', এই কথা আমি তোমাদের নিকট প্রকাশ করিয়াছি; 'দুঃখের নিরোধ ইহা—', এই কথা আমি তোমাদের নিকট প্রকাশ করিয়াছি; 'দুঃখ নিরোধের পথ ইহা—', এই কথা আমি তোমাদের নিকট প্রকাশ করিয়াছি"।

আত্মা আছে কি নাই, জগৎ অনন্ত না সান্ত, মৃত্যুর পর মুক্তপুরুষের কোনরূপ অস্তিত্ব থাকে বা না, এসকল প্রশ্ন মুক্তিলাভের পক্ষে নিষ্প্রয়োজন, একথা বলা বুদ্ধের ঠিক হইয়াছিল কিনা, সে প্রশ্নের বিচারে এখানে আমাদের লাভ নাই। কিন্তু তিনি ভুলই করিয়া থাকুন বা ঠিকই করিয়া থাকুন, তাঁহার নিরুত্তর তুষ্ণীম্ভাবে একটা বিপত্তির সৃষ্টি হইল। তাঁহাকে লোকে যে সকল প্রশ্ন করিত তাহা হইতে বেশ স্পষ্ট বুঝা যায় যে 'আত্মা কি আছে?' ইত্যাদির তিনি যখন উত্তর না দিতেন তখন লোকে স্বতঃই মনে করিত তবে বুঝি তিনি এগুলির অস্তিত্ব অস্বীকার করিতেছেন, আবার যখন 'আত্মা কি নাই?' ইত্যাদির উত্তরে তিনি নীরব থাকিতেন তখন প্রশ্নকর্তা মনে করিত তবে বুঝি তিনি বলিতেছেন এগুলি আছে। এ মহা সমস্যার কথা, ইহা লইয়া বহু বিতণ্ডা হইয়া গিয়াছে। বৌদ্ধধর্মের লক্ষ্যবস্তু নির্বাণের অর্থ লইয়াই বা কত না বাদবিসম্বাদ ঘটিয়াছে! কেহ বলিলেন নির্বাণের অর্থ প্রদীপ নিভিয়া যাওয়ার মত—একেবারে কিছুমাত্র আর বাকি থাকে না। বুদ্ধ যাহার সম্বন্ধে নীরব রহিতেন, অনেকে বলিলেন সেগুলি নাই। কিন্তু বাস্তবিক কি তাই? 'ইহা কি আছে?'—ইহার উত্তরে 'না' বলিলে যদি সত্যই একেবারে কিছুই নাই বুঝায়, তবে তিনি 'তবে কি ইহা নাই?' ইহারও উত্তর

দিতেন না. কেন? পরিব্রাজক বৎসগোত্রের প্রসঙ্গে তিনি আনন্দকে যখন বলিয়াছিলেন "যদি আমি বলিতাম আত্মা নাই, তবে সে এক বিপদ হইতে আর এক বিপদে পড়িত, ভাবিত,—'পূর্বে আমার আত্মা ছিল না কি? কিন্তু এখন তাহা আর নাই কি?' " তখন মনে হয়, তাঁহার কথার অর্থ এই যে, বৎসগোত্র যদি মনে করিত তাহার আত্মা নাই তবে সে ভুল করিত এবং যদি মনে করিত তাহার আত্মা আছে তবেও সে ভুল করিত। বুদ্ধের কথায় মনে হয় লোকে যে অর্থে বলিত আত্মা প্রভৃতি আছে তাহা তিনি অস্বীকার করিতেন, আবার যে অর্থে বলিত আত্মা প্রভৃতি নাই তাহাও তিনি অস্বীকার করিতেন। তিনি যে অর্থে ইহা বলিতেন তাহা সাধারণ জ্ঞান ও বুদ্ধির অগোচর, তাহা বুঝান যায় না, বর্ণনা বা ব্যাখ্যা করা যায় না, তাই তিনি সে সম্বন্ধে নিরুত্তর থাকিতেন, বিশেষতঃ আরও এইজন্য যে তাহাতে ধর্মার্থী বা মোক্ষার্থীর কোনও লাভ হইবে না।

বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে একটা সাধারণ অভিযোগ ইহার অনাত্মবাদ, সর্বশূন্যতা অর্থে নির্বাণবাদ এবং যে অক্ষয় অমরতা ও ভবিষ্যতের উপর মানবমনের এত আশাভরসা তাহার সম্বন্ধে আশাহীন অন্ধকার। বুদ্ধ কি সারাজীবন প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া এই নিরাশার শূন্যগর্ভা বন্ধ্যা বাণী জগৎকে দিয়া গেলেন? কিসের আশায় আমরা রূপরস-শব্দগন্ধস্পর্শময় এই বিচিত্রসংসারের ভোগসুখ ত্যাগ করিব? কি লাভের জন্য এত ত্যাগ, এত যত্ন, এত শ্রম করিব? তাহা কি ঘনান্ধকার শূন্যতার সাধনা? সংযুক্তনিকায়ে বর্ণিত আছে বুদ্ধ কাত্যায়নকে বলিয়াছিলেন "এক অন্তে সবই আছে, আর এক অন্তে কিছুই নাই। হে কাত্যায়ন, তথাগত এই দুই অন্তকে দূরে পরিহার করিয়া যে সত্য প্রচার করিয়াছেন তাহা এই দুই অন্তের মধ্যবর্তী।" এই মধ্যস্থতার অর্থ কি এই যে, দুইই ছাড়িলাম কিন্তু কিছুই পাইলাম না? এ প্রশ্নের উত্তর আমাদিগকে অন্বেষণ করিতে হইবে। নির্বাণ বলিতে বুদ্ধ কি বুঝিতেন তাহা আমাদের বুঝিবার কিছু চেষ্টা করিতে হইবে।

নির্বাণের অর্থ

সর্বপ্রথমে আমরা ধর্মচক্রপ্রবর্তন উপলক্ষ্যে বুদ্ধের উক্তি স্মরণ করি। বুদ্ধ বলিয়াছিলেন "আমি অমৃত লাভ করিয়াছি"; যে অবস্থার নাম অমৃত বা মরণহীনতা তাহার অর্থ কি সর্বশূন্যতা?

সংযুক্তনিকায়ে বর্ণিত আছে যমক নামক এক ভিক্ষু বলিয়াছিল "আমি ভগবানপ্রচারিত ধর্মের এই অর্থ বুঝি যে যদি কোনও নিষ্পাপ ভিক্ষুর শরীর বিনষ্ট হয়, ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তবে সে মৃত হয়, এবং মৃত্যুর পর তাহার আর কোনও অস্তিত্ব থাকে না।" যে সারিপুত্রের মত জ্ঞানী শিষ্য বুদ্ধের আর ছিল না এবং যিনি সকলের অপেক্ষা যথাযথ ভাবে বুদ্ধের শিক্ষা বুঝিতেন, সেই সারিপুত্র ভিক্ষু যমকের এই কথা শুনিয়া প্রশ্ন করিয়া করিয়া তাহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, যমক তথাগতকে এই জীবনেই সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে পারে নাই, অতএব তথাগতের ধর্মের মর্ম সে সব বুঝে, একথা বলার তাহার কোনও অধিকার নাই। সারিপুত্রের কথায় এই মনে হয় যে, নির্বাণপ্রাপ্ত ব্যক্তি সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলে চিন্তা এমন একটি গভীর দুজ্ঞেয় বিষয়ে প্রবেশ করে, যাহা সম্বন্ধে শেষ পর্যন্ত বর্ণনা বা তর্ক করা চলে না—যে ভিক্ষু আনন্দলাভ করিতে চাহে, তাহাকে অন্য বিষয়ে উদ্যম করিতে হইবে। সারিপুত্র যদি মনে করিতেন যে মৃত্যুর পর তথাগতের কোনও অস্তিত্ব থাকে না, তবে কি তিনি এরূপ কথা বলিতেন ?

নির্বাণের অর্থ তবে সর্বশূন্যতা নহে। ইহা একটি অতি গভীর, অতি গম্ভীর, অতি দুজ্ঞেয়, ভাষায় অবর্ণনীয় বিরাট অবস্থা। ইহা আমাদের সসীম জ্ঞানের অস্তিত্বধারণা নহে, ইহা একটি অতি বৃহৎ, অতি বিশাল অসীমের অবস্থা, ইহা আমাদের ধারণার অতীত। এ অবস্থা সাধারণ অস্তিত্বধারণার বহির্ভূত, কিন্তু নাস্তিত্ব নহে। উপনিষদের মত বুদ্ধও উদান-পাটলিগামিয়-বগ্‌গে ইহার 'নেতি নেতি' বর্ণনা করিয়াছেন—"হে ভিক্ষুগণ, এমন একটি অবস্থা আছে যেখানে পৃথিবীও নাই, অপ্‌ও নাই, তেজও নাই, বায়ুও নাই, আকাশের অসীমতাও নাই, জ্ঞানের অসীমতাও নাই, অথচ যাহা সর্বশূন্যতাও নহে; এখানে ইহলোকও নাই পরলোকও নাই, সূর্যও নাই চন্দ্রও নাই; হে ভিক্ষুগণ, ইহাকে আমি আসাও বলি না, যাওয়াও বলি না, স্থিতিও বলি না, চ্যুতিও বলি না, জন্মও বলি না, মৃত্যুও বলি না; ইহা অতল অচল ও অনন্ত, ইহাই দুঃখের নিবৃত্তি।" বুদ্ধের এই উক্তিতে দেখা যায় দুঃখনিবৃত্তি-স্বরূপ যে নির্বাণ, তাহাকে তিনি একটি 'অবস্থা' বলিয়াছেন এবং ইহা 'আছে'ও বলিয়াছেন। এই মহাবস্থার যে পরিচয় তাঁহার কথায় পাওয়া যায় তাহার ধারণা আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞানের বহির্ভূত হইলেও

অন্ততঃ এইটুকু আমরা বুঝিতে পারি যে ইহা আছে, ইহা পূর্ণতার অবস্থা, রিক্ততার নহে। অতএব নির্বাণের স্বরূপ যখন অস্তিধর্মক তখন তাহাকে সর্বশূন্যতা কি করিয়া বলা যায়? বুদ্ধ বলিয়াছিলেন "এখানেও পরলোকেও, কৃতপুণ্য ব্যক্তি উভয়ত্রই আনন্দ লাভ করে।" অন্তিম ভবিষ্যতে যদি কোনও সত্তাই না থাকিবে, তবে পরলোকের আনন্দও তো সসীম। সসীম সুখ পরিত্যাগ করিয়া যে বিপুল সুখ লাভের কথা তিনি বলিয়াছিলেন, তাহা কি সান্ত?

ত্রিপিটকের অন্তর্ভুক্ত না হইলেও মিলিন্দপঞ্‌হো নামক পালিগ্রন্থ বৌদ্ধদের নিকট অতিপ্রামাণিক বলিয়া মান্য হয়। এই গ্রন্থে নাগসেন নামক এক বৌদ্ধ ভিক্ষুর সহিত এক রাজার বৌদ্ধ মতবাদ সম্বন্ধে তর্কবিতর্কের বিবরণ আছে। রাজার নাম পালিভাষায় মিলিন্দ; ইনি সম্পূর্ণ কাল্পনিক ব্যক্তি নহেন। ঐতিহাসিকেরা বলেন, দেমেত্রিয়সের পুত্র মেনান্দার বা মেনান্দ্রস্ নামক যে গ্রীকো-ব্যাকট্রিয় রাজা খ্রীঃ পূঃ ২ শতকের মধ্যভাগে উত্তরপশ্চিম ভারতের সাগল নগরে রাজত্ব করিতেন, তিনিই এই মিলিন্দ। মিলিন্দপঞ্‌হো-গ্রন্থোক্ত সব আলোচনাই যে বাস্তবিক ভিক্ষু নাগসেন ও রাজা মেনান্দারের মধ্যে হইয়াছিল তাহা অবশ্য নহে। উভয়ের কিছু আলোচনা বোধহয় হইয়াছিল এবং সেই আলোচনাকে উপলক্ষ্য করিয়া কোনও প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ পণ্ডিত এই বিস্তৃত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থের মতবাদ আধুনিক পণ্ডিতগণ স্বয়ং বুদ্ধপ্রচারিত মতবাদ হইতে কিছু বিভিন্ন মনে করেন, কিন্তু তথাপি ইহার মতাবলী আমাদের প্রণিধানযোগ্য। এই গ্রন্থের আলোচনা হইতে আমরা নির্বাণের অর্থ বুঝিবার চেষ্টা করিব। বৌদ্ধ মতবাদের যেখানে যেখানে অস্পষ্টতা বা সন্দেহ অনুভূত হইত এমন বিষয়কে এই গ্রন্থে সুস্পষ্ট ও বোধ্য করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

রাজা মিলিন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন "ভদন্ত নাগসেন, নির্বাণ কি পূর্ণ আনন্দ, না ইহাতে কিছু দুঃখ থাকে?"

"মহারাজ, নির্বাণ পূর্ণ আনন্দ; ইহাতে দুঃখের অংশ নাই।"

রাজা বলিলেন লোকে নির্বাণলাভর জন্য শরীরমনের কত কষ্ট সহ্য করে, সাংসারিক সুখ বিসর্জন করিয়া কত দুঃখ পায়, এসকল যখন নির্বাণের জন্যই তখন নির্বাণে এগুলি থাকে বুঝিতে হইবে। নাগসেন বলিলেন নির্বাণ

অবিমিশ্র সুখ ; নিবাণপ্রাপ্তির পথ দুঃখময় বটে কিন্তু রাজাকেও রাজ্যসুখ-লাভের জন্য যুদ্ধবিগ্রহের কষ্ট সহ্য করিতে হয় নাই কি? বিদ্যালাভের জন্যও মানুষ কত কষ্ট স্বীকার করে কিন্তু তাই বলিয়া যে রাজ্যসুখ ও বিদ্যাসুখের আনন্দে দুঃখের অংশ থাকে, তাহা নহে। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন কোনও উপমা ব্যাখ্যা যুক্তি বা তর্ক দ্বারা নির্বাণের রূপ আয়ু বা পরিমাণ বুঝান যায় কিনা। নাগসেন বলিলেন তাহা যায় না, কারণ নির্বাণের সদৃশ আর কিছুই নাই। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন নির্বাণ যখন আছে এমন একটি অবস্থা, তখন ইহা পারা যাইবে না কেন? নাগসেন বুঝাইলেন যে, সমুদ্রের অস্তিত্ব আছে বটে কিন্তু তাই বলিয়া কি সমুদ্রে ঠিক কত জল আছে বা কত প্রাণী বাস করে তাহা কি রাজা বা অন্য বিদ্বানেরা বলিতে পারেন? বা অরূপকায়িক দেবতাদের বর্ণনা করা অসম্ভব হইলেও তাঁহাদের কি অস্তিত্ব নাই? সেইরূপ অস্তিধর্মক হইলেও উপমা প্রভৃতি দ্বারা নির্বাণের স্বরূপ বুঝান যায় না।

রাজা প্রশ্ন করিলেন নির্বাণের কি এমন লক্ষণ কিছুই নাই যাহা অন্য পদার্থেও বিদ্যমান এবং নির্বাণ সম্বন্ধে যাহার উপমা দেওয়া যাইতে পারে? নাগসেন বলিলেন নির্বাণের রূপ সম্বন্ধে না হইলেও কয়েকটি গুণ সম্বন্ধে এরূপ উপমা দেওয়া যাইতে পারে, যেমন নির্বাণে পদ্মের একটি গুণ, জলের দুইটি গুণ, ঔষধের তিনটি গুণ, সমুদ্রের চারটি গুণ, খাদ্যের পাঁচটি গুণ, আকাশের দশটি গুণ, চিন্তামণির তিনটি গুণ, রক্তচন্দনের তিনটি গুণ, ঘৃতের তিনটি গুণ এবং গিরিশৃঙ্গের পাঁচটি গুণ আছে। যথা— পদ্মে যেরূপ জলস্পর্শ হয় না, নির্বাণে সেইরূপ পাপস্পর্শ নাই। জল যেরূপ শীতল ও দাহনাশী, নির্বাণ সেইরূপ শীতল ও পাপজ্বর-নাশক ; জলে যেরূপ জীবের তৃষ্ণা নিবারণ হয়, নির্বাণে সেইরূপ কামতৃষ্ণা ভবতৃষ্ণা ও বিভবতৃষ্ণা দূর হয়। ঔষধ যেরূপ বিষক্লিষ্ট লোকের শরণ, নির্বাণ সেইরূপ পাপক্লিষ্ট জীবের শরণ ; ঔষধে যেরূপ ব্যাধিশান্তি হয়, নির্বাণে সেইরূপ শোকশান্তি হয় ; ঔষধ যেরূপ অমৃত, নির্বাণ সেইরূপ অমৃত। সমুদ্রে যেরূপ শবদেহ থাকিতে পারে না, নির্বাণে সেইরূপ কোনও পাপ থাকিতে পারে না ; সমুদ্র যেরূপ মহান ও অসীম এবং সমুদ্রে অনেক নদী পড়িলেও তাহা যেমন পূর্ণ হয় না সেইরূপ নির্বাণও মহান ও বিশাল এবং তাহাতে বহু জীব প্রবেশ করিলেও তাহা পূর্ণ হয় না ; সমুদ্রে যেমন মহাজীবকুল বাস করে,

নির্বাণেও সেইরূপ অর্হৎগণ বাস করেন; সমুদ্র যেরূপ অসংখ্য বিবিধ ও সুন্দর তরঙ্গবিক্ষেপ-কুসুমনিচয়ে সংকুসুমিত, নির্বাণও সেইরূপ অসংখ্য বিবিধ ও সুন্দর বিশুদ্ধি-জ্ঞান-বিমুক্তি-কুসুমনিচয়ে সংকুসুমিত। খাদ্য যেরূপ সকল জীবের আশ্রয়, নির্বাণলাভ হইলে সেইরূপ জীবনের আশ্রয় হয় কারণ ইহাতে জরামৃত্যুর অন্ত হয়; খাদ্যে যেমন জীবের শক্তিবৃদ্ধি হয় নির্বাণলাভে সেইরূপ সকলের শক্তি বৃদ্ধি হয়; খাদ্য যেমন জীবের শ্রীহেতু, নির্বাণও সেইরূপ সকলের পুণ্যশ্রীহেতু; খাদ্যে যেরূপ জীবের ক্লেশদূর ও ক্ষুধানাশ হয়, নির্বাণলাভে সেইরূপ সর্বজীবের পাপক্লেশদূর ও সর্বযাতনানাশ হয়। আকাশের মত নির্বাণও অজ অজর অমর অক্ষয় এবং জন্মান্তরহীন; ইহা অজয়, চোরে ইহা চুরি করিতে পারে না, ইহা আশ্রয়নিরপেক্ষ; আকাশে যেমন পক্ষীগণ বিহার করে, নির্বাণে সেইরূপ অর্হৎগণ বিহার করেন এবং আকাশের মত ইহা অবাধ ও অনন্ত। চিন্তামণির মত নির্বাণেও সর্বকামনা পূর্ণ হয়, উহা আনন্দদায়ক ও সমুজ্জ্বল। রক্তচন্দনের মত নির্বাণও দুর্লভ অতুলসুগন্ধি ও সুজনপ্রশংসিত। ঘৃতের মত নির্বাণও সুবর্ণ সুগন্ধ ও সুস্বাদ। গিরিশৃঙ্গের মত নির্বাণও মহোচ্চ ও অচল, গিরিশৃঙ্গ যেরূপ দুরারোহ, নির্বাণও সেইরূপ পাপের পক্ষে দুরারোহ; গিরিশৃঙ্গে যেমন তৃণাদি জন্মিতে পারে না, নির্বাণেও সেইরূপ পাপ জন্মিতে পারে না, এবং গিরিশৃঙ্গের মত নির্বাণও প্রিয়াপ্রিয়নির্বিকার।

রাজার প্রশ্নের উত্তরে ভিক্ষু নাগসেন আবার বলিলেন "মহারাজ, শান্তিময় সুখময় ও সুকুমার এই যে নির্বাণ, ইহা অস্তিধর্মক। কিভাবে নির্বাণকে জানা যায়? ভয়বিপদশূন্যতা নির্ভয়তা শান্তি আনন্দ সুখ সৌকুমার্য শুদ্ধতা ও শীতলতা দ্বারা ইহাকে জানা যায়। জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর হইতে প্রবল চেষ্টায় মুক্ত হইয়া শীতল স্থানে গেলে, গলিতশবাদিপূর্ণ কূপ হইতে বহুশ্রমে বাহির হইয়া মুক্তস্থলে পৌছিলে, বা সশস্ত্র শত্রুর সম্মুখে ভীত কম্পিত অবস্থা হইতে মহাশক্তিতে পলাইয়া সুরক্ষিতস্থানে আশ্রয় লইলে লোকের মনে যে পরমানন্দ লাভ হয়, জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি হইতে মুক্ত হইয়া নির্বাণলাভ করিলে জীবেরও সেইরূপ পরমানন্দ লাভ হয়"। আর একটি প্রশ্নের উত্তরে নাগসেন বলিয়াছিলেন "মহারাজ, জ্ঞানহীন জীবগণ ইন্দ্রিয়ে ও ইন্দ্রিয়বিষয়ে আনন্দলাভের চেষ্টা করে এবং তাহাতে আবদ্ধ হইয়া থাকে, এইজন্য তাহারা জন্ম জরা ব্যাধি মৃত্যু প্রভৃতি হইতে মুক্ত হয় না, দুঃখবিমুক্তি লাভ করে না,

কিন্তু জ্ঞানবান আর্যশিষ্য ইন্দ্রিয় বা ইন্দ্রিয়বিষয়ে আনন্দলাভের চেষ্টা করেন না, তাহাতে বদ্ধ হন না, ফলে তাঁহার তৃষ্ণা দূর হয়; তৃষ্ণা দূর হইলে উপাদান দূর হয়, উপাদান দূর হইলে ভব দূর হয় এবং ক্রমে জন্ম জরা ব্যাধি দুঃখ শোক পরিবেদন প্রভৃতি দূর হয়। এইরূপে দুঃখের নিরোধ হয় এবং নিরোধই নির্বাণ।" আর একটি কথা উদ্ধৃত করিয়া আমরা এই প্রসঙ্গ শেষ করিব। মৃত্যুর পর নির্বাণপ্রাপ্ত তথাগতের অস্তিত্ব থাকে কিনা, সে বিষয়ে রাজা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "ভদন্ত নাগসেন, 'বুদ্ধ' বলিয়া কোনও ব্যক্তি কি আছেন?"

"হাঁ মহারাজ, আছেন,"

"তবে কি তিনি এখানে আছেন বা ওখানে আছেন, এরূপ দেখাইতে পারা যায়?"

"মহারাজ, যেরূপ অন্ত হইলে এমন কিছুই আর অবশিষ্ট থাকে না যাহাতে আবার ব্যক্তির উদ্ভব হয়, তথাগতের সেইরূপ অন্ত হইয়াছে; তথাগত এখানে আছেন বা ওখানে আছেন এরূপ দেখাইতে পারা যায় না,"

"একটি উদাহরণ দ্বারা বুঝান,"

"মহারাজ, আপনার কি মনে হয়? যেখানে খুব বড় একটা আগুন জ্বলিতেছে, সেখানে একটা শিখা নিভিয়া গেলে কি বলা যায় উহা এখানে বা ওখানে?"

"না ভদন্ত, সে শিখার অন্ত হইয়াছে, তাহা আর নাই,"

"মহারাজ, সেইরূপ তথাগতেরও অন্ত হইয়াছে, তিনি এখানে আছেন বা ওখানে আছেন এরূপ দেখাইতে পারা যায় না।"

ইহাতে দেখা গেল যে, ব্যক্তিপার্থক্য নাশ হইয়া দুঃখের সম্পূর্ণ বিলোপই নির্বাণ, অথবা সসীম ও সদুঃখ অবস্থার অভাবই নির্বাণ। নাগসেন যে আনন্দ পূর্ণতা শান্তি ও শীতল অবস্থাকে নির্বাণ বলিলেন তাহা সর্বপূর্ণতার অবস্থা, ইহাকে নাস্তিধর্মক সর্বশূন্য রিক্ততা বলা ঠিক মনে হয় না। এই অবস্থার সহিত উপনিষদের মুক্তি অবস্থার বিশেষ পার্থক্য নাই। পরমাত্মা ও জীবাত্মাকে স্বীকার করিয়া মানবের চরম আদর্শ সম্বন্ধে বেদান্ত যে ধারণায় উপনীত হইয়াছিলেন, জীবাত্মাকে অস্বীকার করিয়া ও পরমাত্মা সম্বন্ধে নীরব থাকিলেও বুদ্ধও সেই একই আদর্শে পৌঁছিয়াছিলেন। গন্তব্যস্থান উভয়ের একই, পার্থক্য বোধহয় কেবল মার্গে ও দৃষ্টিভঙ্গিতে। জৈনশাস্ত্রের নির্বাণের

আদর্শেও দেখা যায় তাহাতে কোনও পরমাত্মা মানা না হইলেও জীবাত্মার মুক্ত অবস্থার যে কল্পনা করা হইয়াছে তাহাও প্রায় বেদান্তের মুক্তির অনুরূপ। বস্তুতঃ ভারতীয় ধর্মসাধনা বহুমার্গে বিভক্ত হইলেও সকলেই প্রায় একই আদর্শে অনুপ্রাণিত। আধুনিক পণ্ডিতগণ কেহ মনে করেন বৌদ্ধ দার্শনিক নাগার্জুনের শূন্যবাদ হইতেই আচার্য শঙ্করের অদ্বৈত-নির্গুণ-ব্রহ্মবাদের উদ্ভব হইয়াছিল এবং এই উভয় মতে বিশেষ পার্থক্য নাই। নাগার্জুনের শূন্যবাদ ও বুদ্ধের নির্বাণবাদ সম্পূর্ণ একই মত ছিল কিনা বলা যায় না, কিন্তু যতটুকু বুঝা যায় তাহাতে মনে হয় বুদ্ধের নির্বাণবাদ রিক্ততার অবস্থা নহে, ইহা লৌকিক সুখদুঃখের অতীত একটি উচ্চতর অতিবিশাল বিরাট অচিন্ত্য অবস্থা। বুদ্ধ একস্থানে বলিয়াছেন যে, তাঁহার সমালোচকগণ ও বিরুদ্ধবাদীগণ ভুল করিয়া মনে করে তিনি উচ্ছেদবাদী অর্থাৎ অন্তিমে কোনও সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, বস্তুতঃ কিন্তু তাহা তিনি বলেন না। উপসীব নামক এক ব্যক্তি তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিল "হে শ্রমণ, নির্বাণপ্রাপ্তের কি কোনও সত্তা থাকে না, অথবা সে চিরতরে দুঃখমুক্ত হয়?" উত্তরে বুদ্ধ বলিয়াছিলেন "নির্বাণপ্রাপ্তের বিষয়ে এমন কোনও পরিমাপ নাই যাহাতে তাহার সম্বন্ধে জানা যাইতে পারে যে তাহার কোনও সত্তা নাই। যখন সকল উপাধির অন্ত হয়, তখন সকল বাগ্‌বিবৃতিরও অন্ত হয়।" ইহাতে মনে হয় গীতায় যেরূপ ব্রহ্ম সম্বন্ধে বলা হইয়াছে তাহা 'সৎও অসৎও,' অথবা 'তাহাকে সৎও বলা যায় না, অসৎও বলা যায় না', নির্বাণও সেইরূপ অবর্ণনীয়।

ব্রাহ্মণত্ব ও জাতিভেদ

জাতিব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব বুদ্ধ মানিতেন না। বোধিলাভের অল্পদিন পরেই উরুবিল্বের বনে তিনি এক উদ্ধত ব্রাহ্মণকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ যথাস্থানে করিয়াছি। আর এক ব্রাহ্মণ গৃহত্যাগ করিয়া অন্য এক সম্প্রদায়ে যোগ দিয়াছিল। সে ভিক্ষান্ন ভোজন করিত। তাহার একবার মনে হইল বুদ্ধ বোধহয় শুধু তাঁহার নিজশিষ্যদেরই 'ভিক্ষু' বলেন, অন্য সম্প্রদায়ের শ্রমণদের 'ভিক্ষু' বলেন না। সে বুদ্ধের সমীপে গিয়া বলিল "ভদন্ত গৌতম, আমি ভিক্ষান্নমাত্র ভোজন করিয়া প্রাণধারণ করিয়া থাকি,

আমাকেও আপনি ভিক্ষু বলিয়া সম্বোধন করিবেন"। বুদ্ধ বলিলেন "হে ব্রাহ্মণ, ভিক্ষা করে বলিয়াই আমি লোককে ভিক্ষু বলি না; সব নিয়মগুলি পালন করিলেও ভিক্ষু হয় না; যে পাপপুণ্য ত্যাগ করিয়া শুদ্ধচিত্তে জ্ঞানবলে সংসারে বিচরণ করে তাহাকেই আমি ভিক্ষু বলি।" শাস্ত্র আওড়াইলেই ব্রাহ্মণ হয় না। বুদ্ধ বলিয়াছিলেন "প্রাচীন ঋষিদের প্রণীত স্তোত্র ও কথা আবৃত্তি করিয়া যে নিজেকে ঋষি মনে করে, তাহার তুলনা সেই দাস বা সাধারণ লোকের সহিত করা যায় যে যে-আসনে বসিয়া রাজা তাঁহার অনুচরদিগকে আজ্ঞা দেন, সেই আসনে বসিয়া ঠিক সেই কথাগুলিরই পুনরুক্তি করিয়া নিজেকে রাজা মনে করে," এবং "জটা গোত্র বা জন্মের দ্বারা ব্রাহ্মণ হয় না, যে সত্য ও ধর্ম পালন করে সেই সুখী, সেই ব্রাহ্মণ।" ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব তিনি মানিতেন তবে সাধারণ লোকে যাহাকে ব্রাহ্মণ বলে অর্থাৎ ব্রাহ্মণজাতির সন্তান মাত্রেই ব্রাহ্মণ অতএব শ্রেষ্ঠ, এ কথা তিনি মানিতেন না। সত্য ও ধর্ম যে পালন করে সে যে বংশই জন্মগ্রহণ করুক, বুদ্ধের দৃষ্টিতে ব্রাহ্মণপদবাচ্য হইত।

হোম-যাগযজ্ঞের বুদ্ধ নিন্দা করিয়াছিলেন এবং 'যাগযজ্ঞ' কথাগুলিরও তিনি উচ্চতর ব্যাখ্যা দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন ব্রাহ্মণেরা সাধারণতঃ যে ভাবে যাগযজ্ঞ করিয়া থাকেন তাহা অপেক্ষা যে যজ্ঞে জীবহত্যা হয় না তাহা ভাল, জীবহত্যাহীন যজ্ঞ অপেক্ষা দানযজ্ঞ ভাল দানযজ্ঞ অপেক্ষা ধর্ম অহিংসা সত্যপরায়ণতা ও অকপটতা ভাল, ভিক্ষুর শুদ্ধ সাম্যভাব এগুলির অপেক্ষাও ভাল, এবং সর্বশ্রেষ্ঠ যজ্ঞ হইতেছে নির্বাণলাভের জ্ঞান। গীতাও যেমন বলিয়াছেন 'দ্রব্যময় যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেয়।' জাতিব্রাহ্মণকে বুদ্ধ যে অবজ্ঞা করিতেন তাহা নহে। তাঁহার অনেক ব্রাহ্মণ শিষ্য ছিল। বিখ্যাত সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন ব্রাহ্মণ ছিলেন। বেরঞ্জ নামক এক ব্রাহ্মণ বুদ্ধকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, একথা ঠিক কিনা যে বুদ্ধ বয়োবৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণকে যথাযোগ্য সম্মানপ্রদর্শন করেন না, তাঁহাদের দেখিলে গাত্রোত্থান করেন না বা বসিতে আসন দেন না। বুদ্ধ উত্তর দিয়াছিলেন যে, পৃথিবীতে এমন ব্রাহ্মণ কেহ নাই যাহাকে এরূপ সম্মান দেখান তাঁহার উচিত। ইহাতে বুঝা যায় বুদ্ধ জাতিব্রাহ্মণকে অন্য সাধারণ লোকের মতই দেখিতেন। জাতিব্রাহ্মণ উপযুক্ত হইলে তাহার সহিত তিনি অবশ্য উপযুক্ত ব্যবহারই করিতেন।

এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণদম্পতি বুদ্ধকে পুত্রসম্বোধন করিয়াছিলেন। ভিক্ষুরা ইহাতে বিস্ময় প্রকাশ করিলে বুদ্ধ বলিয়াছিলেন পূর্বজন্মে তিনি অনেকবার ইঁহাদের সন্তান ছিলেন। ব্রাহ্মণদম্পতির মৃত্যু হইলে বুদ্ধ শবানুগমন করিয়াছিলেন। একবার বুদ্ধ বাতরোগে আক্রান্ত হইয়া উপবাণ নামক এক শিষ্যকে দেবহিত নামক ব্রাহ্মণের বাড়ী হইতে গরম জল আনিতে পাঠাইয়াছিলেন। দেবহিত ইহাতে আনন্দিত হইয়া বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলেন কোন্ দানের ফল সর্বশ্রেষ্ঠ। বুদ্ধ বলিলেন দানের মূল্য দাতার গুণানুসারে হয়।

একথা অবশ্য বলা যায় যে বুদ্ধ সমাজ হইতে জাতিভেদ তুলিয়া দিতে বলেন নাই, কিন্তু তিনি সকলেরই নিকট একথা প্রচার করিতেন যে জাতি দ্বারা নহে, গুণের দ্বারাই মানুষের শ্রেষ্ঠতা হয়। নিজের ভিক্ষুসংঘের মধ্যে তিনি কোনরূপ জাতিগত বিভিন্নতাকে স্থান দেন নাই। যে বয়োজ্যেষ্ঠ সে সকল বয়ঃকনিষ্ঠের সম্মানভাজন, যে গুণবৃদ্ধ সে সকলেরই সম্মানার্হ, জাতির কোনও কথা সংঘে উঠিতে পারিত না। বুদ্ধ বলিয়াছিলেন "হে ভিক্ষুগণ, যেমন গঙ্গা যমুনা অচিরবতী সরযূ মহী প্রভৃতি মহানদী যখন সমুদ্রে পড়ে তখন তাহাদের পূর্বের নামগোত্র আর থাকে না এবং সকলেই সমুদ্র নামে অভিহিত হয়, সেইরূপ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিজাতির লোক গৃহত্যাগ করিয়া তথাগত-প্রবর্তিত ধর্মবিনয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলে তাহাদের পূর্বের নামগোত্র আর থাকে না, সকলেই শাক্যপুত্রীয় শ্রমণ নামে অভিহিত হয়।" বুদ্ধের অনেক ক্ষত্রিয়শিষ্য ছিল বটে কিন্তু সংঘে তাহাদের কোনও পদপ্রাধান্য ছিল না। যে কেহ সংঘে প্রবেশ করিলে অন্য সকলের মধ্যে তাহার পদমর্যাদা হইত তাহার জাতি নহে, গুণ অনুসারে। গৃহস্থসমাজে প্রচলিত জাতিভেদের বিরুদ্ধতা বুদ্ধ করেন নাই বটে কিন্তু তাই বলিয়া তিনি জাতিভেদ মানিতেন একথা বলা ঠিক হয় না। তিনি ব্রাহ্মণদের সহিত বিরুদ্ধতা করিয়া ক্ষত্রিয়প্রধান দলগঠন করিতে চাহিয়াছিলেন, একথাও ঠিক নহে। অনেক হীনজাতির ও নীচপদের লোকও সংঘে প্রবেশ করিত। এক ব্রাহ্মণের দাস পলাইয়া গিয়া সংঘে প্রবেশ করিয়াছিল, ব্রাহ্মণ দাসকে ফিরাইয়া লইবার জন্য বুদ্ধের কাছে আসিলে বুদ্ধ ব্রাহ্মণকে ভৎর্সনা করিয়া বলিয়াছিলেন দাস তাহার বোঝা নামাইয়া দিয়াছে, তাহার উপর ব্রাহ্মণের আর কোনও অধিকার নাই। একবার রাজার সহিত কথাপ্রসঙ্গে বুদ্ধ

বলিয়াছিলেন "যদি আপনার কোনও দাস বা ভৃত্য পীতবাস গ্রহণ করিয়া নির্দোষ চিন্তা বাক্য ও কার্যে ধর্ম পালন করে, তাহা হইলে কি আপনি বলিবেন 'এ লোকটি এখনও আমার দাস ও ভৃত্য থাকুক, আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকুক, আমাকে প্রণাম করুক, আমার আজ্ঞা পালন করুক, আমার আরামের জন্য খাটুক, সসম্ভ্রমে কথা বলুক ও আমার আজ্ঞাবহ হইয়া থাকুক' ?"

"না ভদন্ত, আমি তাহাকে অভিবাদন করিব, তাহাকে দেখিলে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বসিতে আসন দিব, সে অসুস্থ হইয়া পড়িলে অথবা তাহার বস্ত্র অন্ন ও ঔষধের প্রয়োজন হইলে তাহাকে তাহা দান করিব এবং তাহাকে যথোচিত নির্ভয়তাদান ও রক্ষা করিব"। এখানে দেখা যায় সংঘে প্রবেশ করিলে, যে পূর্বে ক্রীতদাস ছিল সে রাজারও সম্মানার্হ হইত।

সুনীত নামক এক ভিক্ষু বলিয়াছিল "নীচবংশে আমার জন্ম, আমি অনাথ ও দরিদ্র ছিলাম ; আমি হীনকার্য করিতাম, দেবালয় ও রাজভবনের শুষ্কপুষ্পাদি ঝাঁট দেওয়াই আমার কাজ ছিল ; লোকে আমাকে অবহেলা করিত, ঘৃণা করিত, তুচ্ছজ্ঞান করিত, সসঙ্কোচে আমি সকলকে সম্ভ্রম দেখাইতাম। তারপর মগধের রাজধানীতে আমি সেই বীরশ্রেষ্ঠ বুদ্ধকে ভিক্ষুদলের সঙ্গে যাইতে দেখিলাম ; আমার ভার ত্যাগ করিয়া আমি দৌড়িয়া তাঁহাকে ভক্তিভরে প্রণাম করিতে গেলাম। সেই নরশ্রেষ্ঠ আমার প্রতি দয়ালু হইয়া থামিয়া দাঁড়াইলেন। তারপর আমি তাঁহার চরণে প্রণাম করিয়া নিকটে গিয়া, সেই লোকশ্রেষ্ঠ আমাকে ভিক্ষুরূপে গ্রহণ করুন এই ভিক্ষা করিলাম। জগতের প্রতি করুণাময় সেই দয়ালু ভগবান আমাকে বলিলেন 'এস ভিক্ষু'। ইহাই আমার দীক্ষা হইল"। একদা ভিক্ষু সুনীত বনে প্রবেশ করিয়া ধ্যানে মগ্ন ছিল। বুদ্ধ তাহাকে দেখিয়া স্মিতহাস্যে বলিয়াছিলেন "শুদ্ধ উদ্যমের দ্বারা, শুদ্ধ জীবনের দ্বারা, সংযম ও আত্মদমনের দ্বারা লোকে ব্রাহ্মণ হয়, ইহাই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণত্ব"। বুদ্ধের নিকট শীল বা চরিত্রই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল, তিনি বলিয়াছিলেন "চন্দন তগর উৎপল বা বার্ষিকী, এই সকল গন্ধদ্রব্যের মধ্যে শীলগন্ধই শ্রেষ্ঠ"।

বুদ্ধ অনেককেই কৃপা করিতেন কিন্তু নির্বোধদের সহিতে পারিতেন না। শিষ্যেরা নিবুদ্ধিতার কার্য করিলে তাঁহার দ্বারা কঠিনভাবে তিরস্কৃত হইত এবং তিনি নিবুদ্ধিতার বহুনিন্দা করিতেন যথা—"যদি শ্রেষ্ঠ বা সমান ব্যক্তিকে

সঙ্গীরূপে না পাওয়া যায় তবে দৃঢ়ভাবে একাকী চলাই উচিত ; মূর্খের সঙ্গ কখনও কর্তব্য নয়," এবং "হাতা যেমন সূপের আস্বাদ পায় না, সেইরূপ মূর্খব্যক্তি চিরজীবন পণ্ডিতের সঙ্গ করিলেও ধর্ম বুঝিতে পারে না"।

বুদ্ধের অনেক শত্রু ছিল। এ বিষয়ে প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন তাঁহার শত্রু আছে একথা সত্য, কিন্তু তিনি কাহারও সহিত শত্রুতা করেন না, অন্যেই তাঁহার সহিত শত্রুতা করে। তিনি বিবাদের জন্য নহে, পরন্তু যাহা সত্য মনে করেন তাহাই বলেন, কিন্তু লোকে ভুল বুঝিয়া তাঁহার প্রতি শত্রুতা করে।

ব্রাহ্মণ বাসিষ্ঠের সহিত তর্ক

শিষ্যেরা ব্যতীত বাহিরের অনেক লোকেরও সহিত বুদ্ধের আলাপ কথাবার্তা ও তর্কবিতর্ক হইত। সুত্তপিটকে এইরূপ অনেক আলোচনার বিবরণ আছে ; এগুলিতে প্রধানতঃ ধর্মের নানাদিক সম্বন্ধে বুদ্ধের মতামত প্রকাশিত হইয়াছে এবং প্রসঙ্গতঃ তাঁহার তর্করীতি ও আলোচনাপদ্ধতিও পরিস্ফুট হইয়াছে। বুদ্ধের আলোচনাপদ্ধতিতে একটা বৈশিষ্ট্য এই দেখিতে পাওয়া যায় যে তিনি বিরুদ্ধ বা ভিন্নমতাবলম্বীর সহিত আলোচনা করিবার সময়ে প্রথমে নিজের মতামত কিছু না বলিয়া অপরপক্ষকে প্রশ্ন করিতে থাকিতেন ও শেষে তাহার বিশ্বাস মত বা ধারণায় অনেক অসঙ্গতি ও ভ্রান্তি দেখাইয়া দিতেন। বিখ্যাত গ্রীক জ্ঞানী সোক্রাতেস্‌ও এই রীতি অবলম্বন করিতেন বলিয়া ইংরেজিতে ইহাকে সক্রেটিক (অথবা ডায়ালেক্‌টিক্) রীতি বলা হয়। বুদ্ধের তর্কগুলির মধ্যে একটির আমরা সংক্ষেপে উল্লেখ করিব। বুদ্ধ একদা ভ্রমণ করিতে করিতে কোশলের অন্তর্গত ও অচিরবতী-নদীতীরস্থ মনসাকট নামক ব্রাহ্মণগ্রামে আসিয়া একটি আমবাগানে বাস করিতেছিলেন। এই গ্রামের বাসিষ্ঠ ও ভারদ্বাজ নামক দুই ব্রাহ্মণ যুবক নদীতে স্নান সমাপন করিয়া চিন্তাকুল মনে নদীতীরে বেড়াইতেছিল। কোন্ মার্গ সত্য, কোন্ মার্গ মিথ্যা ইহা লইয়া উভয়ের আলোচনা হইতেছিল। বাসিষ্ঠ বলিল ব্রাহ্মণ পোক্‌করসাতি যেরূপ বলিয়াছেন সেইরূপ করিলেই ব্রহ্মাপ্রাপ্তি হয়, উহাই সহজ ও সরল পথ। ভারদ্বাজ বলিল ব্রাহ্মণ তারুক্‌খ যেরূপ বলিয়াছেন সেরূপ করিলেই ব্রহ্মাপ্রাপ্তি হয়,

উহাই সরল ও সহজ পথ। এইরূপে উভয়ে তর্ক করিতে লাগিল কিন্তু কেহই অপরকে স্বমতে আনিতে পারিল না। তখন তাহারা স্থির করিল বুদ্ধের নিকট গিয়া এ বিষয়ে প্রশ্ন করিবে কারণ বুদ্ধের খ্যাতি তাহাদের জানা ছিল। তাহারা বুদ্ধের নিকট গিয়া অভিবাদনাদি করিয়া তাহাদের বক্তব্য জানাইলে বুদ্ধ বলিলেন "বাসিষ্ঠ, তোমাদের দ্বন্দ্ব ও বিরোধ কি লইয়া" ?

"গৌতম, সত্য পথ কোন্‌টি ইহা লইয়াই আমাদের বিরোধ। বিভিন্ন ব্রাহ্মণেরা বিভিন্ন পথের শিক্ষা দেন, এগুলির সবেই কি মুক্তিলাভ হয়? গৌতম, যেমন গ্রামের নিকটে অনেক পথ থাকিলেও গ্রামের মধ্যে সব পথই একত্র মিলিত হয়, সেইরূপ বিভিন্ন ব্রাহ্মণদের উপদিষ্ট বিভিন্ন পথও একই প্রকার। ইহাদের সবেই কি মুক্তিলাভ হয় ?"

"বাসিষ্ঠ, তুমি কি বল যে সব পথই এক প্রকার ?"

"হাঁ গৌতম, আমি তাহাই বলি,"

"বাসিষ্ঠ, তুমি কি সত্যই মনে কর সব পথই ঠিক পথ ?"

"হাঁ গৌতম, আমি তাহাই মনে করি,"

"কিন্তু দেখ বাসিষ্ঠ, ত্রিবিদ্যাবিশারদ ব্রাহ্মণদের মধ্যে কি এমন একজনও আছেন যিনি ব্রহ্মাকে স্বচক্ষে দেখিয়াছেন ?"

"না গৌতম, সেইরূপ একজনও নাই বটে,"

"আচ্ছা বাসিষ্ঠ, তবে ঐ ব্রাহ্মণদের গুরুদের মধ্যে কি এমন একজনও আছেন যিনি ব্রহ্মাকে স্বচক্ষে দেখিয়াছেন ?"

"না গৌতম, সেইরূপ একজনও নাই বটে,"

"ঐ ব্রাহ্মণদের পুর্বপুরুষদের মধ্যে কি এমন কেহ একজনও আছেন যিনি ব্রহ্মাকে স্বচক্ষে দেখিয়াছেন ?"

"না গৌতম, সেইরূপ কেহ নাই বটে,"

"আচ্ছা বেশ বাসিষ্ঠ, ব্রাহ্মণেরা এখন যে সব মন্ত্র আবৃত্তি ও উচ্চারণ করেন, সেই সব মন্ত্রের প্রণেতা ব্রাহ্মণদের প্রাচীন ঋষিদের মধ্যে কি কেহ এরূপ বলিয়াছেন 'ব্রহ্মা কোথায় থাকেন, কোথা হইতে আসেন, কোথায় যান তাহা আমরা জানি, আমরা দেখিয়াছি' ?"

"না গৌতম, তাঁহাদের কেহ এরূপ বলেন নাই বটে,"

"বাসিষ্ঠ, তবে তুমি বলিতেছ যে ব্রাহ্মণদের বা ব্রাহ্মণদের গুরুদের বা গুরুদের শিষ্যদের, বা ব্রাহ্মণদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে কেহ ব্রহ্মাকে স্বচক্ষে দেখেন নাই. এবং এমন কি যে ঋষিদের প্রণীত মন্ত্রগুলি এখন ব্রাহ্মণেরা সযত্নে পুরুষানুক্রমে ঠিক একভাবে আবৃত্তি ও উচ্চারণ করিয়া আসিতেছেন, সেই ঋষিদের মধ্যেও কেহ ব্রহ্মা কে বা কেমন জানেন নাই বা দেখেন নাই। আচ্ছা বাসিষ্ঠ, তোমার কি মনে হয়? এরূপ কথা বলা কি ব্রাহ্মণদের পক্ষে মূর্খতা নহে?"

"হাঁ গৌতম, এরূপ অবস্থায় বলিতেই হয় ইহা মূর্খতা,"

"বাসিষ্ঠ, একসারি অন্ধলোক যেমন জড়াজড়ি করিয়া পরস্পরকে ধরিয়া থাকে এবং সাম্‌নের বা মধ্যের বা পিছনের কেহই দেখিতে পায় না, ব্রাহ্মণদের কথাও ঠিক সেইরূপ—হাস্তকর, শুধু কথামাত্র, রিক্ত ও তুচ্ছ। বাসিষ্ঠ, তোমার কি মনে হয়? যে চন্দ্রসূর্যের ব্রাহ্মণেরা উপাসনা করেন, অর্চনা করেন, স্তব করেন এবং উদয়াস্তের দিকে ফিরিয়া যুক্তহস্তে তাহাদের অনুগমন করেন, সেই চন্দ্রসূর্যকে কি ব্রাহ্মণেরা সাধারণ লোকের মত দেখিতে পান?"

"হাঁ গৌতম, নিশ্চয়ই দেখিতে পান,"

"তাঁহারা কি চন্দ্রসূর্য লাভের পথ দেখাইতে পারেন?"

"না গৌতম, নিশ্চয় পারেন না,"

"বাসিষ্ঠ, তাহা হইলে তুমি বলিতেছ যে তাঁহারা ইহা পারেন না অথচ তথাপি বলিয়া থাকেন যে পারেন—ইহা কি মূর্খতা নহে?

"হাঁ গৌতম, এরূপ অবস্থায় বলিতেই হয় ইহা মূর্খতা,"

"আচ্ছা বাসিষ্ঠ, কোনও লোক যদি বলে 'এই দেশের জনপদকল্যাণীকে (শ্রেষ্ঠা সুন্দরী) লাভ করিতে আমার ইচ্ছা হইয়াছে' কিন্তু প্রশ্ন করিলে সেই রমণীর নাম কি, গোত্র কি, সে দীর্ঘা না হ্রস্বা, গৌরাঙ্গী না শ্যামাঙ্গী, তাহার বাড়ী কোথায় ইত্যাদি কিছুই বলিতে পারে না, ঠিক সেইরূপ যে বস্তুর সম্বন্ধে তাঁহারা কিছুই জানেন না তাহা লাভ করিবার পথ বলিতে পারেন, এরূপ বলা কি ব্রাহ্মণদের পক্ষে মূর্খতা নহে?"

"হাঁ গৌতম, এরূপ অবস্থায় বলিতেই হয় ইহা মূর্খতা,"

"বাসিষ্ঠ, যদি কোনও লোক প্রাসাদে উঠিবার জন্য চৌমাথায় সিঁড়ি

তারপর বুদ্ধ বাসিষ্ঠ ও ভরদ্বাজকে তাঁহার ধর্ম বুঝাইলেন।

বুদ্ধ তর্কের দ্বারা অন্যের ভ্রান্ত মত খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিতেন বটে কিন্তু তাঁহার নিজের ধর্ম সম্বন্ধে তর্ক অথবা বিশ্বাসের উপর নির্ভর না করিয়া প্রত্যেককে স্ব স্ব অভিজ্ঞতা দ্বারা তাহার সত্যতা বিচার করিতে বলিতেন। এইজন্য সাধারণের কাছে তাঁহার ধর্ম 'এহি পস্সিক' আখ্যা পাইয়াছিল অর্থাৎ যে ধর্মে বলা হয় এহি পস্স (এহি পশ্য), অর্থাৎ 'এস, দেখ'। বুদ্ধ বহুবার শিষ্যদের বলিয়াছিলেন তাহারা যেন বাক্যশরণ না হইয়া যুক্তিশরণ হয়, কোনও ব্যক্তি বা শাস্ত্রের বচনে বিশ্বাস না করিয়া যেন যুক্তি ও বিচারের উপর নির্ভর করে। নিজের কথা সম্বন্ধেও তিনি বলিতেন যে, তিনি বলিতেছেন বলিয়াই যে অপরকে উহা গ্রহণ করিতে হইবে তাহা নহে, তাঁহার কথাও যেন লোকে যুক্তির কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করিয়া গ্রহণ করে।

[ধম্মপদ ও অট্ঠকথা ; অম্বট্ঠসুত্ত ; কূটদন্তসুত্ত ; তেবিজ্জসুত্ত ; অলগদ্দূপমসুত্ত ; সামঞ্ঞ-ফলসুত্ত ; থেরগাথা ; উদান ৫/৫ ; সুত্তনিপাত।]



শঙ্খপদ্ম—অজন্তা চিত্র

৬

শিষ্যকাহিনী

কপিলবাস্তু হইতে ফিরিয়া রাজা বিম্বিসারের অনুরোধে বুদ্ধ দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ, পর পর এই তিন বর্ষা রাজগৃহে যাপন করিয়াছিলেন। বর্ষা ব্যতীত অন্য সময়ে তিনি নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। নিম্নোল্লিখিত কয়েকটি ঘটনা বুদ্ধের প্রচারজীবনের প্রথম কয়েক বৎসরের মধ্যে ঘটিয়াছিল বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত আছে কিন্তু ঘটনাগুলি সত্যই যে এই সময়ের মধ্যে ঘটিয়াছিল তাহা নহে, কয়েকটি ঘটনা বোধহয় অনেক পরে ঘটিয়াছিল।

শ্রাবস্তীর সুদত্ত নামক এক মহাধনবান শ্রেষ্ঠী ব্যবসাকর্ম উপলক্ষ্যে প্রায়ই রাজগৃহে আসিয়া তাঁহার ভগ্নীপতির আলয়ে উঠিতেন। একবার সুদত্ত রাজগৃহে পৌঁছিয়া দেখিলেন তাঁহার ভগ্নীপতির গৃহে কেমন যেন একটা চাঞ্চল্যের ভাব। তিনি আসিলে ভগ্নীপতি পূর্বে যেমন সব কাজ ছাড়িয়া তাঁহার আদর-অভ্যর্থনা করিতেন, এবার তাহা না করিয়া কি যেন কাজে ব্যস্ত হইয়া চাকর-বাকরদের ডাকাডাকি ও ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছিলেন। পরে সুদত্ত ভগ্নীপতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন বাড়ীতে কি বিবাহ আছে, না মগধরাজ বিম্বিসারকে আহারে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে! ভগ্নীপতি বলিলেন তিনি সশিষ্য বুদ্ধকে আহারে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। সুদত্ত আশ্চর্য হইয়া বলিলেন "কি বলিলেন—বুদ্ধ? প্রকৃত বুদ্ধের দেখা পাওয়া বড় কঠিন!"

বুদ্ধ সশিষ্য শ্রেষ্ঠীভবনে নিমন্ত্রণরক্ষা করিতে আসিলে তাঁহার সহিত সুদত্তের পরিচয় হইল। বুদ্ধকে দেখিয়া ও তাঁহার সহিত আলাপে সুদত্ত নিশ্চয়ই প্রীত হইয়াছিলেন, কারণ পরদিন প্রত্যূষে তিনি একাকী বেণুবন-আরামে বুদ্ধের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। বুদ্ধ তখন পায়চারি করিতে করিতে ধ্যান করিতেছিলেন। সুদত্ত নমস্কার করিয়া বলিলেন "আশা করি ভগবানের সুনিদ্রা হইয়াছে।" বুদ্ধ বলিলেন "যাহার কামক্রোধ-পাপ দূর হইয়াছে, সকল বন্ধন ছিন্ন হইয়াছে, তৃষ্ণা দূর হইয়াছে এবং মনে শান্তি আছে, তাহার সর্বদাই সুনিদ্রা হয়।"

সুদত্ত বুদ্ধের সহিত আলাপ-আলোচনাদির পর তাঁহার গৃহী শিষ্য হইলেন। বহু অনাথব্যক্তিকে অন্নদান করিতেন বলিয়া বৌদ্ধশাস্ত্রে সুদত্তকে 'অনাথপিণ্ডদ' নাম দেওয়া হইয়াছে। আমরাও এখন হইতে তাঁহাকে এই নামে অভিহিত করিব। ইনি বুদ্ধের গৃহীশিষ্যদের মধ্যে সর্বপ্রধান ছিলেন। বহুদান ও সংঘের প্রতি ভক্তির জন্য বৌদ্ধশাস্ত্রে ইঁহার অশেষ যশ কীর্তিত হইয়াছে। ইঁহার সম্বন্ধে অনেক কাহিনীও আমরা পরে বলিব।

অনাথপিণ্ডদ একবার বুদ্ধকে শ্রাবস্তীতে আসিয়া এক বর্ষা যাপন করিতে অনুরোধ করিলে বুদ্ধ বলিলেন "হে গৃহপতি, তথাগতেরা নির্জন স্থান ভালবাসেন।" শ্রাবস্তী জনাকীর্ণ নগরী ছিল। অনাথপিণ্ডদ বুদ্ধের কথার অর্থ বুঝিলেন কিন্তু তখন কিছু বলিলেন না। রাজগৃহের কার্য শেষ করিয়া শ্রাবস্তীতে ফিরিবার সময়ে তিনি পথে সব স্থানে তাঁহার লোকদের বলিয়া গেলেন বুদ্ধের শ্রাবস্তীতে যাইবার সময়ে কোথাও যেন তাঁহার জন্য সুব্যবস্থার ত্রুটি না হয়। ধনী ছিলেন বলিয়া অনাথপিণ্ডদের বন্ধু ও অনুগত লোকের অভাব ছিল না এবং তাঁহার মুখের কথারও দাম ছিল।

শ্রাবস্তীতে ফিরিয়া বুদ্ধের বাসের উপযুক্ত স্থান অন্বেষণ করিতে করিতে জেত নামক রাজকুমারের একটি উদ্যান অনাথপিণ্ডদের মনোমত হইল। তিনি জেতের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া উদ্যানটি ক্রয় করিবার প্রস্তাব করিলে জেত বলিলেন একটির পার্শ্বে একটি স্বর্ণমুদ্রা বিছাইয়া উদ্যান ঢাকিয়া না দিলে তিনি উহা বিক্রয় করিবেন না। অনাথপিণ্ডদ ধনগৌরবে পরাস্ত হইবার লোক ছিলেন না, তিনি বলিলেন ঐ দামেই উদ্যান ক্রয় করিবেন, কিন্তু জেত বলিলেন ঐ দাম দিলেই যে তিনি উদ্যান বিক্রয় করিবেন এরূপ কোনও সর্ত হয় নাই। সর্ত হইয়াছে কিনা ইহা লইয়া উভয়ের বিতর্ক হইল, তাঁহারা নিষ্পত্তির জন্য মহামাত্রদের নিকটে গেলে মহামাত্ররা বলিলেন সর্ত হইয়াছে এবং অনাথপিণ্ড ঐ মূল্য দিলে জেত উদ্যান ছাড়িয়া দিতে বাধ্য। বর্ণিত আছে তখন অনাথপিণ্ডদের লোক গাড়ী গাড়ী স্বর্ণমুদ্রা আনিয়া পাশাপাশি বিছাইয়া উদ্যান ঢাকিয়া ফেলিতে লাগিল। যখন সবটা ঢাকিবার পরও একটু স্থান বাকি রহিল তখন অনাথপিণ্ডদ আরও স্বর্ণমুদ্রা আনিতে বলিলেন। ব্যাপার দেখিয়া জেত ভাবিলেন নিশ্চয় একটা বৃহৎ কাণ্ড হইতেছে, তিনিই বা কেন বাদ যান? তিনি বলিলেন ঐ জমিটুকু আর স্বর্ণমুদ্রায় ঢাকিবার প্রয়োজন

নাই, উহা তিনি নিজেই দান করিতেছেন এবং উহার উপর তিনি নিজব্যয়ে একটি ঘরও নির্মাণ করিয়া দেন। এই সমগ্র কাহিনীটির প্রকৃত অর্থ সম্ভবতঃ এই যে, অনাথপিণ্ডদ বহুমূল্যে উদ্যানটি ক্রয় করিয়াছিলেন। এই উদ্যানে অনাথ-পিণ্ডদ বুদ্ধ ও ভিক্ষুসংঘের বাসের জন্য প্রশস্ত ভবন নির্মাণ করেন। তাহাতে বাসকক্ষ সভাগৃহ রন্ধনশালা ভাণ্ডার স্নানকক্ষ পুষ্করিণী প্রভৃতি সবেরই ব্যবস্থা ছিল। বুদ্ধের সহিত অনাথপিণ্ডদের অন্তরঙ্গতা এবং এই আরামনির্মাণ প্রভৃতি অবশ্যই অল্প সময়ের মধ্যে হয় নাই, ইহাতে অনেকদিন লাগিয়াছিল। অনাথপিণ্ডদ এই আরাম বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে দান করেন এবং ইহা 'জেতবন আরাম' নামে বিখ্যাত হয়। এই আরামে বুদ্ধের বাসকক্ষটি বোধহয় সুগন্ধি চন্দনকাষ্ঠে নির্মিত হইয়াছিল কারণ ইহা গন্ধকুটি নামে পরিচিত হয়। অনাথপিণ্ডদ অবশ্যই জানিতেন বুদ্ধ পুষ্পাদির সুগন্ধ ভালবাসিতেন। ইহা হইতেই বোধহয় বুদ্ধের অন্য অনেক স্থানের বাসকক্ষকেও শাস্ত্রে গন্ধকুটি নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

বুদ্ধ শ্রাবস্তীতে আসিলে প্রায়ই জেতবনে বাস করিতেন এবং জীবনের শেষ পঁচিশ বর্ষা তিনি এখানেই যাপন করেন। ইহা হইতে অনুমান হয় বুদ্ধের যখন প্রায় পঞ্চান্ন বৎসর বয়স, তখন অনাথপিণ্ডদ জেতবন নির্মাণ করান। এই আরাম বুদ্ধের বহু উপদেশ কথোপকথন এবং সংঘজীবনের নানা ঘটনার সহিত এত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট যে পরবর্তী কালে শাস্ত্রে দেখা যায় বুদ্ধসম্বন্ধীয় বহুবিষয়ের বর্ণনার মুখবন্ধ দাঁড়াইয়াছিল 'সেই (অথবা এক) সময়ে ভগবান শ্রাবস্তীতে জেতবনে অনাথপিণ্ডদের আরামে বিহার করিতেছিলেন।' চীনাশ্রমণ ফা-হিয়েন ও হিউয়েন-ৎসাং ভারতভ্রমণের সময়ে জেতবনকে জীর্ণদশায় দেখিয়াছিলেন। বুদ্ধের মৃত্যুর পর জেতবনে যুগে যুগে বহু বিহারাদি নির্মিত হয়। এখানে ও রাজগৃহের গৃধ্রকূটে আসিয়া, এই দুই স্থানে বুদ্ধ যে সকল ধর্মোপদেশ দিয়াছিলেন তাহা তাঁহার স্বকর্ণে শুনিবার সৌভাগ্য হয় নাই বলিয়া ভক্ত ভিক্ষু ফা-হিয়েন মনোদুঃখে অশ্রুপাত করিয়াছিলেন।

সুমন নামক মালী রাজা বিম্বিসারের প্রাসাদে ফুল যোগাইত। একদিন সে রাজপ্রাসাদে ফুল লইয়া যাইবার সময়ে পথে ভিক্ষারত বুদ্ধকে দেখিয়া শ্রদ্ধালু হইয়া বিহারে গিয়া ফুলগুলি তাঁহাকে দিয়া আসিল। বুদ্ধ স্মিতহাস্যে

তাহার ভক্তি-উপহার গ্রহণ করিলেন। সুমন বাড়ি ফিরিয়া এই কথা স্ত্রীকে জানাইলে সে দিনের ফুলের দাম মিলিল না বলিয়া স্ত্রী তাহাকে গালি দিতে লাগিল এবং তাহাতেও ক্রোধশান্তি না হওয়ায় দৌড়িয়া রাজসভায় গিয়া বিবাহভঙ্গ প্রার্থনা করিল। বিম্বিসার ব্যাপার শুনিয়া তাহাকে সভা হইতে তাড়াইয়া দিয়া মালীকে ডাকাইয়া অর্থপুরস্কার দিয়াছিলেন।

রাজগৃহের প্রসিদ্ধ চিকিৎসক জীবক রাজা বিম্বিসার প্রভৃতির চিকিৎসা করিতেন। বুদ্ধ একবার উদরশূলে পীড়িত হইলে বিম্বিসারের আদেশে জীবক তাঁহার চিকিৎসা করেন। জীবক প্রথমে বুদ্ধকে মালিশের ঔষধ দেন কিন্তু তাহাতে ফল না হওয়ায় নীলপদ্মের পাঁপড়ির সহিত মৃদু বিরেচক সেবন করিতে দেন এবং তাহাতে বুদ্ধের উদরশূল নিবারিত হয়। জীবকের মত সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি বুদ্ধের ভক্ত ছিলেন বলিয়া তাঁহার সম্বন্ধে বৌদ্ধশাস্ত্রে অনেক কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। জীবকের জন্ম সম্বন্ধে এইরূপ কথিত আছে যে, রাজগৃহের এক শ্রেষ্ঠী ব্যবসা উপলক্ষ্যে বৈশালীতে যাইয়া বৈশালীর শোভা ও সমৃদ্ধিতে মুগ্ধ হইলেন, কিন্তু বৈশালীর সকল সম্পদের মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠীবরের সর্বাপেক্ষা মনে লাগিল তাহা গণিকা আম্রপালী। বোধহয় তাঁহার অনেক আমবাগান ছিল বলিয়া গণিকোত্তমার এই নাম হইয়াছিল। সে যুগে গণিকাগণ ঘৃণ্যা বিবেচিত হইতেন না, ভদ্রসমাজেও ইঁহাদের স্থান ছিল। ইঁহারা সাধারণ পণ্যস্ত্রী হইতে বিভিন্ন হইতেন। পরমাসুন্দরী কন্যাকে নৃত্য-গীতাদি কলাবিদ্যা শিক্ষা দিয়া এই বৃত্তিতে নিযুক্ত করা হইত। প্রাচীন গ্রীসে এই শ্রেণীয়াদের 'হেতাইরা' বলা হইত—গণ্যমান্য ব্যক্তিরা ইঁহাদের সাহচর্য করিতেন, সোক্রাতেসের মত জ্ঞানী ব্যক্তিও ইঁহাদের সহিত আলাপ আলোচনা করিতেন।

রাজগৃহের শ্রেষ্ঠী গৃহে ফিরিয়া রাজাকে বলিলেন আম্রপালীর জন্যই বৈশালীর অত জাঁক, তাঁহারাও রাজগৃহে ঐরূপ একটি গণিকা প্রতিষ্ঠা করিবেন। রাজা সম্মত হইলে উপযুক্তা পাত্রী অন্বেষণে শালবতীনাম্নী এক তরুণী মনোনীতা হইল। যথাযোগ্য শিক্ষাদির পর শালবতী বৃত্তি আরম্ভ করিল এবং কিছুদিন পরে তাহার সন্তানসম্ভাবনা হইলে গর্ভবতী গণিকার আদর নাই জানিয়া শালবতী দ্বারপালকে "শালবতী অসুস্থা, কেহ প্রবেশ করিতে পারিবে না" এই কথা বলিয়া লোক বিদায় করিতে বলিল। যথাকালে শালবতী

একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিলে তাহার আজ্ঞায় দাসী সদ্যোজাত শিশুকে কুলায় করিয়া পথপার্শ্বের আবর্জনাস্তূপে রাখিয়া আসিল। বিম্বিসারপুত্র রাজকুমার অভয় সেই পথ দিয়া যাইবার সময়ে কাকবেষ্টিত শিশুকে দেখিয়া লোককে জিজ্ঞাসা করিলেন শিশু জীবিত আছে কিনা এবং শিশু জীবিত শুনিয়া তিনি শিশুকে স্বগৃহে আনিয়া লালনপালন করিলেন। তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে শিশু "জীবিত আছে", লোকে এই কথা বলায় কুমার অভয় শিশুর নাম 'জীবক' রাখিলেন। অভয় শালবতীর নিকট গতায়াত করিতেন বলিয়া বর্ণিত আছে অতএব জীবক তাঁহারই পুত্র হওয়া সম্ভব এবং বোধহয় এইজন্যই তিনি শিশুর লালনপালনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। জীবক 'কুমারভৃত্য' নামেও পরিচিত ছিলেন। কুমার অভয়কর্তৃক পালিত হওয়ায় তাঁহার এই নাম হয়, এরূপ বর্ণিত আছে। আধুনিক পণ্ডিতদের কেহ বলেন জীবক বোধহয় কুমারতন্ত্র বা শিশুচিকিৎসায় বিশেষজ্ঞতাবশতঃ এই নাম পাইয়াছিলেন, কিন্তু জীবকের যে সকল বহু চিকিৎসাকাহিনী বর্ণিত আছে তাহার মধ্যে একটিও শিশুবিষয়ক নহে।

তিব্বতী গ্রন্থে কিন্তু জীবকের জন্মবৃত্তান্ত এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, বিম্বিসার স্থূলদেহ কামুক ব্যক্তি ছিলেন এবং রাজপথে বাহির হইলে উভয় পার্শ্বের গৃহবাতায়নে সম্মিলিতা নারীগণের মধ্যে কেহ সুন্দরী আছে কিনা সতৃষ্ণনয়নে লক্ষ্য করিতেন। একবার এক প্রবাসগত শ্রেষ্ঠীর সুন্দরী পত্নীকে বাতায়নে দেখিয়া বিম্বিসার গোপনে শ্রেষ্ঠীপত্নীর সহিত মিলিত হন এবং শ্রেষ্ঠী প্রত্যাগত হইলে তাহাকে পুনরায় কর্মচ্ছলে বিদেশে পাঠাইয়া দেন। বিম্বিসারের সহিত এই শ্রেষ্ঠীপত্নীর গোপন মিলনের ফলে নাকি জীবকের জন্ম হয়। এ ঘটনা সত্য হইলে ইহা বিম্বিসারের প্রথমযৌবনে ঘটা সম্ভব, অথবা বিম্বিসারের অপর কোনও গোপন প্রণয়ের ফলে অন্য কোনও বালকের জন্ম হয় এবং সে কাহিনী পরে জীবকের নামে প্রচলিত হয়।

যাহা হউক, জীবক বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া যখন বুঝিলেন তাঁহার মাতা-পিতা নাই তখন তিনি নিজজীবিকা-উপার্জন শিক্ষায় উৎসুক হইলেন। গোপনে কুমার অভয়ের গৃহ ত্যাগ করিয়া তিনি তক্ষশিলায় গিয়া খ্যাতনামা অধ্যাপকের অধীনে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। তক্ষশিলা সেযুগে বিখ্যাত বিদ্যাকেন্দ্র ছিল। "সাত" বৎসর শিক্ষালাভের

পর জীবকের মনে হইল এই অপার শাস্ত্রে কবে তিনি দক্ষতা লাভ করিতে পারিবেন! গুরুর নিকট একথা জানাইলে গুরু তাঁহাকে একখানি কোদালি দিয়া বলিলেন "তক্ষশিলার বাহিরে এক যোজন পরিধির মধ্যে খুঁজিয়া দেখ, ভেষজ-গুণ নাই এমন কোনও ওষধি পাইলে লইয়া আসিও"। জীবক কোদালি লইয়া বহুভ্রমণ করিয়াও ভেষজগুণহীন কোনও ওষধি পাইলেন না, অর্থাৎ তিনি প্রত্যেকটি গাছগাছড়ারই গুণাগুণ জানিতেন। গুরুকে একথা জানাইলে গুরু বলিলেন "জীবক, তোমার শিক্ষা সমাপ্ত হইয়াছে, ইহাতে তুমি জীবিকা উপার্জন করিতে পারিবে।" জীবককে পাথেয়স্বরূপে কিছু অর্থ দিয়া গুরু তাঁহাকে স্বগৃহে ফিরিতে বলিলেন।

গৃহে ফিরিবার পথে সাকেত নগরে আসিয়া গুরুপ্রদত্ত সামান্য অর্থ ফুরাইয়া গেলে এক শ্রেষ্ঠীপত্নীর অসুস্থতার কথা শুনিয়া কিছু অর্থ উপার্জনের আশায় জীবক শ্রেষ্ঠীপত্নীর গৃহে গেলেন। তাঁহার তরুণ বয়স দেখিয়া শ্রেষ্ঠী-পত্নী তাঁহার বিদ্যাবত্তায় সন্দিহান হইয়া প্রথমে তাঁহার চিকিৎসায় সম্মত হইলেন না কিন্তু জীবক বলিলেন তিনি প্রথমে কিছুই চাহেন না, রোগ সারিলে শ্রেষ্ঠীপত্নী তাঁহাকে যাহা ইচ্ছা দিতে পারেন। রোগিণী ইহাতে সম্মত হইলে জীবক রোগ পরীক্ষা করিয়া ঘৃত আনাইয়া ঔষধ মিশাইলেন এবং সেই ঘৃত রোগিণীর নাসাপথে প্রবেশ করাইয়া মুখপথে বাহির করিলেন। রোগিণী দাসিকে ডাকিয়া সেই মুখত্যক্ত ঘৃত বস্ত্রখণ্ড দ্বারা পাত্রে উঠাইয়া রাখিতে বলিলেন। জীবক ভাবিলেন "এ নারী দেখিতেছি বড়ই কৃপণ! যে ঘৃত ফেলিয়া দেওয়া উচিত তাহাও তুলিয়া রাখিতেছে! আমি মূল্যবান ঔষধ দিলাম, এখন এ না জানি আমাকে কি দিবে!" জীবকের মনোভাব বুঝিয়া শ্রেষ্ঠীপত্নী বলিলেন "আমাদের মত গৃহস্থ সঞ্চয়ের অর্থ জানে; এই ঘৃত পরে দাসদাসীরা পায়ে মাখিতে পারিবে বা প্রদীপে জ্বালান যাইবে। ভয় নাই বৈদ্য, তোমার প্রাপ্য তুমি পাইবে।" রোগমুক্ত হইয়া শ্রেষ্ঠীপত্নী জীবককে আশানুরূপ অর্থ দিয়াছিলেন। রাজগৃহে ফিরিয়া জীবক তাঁহার ভরণপোষণের জন্য যে অর্থ ব্যয় হইয়াছিল তাহা কুমার অভয়কে প্রত্যর্পণ করিতে চাহিলে অভয় তাহা গ্রহণ না করিয়া বলিলেন তিনি শুধু ইহাই চাহেন যে জীবক যেন তাঁহার গৃহ ব্যতীত অন্য কোথাও বাস না করেন। তিনি রাজপুত্র, তাঁহার গৃহে থাকিলে জীবকের ব্যবসায়ে সুবিধা হইবে, বোধহয়

এই উদ্দেশ্যেই অভয় এই প্রস্তাব করিয়াছিলেন। শীঘ্রই সুযোগও উপস্থিত হইল।

রাজা বিম্বিসার ভগন্দর রোগে ভুগিতেছিলেন। তাঁহার পরিধেয়বস্ত্র রক্তলিপ্ত দেখিয়া রাণীরা পরিহাস করিলেন "....এইবার রাজা সন্তানপ্রসব করিবেন!" বিম্বিসার ইহাতে লজ্জা পাইলেন। কুমার অভয় তখন জীবককে বিম্বিসারের চিকিৎসাভার দিলে জীবকের চিকিৎসায় রোগমুক্ত হইয়া বিম্বিসার জীবককে রাজচিকিৎসক নিযুক্ত করিলেন। ক্রমে জীবকের খ্যাতি ও প্রসার বাড়িতে লাগিল, বড় বড় লোকে তাঁহাকে ডাকিতে লাগিলেন। জীবকের ব্যবসাবুদ্ধি প্রখর ছিল, তিনি ধনীদের নিকট হইতে নির্দয়ভাবে অর্থ আদায় করিতেন। বুদ্ধের প্রতি ভক্তিবশতঃ এবং বিম্বিসারের আজ্ঞায়ও তিনি বিনামূল্যে বুদ্ধশিষ্য ভিক্ষুগণের চিকিৎসা করিতেন কিন্তু বেশি দয়ামায়া দেখাইবার পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। একবার নগরে মহামারী আরম্ভ হইলে দলে দলে লোক জীবকের পায়ে ধরিয়া চিকিৎসা প্রার্থনা করিলে "আমি মগধরাজ বিম্বিসারের ও তাঁহার অন্তঃপুরিকাদের চিকিৎসা করি, বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘের চিকিৎসা করি, তোমাদের চিকিৎসা করার সময় আমার নাই" এই কথা বলিয়া জীবক সব লোককে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন।

দূরদেশের রাজারাও জীবকের চিকিৎসা গ্রহণ করিতেন। অবন্তীরাজ অতি ক্রোধী 'চণ্ড' প্রদ্যোত একবার পীড়িত হইলে বিম্বিসারকর্তৃক প্রদ্যোতের চিকিৎসায় প্রেরিত হইয়া জীবক ঔষধসংযুক্ত ঘৃত ব্যবস্থা করিলেন কিন্তু প্রদ্যোত কিছুতেই ঘৃতসেবনে সম্মত হইলেন না। জীবক জানিতেন সেই ঘৃত সেবন না করিলে রোগও কিছুতেই সারিবে না, তাই তিনি স্থির করিলেন ঘৃতময় ঔষধ, বর্ণ আকৃতি গন্ধ ও আস্বাদে ঠিক পাচনের মত প্রস্তুত করিয়া পাচন বলিয়া প্রদ্যোতকে খাওয়াইবেন, কিন্তু ঔষধ উদরস্থ হইয়া ক্রিয়ারম্ভ হইলেই বমন হইতে থাকিবে এবং তখন উহা ঘৃতময় বুঝিতে পারিয়া ক্রোধী প্রদ্যোত হয়তো তাঁহার প্রাণসংহার করিতে পারেন, এই ভাবিয়া জীবক প্রদ্যোতকে বলিলেন "আমরা বৈদ্য, ওষধি অন্বেষণে সর্বদা আমাদের বনজঙ্গলে যাইতে হয়, আপনি আজ্ঞা দিন যে আমি যখন ইচ্ছা আপনার অশ্বশালা হইতে অশ্ব লইয়া যে কোনও সময়ে নগরের যে

কোনও দ্বার দিয়া বাহিরে যাতায়াত করিতে পারিব"। প্রদ্যোত ইহাতে সম্মত হইলেন। সে যুগের নগরগুলি প্রাকারবেষ্টিত হইত এবং সশস্ত্র-প্রহরীদলরক্ষিত নগরদ্বারগুলি দ্বারা নির্দিষ্ট সময় ব্যতীত কেহ যাতায়াত করিতে পারিত না। জীবক কয়েকদিন লোক দেখাইয়া রাজার হাতি ঘোড়া লইয়া সময়ে অসময়ে যাতায়াত করিলেন এবং অবশেষে একদিন প্রদ্যোতকে পাচনরূপী ঘৃত সেবন করাইয়া বেগবান অশ্বে তৎক্ষণাৎ উজ্জয়িনী ত্যাগ করিয়া রাজগৃহ অভিমুখে ধাবিত হইলেন। ইতিমধ্যে ঔষধের ক্রিয়া আরম্ভ হওয়ায় জীবক তাঁহাকে ছলনা করিয়া ঘৃত সেবন করাইয়াছেন বুঝিতে পারিয়া প্রদ্যোত ক্রোধ চণ্ডমূর্তি ধারণ করিয়া জীবককে ধরিয়া তাঁহার নিকট আনিতে বলিলেন এবং জীবক পলাইয়াছেন শুনিয়া তাঁহার পশ্চাদ্ধাবনে অশ্বারোহী সেনা পাঠাইলেন। জীবক রাজগৃহে পৌঁছিয়া বিম্বিসারকে সকল কথা জানাইলে বিম্বিসার বলিলেন জীবক পলাইয়া সুবুদ্ধির কাজই করিয়াছেন। রাজারা পরস্পরের প্রকৃতি ভালই জানেন!

পরে প্রদ্যোত রোগমুক্ত হইয়া পুরস্কারের জন্য জীবককে আনিতে দূত পাঠাইলেন কিন্তু জীবক কিছুতেই গেলেন না, বলিয়া পাঠাইলেন যে প্রদ্যোত যেন তাঁহার আরোগ্যলাভের কথা বিস্মৃত না হন। প্রদ্যোত তখন একটি অতিমহার্ঘ বস্ত্র উপহারস্বরূপে জীবককে পাঠাইলেন। জীবক সেই বস্ত্র লইয়া বুদ্ধের সমীপে গিয়া বলিলেন "ভদন্ত, আমি আপনার নিকট একটি বর প্রার্থনা করি";

"জীবক, তথাগতেরা তো বরদানের অতীত!"

বোধহয় বুদ্ধ রহস্যচ্ছলে এ কথা বলিয়াছিলেন, যদিও শাস্ত্রে ইহা অতি গম্ভীরভাবে বলা হইয়াছে। জীবক বলিলেন "ভদন্ত, আমি যাহা প্রার্থনা করিতেছি তাহাতে কোনও দোষ নাই";

"বল, জীবক,"

"ভদন্ত, আপনি ও ভিক্ষুসংঘ পথের বস্ত্রখণ্ডে চীবর প্রস্তুত করেন। রাজা প্রদ্যোত আমাকে এই মহামূল্য বস্ত্র পাঠাইয়াছেন, ইহার সমতুল বস্ত্র আর হয় না। ভগবান আমার নিকট হইতে এই বস্ত্র গ্রহণ করুন এবং ভিক্ষুসংঘকে গৃহস্থদের প্রদত্ত চীবর গ্রহণ করিতেও অনুমতি দান করুন।"

বুদ্ধ জীবকের দান গ্রহণ করিলেন এবং শিষ্যদের বলিলেন যাহার ইচ্ছা

পূর্বের মত পথ ও শ্মশান হইতে বস্ত্রখণ্ড সংগ্রহ করিয়া চীবর প্রস্তুত করিতে পারিবে, যাহার ইচ্ছা গৃহস্থদের প্রদত্ত নূতন বস্ত্রে প্রস্তুত চীবর ব্যবহার করিতে পারিবে। টীকাকার বুদ্ধঘোষ বলিয়াছেন জীবকের এই বস্ত্রদান বোধিলাভের বিশ বৎসর পরে ঘটিয়াছিল, ইতিমধ্যে আর কেহ বুদ্ধকে বস্ত্রদান করে নাই। ইহা ভাবিলে আশ্চর্য বোধ হয় যে যাঁহার স্মৃতিপূজায় পরে লোকে অকাতরে বিপুল অর্থ দান করিয়াছে, তিনি জীবিত থাকিতে দীর্ঘ বিশ বৎসর তাঁহাকে একখণ্ড বস্ত্রদানের কথা কাহারও মনে হয় নাই। জীবক ভিক্ষুসংঘকে রাজগৃহ নগরের বাহিরে অবস্থিত বাসগৃহাদি-সমন্বিত তাঁহার একটি আমবাগানও দান করিয়াছিলেন, এই বাগানের নাম জীবকাম্র-বন বা জীবকারাম ছিল।

রাজগৃহের উগ্রসেন নামক এক শ্রেষ্ঠীপুত্র বাজিকরের খেলা দেখিতে গিয়াছিল। খেলায় একটি তরুণী দড়ির উপর হাঁটা দেখাইত, উগ্রসেন তাহার প্রতি প্রণয়াসক্ত হইয়া মাতাপিতার নিবারণ না মানিয়া তরুণীকে বিবাহ করিয়া বাজিকরের দলে যোগ দিল। কিছুদিন পরে সে সুদক্ষ হইয়া খেলা দেখাইতেছে এমন সময়ে বুদ্ধ সেই পথ দিয়া যাইবার সময়ে প্রথমে মৌদ্‌গল্যায়নকে পাঠাইয়া এবং শেষে নিজে গিয়া উগ্রসেনের সহিত আলাপ করিলেন। উগ্রসেনের সহিত বোধহয় বুদ্ধের পূর্বপরিচয় ছিল, নতুবা তাঁহার হঠাৎ বাজিকর-সম্ভাষণের কারণ বুঝা যায় না। সস্ত্রীক উগ্রসেন বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল।

বুদ্ধ বৈশালীতে গেলে প্রায়ই 'মহাবন' নামক একটি শালবনে থাকিতেন। এখানে বোধহয় পরে কুটিরাদি নির্মিত হয় এবং বুদ্ধের বাসকক্ষকে 'কুটাগার-শালা' নাম দেওয়া হয়। একবার বৈশালীতে মড়ক লাগে কিন্তু বুদ্ধ সেখানে পৌছিবার পূর্বেই বৃষ্টি হইয়া মড়ক বন্ধ হয়। বর্ণিত আছে মড়ক শান্ত করিবার জন্যই বৈশালীর লোকে বুদ্ধকে রাজগৃহ হইতে বৈশালীতে আমন্ত্রণ করিয়াছিল এবং বৃষ্টির ফলে মড়ক বন্ধ হওয়া তাঁহারই আগমনজনিত মনে করিয়াছিল। বিম্বিসার নাকি বুদ্ধের বৈশালীযাত্রার সময়ে তাঁহাকে গঙ্গাতীর পর্যন্ত পৌছাইয়া দিয়াছিলেন এবং গঙ্গার অপরতীরে বৈশালীর লিচ্ছবিগণ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়াছিল। বৈশালীতে বুদ্ধ পঞ্চম বর্ষা যাপন করিয়া-ছিলেন।

একবার যখন বুদ্ধ বৈশালীর মহাবনে বাস করিতেছিলেন তখন শস্যক্ষেত্রে সেচনের জন্য রোহিনী নদীর জল লইয়া কপিলবাস্তু ও কোলিয় নগরের মধ্যে যুদ্ধের উদ্যোগ হয়। যুদ্ধে যত যোদ্ধার প্রাণনাশ হইবে তাহার তুলনায় জলের দাম ও মাটির দাম কত অকিঞ্চিৎকর, ইহা বুঝাইয়া বুদ্ধ উভয়পক্ষকে যুদ্ধে নিরস্ত করিয়াছিলেন। ইহাতে দেখা যায় সন্ন্যাসী বলিয়া তিনি যে সাংসারিক কোনও বিষয়ের মধ্যে থাকিতেন না, তাহা নহে। বৈশালীতে থাকিবার সময়ে পিতা শুদ্ধোদন অন্তিমশয্যায় শয়িত শুনিয়া বুদ্ধ দ্রুত কপিলবাস্তুতে আসেন ও মৃত্যুশয্যায় পিতাকে সংসারের অনিত্যতা সম্বন্ধে উপদেশ দেন। শুদ্ধোদনের মৃত্যুর পর তিনি পিতার মৃতদেহ দেখাইয়া শিষ্যগণকে সংসারের পরিবর্তনশীলতা ও উৎপন্ন বস্তুমাত্রেরই বিনাশশীলতা বুঝাইলেন—মৃত্যু সম্পর্কে তিনি প্রায়ই এরূপ করিতেন। পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করিয়া তিনি শ্রাদ্ধকালে ধর্মোপদেশ দেন। মহাপ্রজাবতী গৌতমী বোধহয় এই সময়ে সন্ন্যাসগ্রহণ করেন। শাস্ত্রে আছে বুদ্ধ মহাপ্রজাবতীর প্রব্রজ্যাগ্রহণ-প্রস্তাবে প্রথমে স্বীকৃত হন নাই, কিন্তু ইহা বোধহয় ঠিক নহে। মহাপ্রজাবতী সম্ভবতঃ অন্য নারীগণেরও প্রব্রজ্যাগ্রহণের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। ইহাতে বুদ্ধ উত্তর দেন "না গৌতমী, স্ত্রীলোকেরা গৃহত্যাগ করিয়া তথাগতপ্রবেদিত ধর্মবিনয়ে অনগার-প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে, এ ইচ্ছা তোমার যেন না হয়"। ইহাতে মনে হয় বুদ্ধের আপত্তি ছিল স্ত্রীলোকসাধারণের প্রব্রজ্যাগ্রহণে, কিন্তু মহাপ্রজাবতী সম্বন্ধে নহে। পরে যখন মহাপ্রজাবতী শাক্যনারীগণকে সঙ্গে লইয়া বৈশালীতে বুদ্ধের সমীপে আসিয়া নারীগণের সংঘপ্রবেশ পুনরায় প্রার্থনা করেন তখন বর্ণনায় দেখা যায় তিনি ভিক্ষুণীবেশা; সুতরাং তাহার পূর্বেই, সম্ভবতঃ শুদ্ধোদনের মৃত্যুর পরই মহাপ্রজাবতী প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সংঘে নারীর প্রবেশ

নারীগণের সংঘপ্রবেশের বৃত্তান্ত শাস্ত্রে এইভাবে বর্ণিত আছে—একবার বুদ্ধ যখন বৈশালীতে মহাবনের কূটাগারশালায় বাস করিতেছিলেন তখন একদিন 'চীবরপরিহিতা ছিন্নকেশা' মহাপ্রজাবতী বহু শাক্যনারীগণকে সঙ্গে লইয়া পদব্রজে কপিলবাস্তু হইতে বৈশালীতে আসিয়া কূটাগারশালার দ্বারকোষ্ঠে উপস্থিত হইলেন। সেখানে দাঁড়াইয়া গৌতমী দুঃখিতমনে অশ্রু

বিসর্জন করিতে লাগিলেন। আনন্দ তাঁহাদেব সেইভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া ব্যাপার জিজ্ঞাসা করায় মহাপ্রজাবতী বলিলেন তাঁহারা সংঘে প্রবেশ করিবার অনুমতির জন্য এত পথশ্রম স্বীকার করিয়া কপিলবাস্তু হইতে হাঁটিয়া আসিয়াছেন। বাস্তবিকই তাঁহাদের পথশ্রমে বড কষ্ট হইয়াছিল। মহাপ্রজাবতীর পা ফুলিয়া গিয়াছিল, সর্বাঙ্গ ধূলিধূসরিত হইয়াছিল। অভিজাতা শাক্যনারীগণ এরূপ শ্রমে অভ্যস্ত ছিলেন না। ইহা দেখিয়া এবং মহাপ্রজাবতীর কথা শুনিয়া আনন্দ দৌড়িয়া ভিতবে গিয়া বুদ্ধকে সংবাদ দিলেন এবং তাঁহাকে মহাপ্রজাবতীর ইচ্ছা পূর্ণ করিতে অনুরোধ করিলেন। বুদ্ধ আনন্দকে একথা ছাড়িতে বলিলেন। আনন্দ কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন "ভদন্ত, সংসার ত্যাগ করিয়া তথাগতের ধর্ম ও নিয়ম পালন করিলে স্ত্রীলোকেরা কি ধর্মপালনের সমুদায় ফল ভোগের, এমন কি অর্হত্ত্ব পর্যন্ত লাভ করিবার যোগ্য হয় না ?"

"হাঁ আনন্দ, হয়,"

"ভদন্ত, যদি তাহারা সম্পূর্ণ ফল লাভের যোগ্য হয় তবে যিনি ভগবানের অনেক উপকার করিয়াছেন, যিনি মাতৃস্বসা ও পালিকারূপে ভগবানকে লালনপালন ও দুগ্ধপান করাইয়াছেন, যিনি জননীর মৃত্যুর পর ভগবানকে স্তন্যদান করিয়াছেন, সেই মহাপ্রজাবতী যখন বলিতেছেন তখন স্ত্রীলোকদের সংঘে প্রবেশ করিতে দেওয়া উচিত",

"আনন্দ, মহাপ্রজাবতী যদি এই আটটি 'প্রধান ধর্ম' পালন করিতে পারেন তবে ইহা তাঁহার দীক্ষাতুল্য হইবে—১. ভিক্ষুণীরা এমন কি শতবর্ষ ধর্মপালন করিবার পরও ভিক্ষুদিগকে—যদি ভিক্ষুরা সদ্যদীক্ষিতও হয় তথাপি—দেখিলে অভিবাদন করিবে, উঠিয়া দাঁড়াইবে, অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া থাকিবে ও সর্বপ্রকাব সম্মান দেখাইবে; এই নিযম পালন কবিতে হইবে, মানিতে হইবে, পূজা করিতে হইবে, সম্ভ্রম করিতে হইবে এবং জীবনে কখনও ব্যতিক্রম করিতে পারা যাইবে না। ২. যেখানে কোনও ভিক্ষু নাই এমন স্থানে কোনও ভিক্ষুণী বর্ষাবাস করিতে পারিবে না; এই নিয়ম পালন করিতে হইবে·········এবং জীবনে কখনও ব্যতিক্রম করিতে পারা যাইবে না। ৩. প্রতিপক্ষে ভিক্ষুণীদিগকে ভিক্ষুসংঘের নিকট আসিয়া ধর্মোপদেশ গ্রহণ করিতে হইবে; এই নিয়ম পালন করিতে হইবে, ইত্যাদি। ৪. বর্ষাবাসের

পর ভিক্ষুণীদিগকে ভিক্ষুণীসংঘ ও ভিক্ষুসংঘ উভয়েরই নিকট বর্ষাবাস-কাল সম্বন্ধীয় সমুদায় বৃত্তান্ত স্বীকার করিতে হইবে; এই নিয়ম ইত্যাদি। ৫. কোনও ভিক্ষুণী গুরুদোষে অপরাধী হইলে উভয় সংঘেরই নিকট শাস্তি পাইবে; এই নিয়ম ইত্যাদি। ৬. দুই বৎসর শিক্ষাধীন থাকিবার পর ভিক্ষুণীদিগকে উভয় সংঘেরই নিকট উপসম্পদার অনুমতি প্রার্থনা করিতে হইবে; এই নিয়ম ইত্যাদি। ৭. ভিক্ষুণীরা কোনও কারণেই ভিক্ষুদের প্রতি আক্রোশ বা কটুভাষা প্রকাশ করিতে পারিবে না; এই নিয়ম ইত্যাদি। ৮. এখন হইতে ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুদের শাসনবচন বলিতে পারিবে না, ভিক্ষুরা ভিক্ষুণীদের শাসনবচন বলিতে পারিবে; এই নিয়ম ইত্যাদি। আনন্দ, যদি মহাপ্রজাবতী এই নিয়মগুলি পালন করিতে পারেন তবে তাঁহাকে দীক্ষা দেওয়া যাইতে পারে।"

আনন্দ বাহিরে গিয়া মহাপ্রজাবতীকে একথা জানাইলে গৌতমী বলিলেন "আনন্দ, মণ্ডনপ্রিয় যুবক বা যুবতী যেমন স্নানের পর দুই হস্তে তুলিয়া পদ্ম বা অন্য ফুলের মালা মস্তকে ধারণ করে, সেইরূপ আমিও এই নিয়মগুলি শিরোধার্য করিয়া লইলাম এবং জীবনে ইহার ব্যতিক্রম করিব না।" আনন্দ সোৎসাহে আসিয়া বুদ্ধকে বলিলেন "ভদন্ত, মহাপ্রজাবতী আটটি নিয়মই পালনে স্বীকৃতা হইয়াছেন, ভগবানের মাতৃস্বসার উপসম্পদা (অর্থাৎ পূর্ণদীক্ষা) লাভ হইয়াছে!" আনন্দের এই কথায় হৃষ্ট না হইয়া বুদ্ধ অতি নিদারুণ উত্তর দিলেন—"আনন্দ, স্ত্রীলোকেরা যদি সংসার ত্যাগ করিয়া ভিক্ষুণী হইয়া তথাগতের ধর্ম ও নিয়ম পালনের অনুমতি না পাইত তবে ধর্ম চিরস্থিতিক হইত, সদ্ধর্ম সহস্রবর্ষ স্থায়ী হইত। কিন্তু আনন্দ, এখন তাহারা যখন এই অনুমতি পাইল তখন সদ্ধর্ম ততদিন স্থায়ী হইবে না, মাত্র পাঁচশত বৎসর স্থায়ী হইবে। আনন্দ, যে গৃহে বহুস্ত্রীলোক কিন্তু অল্পপুরুষ বাস করে, সে গৃহ যেমন চোর ও দস্যুরা সহজেই ধ্বংস করিতে পারে, সেরূপ যে ধর্মনিয়মে স্ত্রীলোককে সংসার ছাড়িয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে দেওয়া হয় তাহাও চিরস্থিতিক হইতে পারে না; যেমন উত্তম ধান্যক্ষেত্রে সেতট্ঠিকা রোগ লাগিলে সে ক্ষেত্র চিরস্থায়ী হয় না, যেমন উত্তম ইক্ষুক্ষেত্রে সঞ্জেট্ঠিকা রোগ লাগিলে তাহা চিরস্থায়ী হয় না, সেইরূপ যে ধর্মনিয়মে স্ত্রীলোকদিগকে প্রব্রজ্যাগ্রহণ করিতে দেওয়া হয়

তাহাও চিরস্থায়ী হয় না। আনন্দ, আর যেমন লোকে পূর্ব হইতে তড়াগে বাঁধ দেয়, যাহাতে তাহার উপরে জল উঠিতে না পারে সেইরূপ আমিও পূর্ব হইতে ভিক্ষুণীদের জন্য এই নিয়মগুলি বাঁধিয়া দিলাম যাহা তাহারা চিরজীবনেও যেন ব্যতিক্রম না করে।"

এই শাস্ত্রবিবরণ আধুনিক পণ্ডিতগণ সম্পূর্ণ গ্রহণ করেন না। শাস্ত্রে বিষয়টি এইভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে যে বুদ্ধ প্রথমে কোনও নারীরই, এমন কি মহাপ্রজাবতীরও, সংঘপ্রবেশে সম্মত হন নাই এবং অবশেষে মহাপ্রজাবতীপ্রমুখা শাক্যনারীগণ সদলে বৈশালীতে উপস্থিত হইলে আনন্দের নির্বন্ধাতিশয্যে বুদ্ধ ইহাতে স্বীকৃত হন। এ বিবরণ যে সত্য নহে তাহাব একটি প্রমাণ আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি—মহাপ্রজাবতী যে পূর্বেই সংঘে প্রবেশ করিয়াছিলেন তাহা ইহাতেই বুঝা যায় যে, শাক্যনারীগণকে সঙ্গে লইয়া বৈশালীতে আসিবার সময়ে তিনি 'চীবরপরিহিতা ও ছিন্নকেশা' ছিলেন, ইহা পূর্বেই প্রব্রজ্যাগ্রহণ না হইয়া থাকিলে সম্ভব হইত না। ইহা অতি অভিনব ঘটনাও ছিল না কারণ সেযুগে নিগ্রন্থপ্রভৃতি অন্যান্য সম্প্রদায়েও নারাগণ প্রব্রজ্যাগ্রহণ করিতে পারিত এবং ধর্মজীবনার্থিনী নারীও সেযুগে অনেক ছিল। ধর্মনিয়ম যথাযথ পালন করিলে নারীগণও ধর্মজীবনের চরমফলভোগিনী হইতে পারে, একথা বুদ্ধ যখন এত স্পষ্টভাবে স্বীকার করিয়াছিলেন তখন তিনি যে নারীমাত্রেরই সংঘপ্রবেশের বিরোধী বা নারীবিদ্বেষী ছিলেন এরূপ মনে হয় না। তবে যে কোনও নারীকে নির্বিচারে সংঘে প্রবেশ করিতে দেওয়ায় সম্ভবতঃ তাঁহাব আপত্তি ছিল এবং ইহা স্বাভাবিকই। বুদ্ধ বিশেষ লোকচরিত্রজ্ঞ ছিলেন—স্ব স্ব স্বভাবে এবং পরস্পবসম্পর্কে স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই যাহা যাহা দুর্বলতা তাহা তিনি ভালরূপেই জানিতেন। নারীর সাধারণ কর্মক্ষেত্র যে গৃহপরিবার-সংসার তাহাও বোধহয় বুদ্ধের মত ছিল।

নারীগণের সংঘপ্রবেশ সম্বন্ধে বুদ্ধ প্রথম হইতেই বিবিধ এবং অতি কঠিন নিয়মাবলী বাঁধিয়া দিয়াছিলেন, ইহাও সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক মনে হয় না কারণ ভিক্ষুগণ সম্পর্কে তিনি এরূপ করেন নাই। নিয়মগুলি ক্রমে ক্রমে নানা অভিজ্ঞতার ফলে প্রণীত হওয়া সম্ভব এবং অনেক নিয়ম সম্ভবতঃ বুদ্ধের মৃত্যুর অনেক পরে প্রবর্তিত হয়, যদিও শাস্ত্রে তাহা বুদ্ধপ্রণীত

বলিয়াই বিবৃত হইয়াছে। মিলিন্দ-পঞ্হ গ্রন্থে বর্ণিত আছে রাজা মিলিন্দ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন বুদ্ধ যদি সর্বজ্ঞ ছিলেন তবে তিনি সংঘের সকল নিয়ম প্রথম হইতেই প্রবর্তন করেন নাই কেন? এগুলি যে প্রয়োজন হইবে তাহা না বুঝিয়া থাকিলে কি তাঁহার সর্বজ্ঞতার হানি হয় না? উত্তরে ভিক্ষু নাগসেন বলিয়াছিলেন বুদ্ধ পূর্ব হইতেই সবই জানিতেন কিন্তু প্রয়োজন অনুসারে একটি একটি করিয়া বিধিনিষেধ প্রকাশ করেন। ইহাতে দেখা যায়—বুদ্ধ সর্বজ্ঞ হউন বা না হউন—তিনি সব বিষয়েই প্রয়োজন অনুসারে নিয়ম প্রবর্তন করিতেন, পূর্ব হইতে সকল নিয়ম বাঁধিয়া দিতেন না। প্রশ্ন উঠিতে পারে বুদ্ধ যদি নারীদ্বেষী না ছিলেন তবে তাঁহার শিষ্যগণ নারী-দ্বেষী হইলেন কেন? উত্তরে বলা যায় পরবর্তী কালে, এমনকি বুদ্ধের জীবিতাবস্থায়ই, তাঁহার শিষ্যবর্গের অনেকের নিকট ধর্মজীবনের অর্থ দাঁড়াইয়াছিল সংঘবদ্ধ সন্ন্যাসজীবন। বুদ্ধ স্বয়ং বোধহয় মধ্যপথের পূর্ণতর ও উচ্চতর জীবন বলিতে ঠিক ইহা বুঝেন নাই। সংঘবদ্ধ সন্ন্যাসজীবনের পক্ষে নারীবর্জন আবশ্যক নতুবা সে জীবনের ভিত্তিভঙ্গ হয়। নারীবর্জক-মনোভাব সৃষ্টি করাইতে হইলে নারীবিদ্বেষই প্রধান উপায়। সন্ন্যাসীগণের নিকট ইহা এত প্রয়োজনীয় বিষয় মনে হইয়াছিল যে তাঁহারা বুদ্ধের অন্তিমবাণীরূপে এই বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, বুদ্ধ যখন মৃত্যুশয্যায় শয়িত তখন (অত্যন্ত অপ্রাসঙ্গিকভাবে) আনন্দ সহসা প্রশ্ন করিলেন "ভদন্ত, স্ত্রীলোকদের সহিত আমাদের কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে?"

"আনন্দ, স্ত্রীলোকদের দিকে তাকাইও না,"

"ভদন্ত, যদি তাকাইতে হয় তবে আমরা কি করিব?"

"আনন্দ, তাহা হইলে কথা বলিও না,"

"ভদন্ত, যদি কথা বলিতে হয় তবে আমরা কি করিব?"

"আনন্দ, কথা বলিতে হইলে সাবধানে সতর্ক থাকিবে।"

কোনও সময়ে আনন্দ বা অন্য কাহাকেও বুদ্ধের এই মর্মের কথা বলা খুবই সম্ভব, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে যখন সকলে রোরুদ্যমান তখন আনন্দের মনে এ প্রশ্নের উদয় কল্পনা করা খুবই কঠিন। বোধহয় সন্ন্যাসীরা শাস্ত্রবিবরণে বুদ্ধের অন্তিমমুহূর্তে নারীবর্জন বিষয়ে অপ্রাসঙ্গিক আদেশের অবতারণা এই উদ্দেশ্যে করিয়াছিলেন যাহাতে কেহ তাহার ব্যতিক্রম না

করে। নারীগণের সংঘপ্রবেশ সম্পর্কে আনন্দের আগ্রহ তাঁহার কোমল প্রাণের পরিচায়ক। তিনি মহাপ্রজাবতীকর্তৃক মাতৃহীন শিশুবুদ্ধের লালনপালনের যে স্মৃতি উদ্রেক করান তাহাও অতি মর্ম্মস্পর্শী। ইহাতে বুদ্ধও বিচলিত না হইয়া পারেন নাই, নারীগণের সংঘপ্রবেশে তাঁহাব যাহা কিছু আপত্তি বা সংশয় ছিল তাহা সবই এই স্মৃতিতে নির্বাক হইয়া গিয়াছিল। আমরা পরে দেখিব এজন্য সন্ন্যাসীরা বুদ্ধেব মৃত্যুর পর আনন্দকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়াছিলেন।

[মহাবগ্গ ও চুল্লবগ্গ ; কুণালজাতক , ধম্মপদট্ঠকথা।]



বাঘ গুহাচিত্রেব একটি পুষ্প

৭

সংঘকাহিনী

সংঘসম্বন্ধীয় নানাবিধ নিয়মাবলী প্রবর্তনের ইতিহাস বিনয়পিটকে সবিস্তারে বর্ণিত আছে। এখানে আমরা কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করিব। পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে বুদ্ধ প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন নিয়ম প্রণয়ন করিতেন, পূর্ব হইতেই সমুদায় নিয়ম বাঁধিয়া দেওয়ার পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না, আবার প্রয়োজন হইলেই তিনি পূর্বপ্রণীত-নিয়ম পরিবর্তন করিতেন। তাঁহার নিকট নিয়ম অপেক্ষা মানুষ ও তাহার যথার্থ প্রয়োজন অনেক বেশি বড় ছিল, সংঘের অন্য সন্ন্যাসীরা ইহা সর্বদা না বুঝিয়া নিয়মকেই মানুষ অপেক্ষা বড় মনে করিতেন। অবশ্য ইহা হইতে কেহ যেন এরূপ মনে না করেন যে বুদ্ধ নিয়মানুগত্যের পরিবর্তে যথেচ্ছাচার বা উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয় দিতেন। সংঘের নিয়মগুলিতে তদানীন্তন জীবনের অনেক ছায়া পাওয়া যায় এবং ইহাও দেখা যায় যে বহু নির্বোধ দুষ্ট ও অবাঞ্ছনীয় লোক নানা উদ্দেশ্যে সংঘে প্রবেশ করিত। বিনয়পিটকে এই সকল বৃত্তান্ত বুদ্ধের সমসাময়িক ঘটনারূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহা বোধহয় সর্বত্র সত্য নহে—পরবর্তীকালের কোন কোনও ঘটনা এবং সে সম্পর্কে সংঘনায়কগণের প্রণীত বিধিনিষেধ সম্ভবতঃ শাস্ত্রে বুদ্ধের সমকালীন এবং স্বয়ং বুদ্ধকর্তৃক প্রবর্তিত ব্যবস্থারূপেই স্থান পাইয়াছে।

সংঘপ্রবেশার্থীকে প্রথমে 'প্রব্রজ্যা' বা সংসারত্যাগপূর্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হইত এবং পরে তাহাকে 'উপসম্পদা' বা পূর্ণদীক্ষা দেওয়া হইত। এই দুই অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ হইলে তবে লোকে 'ভিক্ষু' রূপে পরিচিত হইত। আন্তরিক ধর্মার্থী ব্যতীত অন্য নানাপ্রকার লোক ক্রমে সংঘে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিল। মগধে যুদ্ধোদ্যোগ উপস্থিত হইলে অনেক সৈন্য যুদ্ধে যোগদান হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিল, যুদ্ধের ডাক পড়িলে তাহাদের পাওয়া গেল না। বিম্বিসার বুদ্ধকে একথা জানাইলে রাজভৃত্যদিগকে প্রব্রজ্যাদান নিষিদ্ধ হইয়াছিল। লোকে যেন ভিক্ষু-দের কোনও ক্ষতি না করে, বিম্বিসার এই আজ্ঞা প্রচার করার পর কয়েকজন

বন্দী কারাগার হইতে পলাইয়া প্রব্রজ্যা লইল, লোকে তাহাদের ধরাইয়া দিতে চাহিলে অনেকে তাহাতে সম্মত হইল না কারণ বিম্বিসার ভিক্ষুদের ক্ষতি করা নিষেধ করিয়াছিলেন। বুদ্ধ জানিতে পারিয়া পলাতক বন্দীদের সংঘপ্রবেশ নিষেধ করিলেন। দেনাদার, ক্রীতদাস এবং অন্য অপরাধীরা পলাইয়া আসিয়া সংঘে প্রবেশ করিলে তাহাও নিষিদ্ধ হইল। এক টাকমাথা স্বর্ণকার মাতাপিতার সহিত কলহ করিয়া সংঘে প্রবেশ করিয়া মাথা মুড়াইয়াছিল। মাতাপিতা তাহার অন্বেষণে আসিয়া ভিক্ষুদের টাকমাথা লোক সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় ভিক্ষুরা সেরূপ কাহাকেও দেখে নাই বলিল, কারণ তাহারা সকলে স্বর্ণকারের মাথা মুড়াইবার পূর্বের অবস্থা দেখে নাই। পরে মাতাপিতা স্বর্ণকারকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া রটনা করিল যে ভিক্ষুরা মিথ্যাবাদী। ইহাতে নিয়ম হইল প্রব্রজ্যাপ্রার্থীকে অন্য ভিক্ষুদের সকলকে দেখাইতে হইবে।

ভিক্ষুরা বিহারে বাস করে, সুখে খায় দায় দেখিয়া কতকগুলি লোক তাহাদের ছেলেদের সংঘে প্রবেশ করাইয়াছিল। ছেলেগুলি প্রাতঃকালে উঠিয়াই খাইবার জন্য বায়না ধরিত এবং ভিক্ষুরা "সকাল হউক, খাবার থাকিলে খাইবে, না থাকিলে ভিক্ষায় বাহির হইলেই খাবার পাইবে" বলিয়া বুঝাইলেও শান্ত না হইয়া আরও গণ্ডগোল উপদ্রব করিত। বুদ্ধ প্রত্যূষে তাহাদের চীৎকার শুনিয়া ভিক্ষুদের তিরস্কার করিয়া বিশ বৎসরের অনধিক বয়স্কের পক্ষে প্রব্রজ্যা নিষেধ করিলেন, কারণ "তরুণেরা ক্ষুৎপিপাসা শীতগ্রীষ্ম এবং অন্য শারীরিক বা মানসিক কষ্ট সহিতে পারে না"। এক পরিবারের একটি লোক ও তাহার বালকপুত্র ব্যতীত অন্য সকলেই মারীরোগে মারা গেলে লোকটি সপুত্রক প্রব্রজ্যা লইল। সে ভিক্ষায় বাহির হইয়া কিছু পাইলেই ছেলেটি 'খোট' ধরিত "বাবা, আমাকে একটু দাও, আমাকে একটু দাও"। লোকে বলিতে লাগিল "শাক্যপুত্রীয় শ্রমণরা চরিত্রহীন—বালকটি নিশ্চয় ভিক্ষুণীপুত্র"। ইহাতে পনের বৎসরের কম বয়স্কদিগকে প্রব্রজ্যাদান নিষিদ্ধ হইল। এক পরিবার আনন্দকে ভক্তি করিত। মারীরোগে সেই পরিবারের দুইটি ছোট ছেলে ছাড়া সকলেই মারা পড়িল। ছেলেদুটি পূর্ব-অভ্যাসমত ভিক্ষুদের দেখিলেই দৌড়িয়া আসিত কিন্তু ভিক্ষুরা তাহাদের তাড়াইয়া দিত (বোধহয় ছেলেদের বাড়ীতে ভিক্ষা পাওয়ার

আর সম্ভাবনা ছিল না বলিয়া!) এবং ছেলেদুটি ইহাতে কাঁদিত। ছেলেদুটির কথা ভাবিয়া আনন্দ ব্যথিত হইলেন, উহাদের বয়স পনের বৎসরের কম, সংঘেও তাহাদের প্রবেশের উপায় নাই। নিরুপায় হইয়া আনন্দ বুদ্ধকে ছেলেদুটির কথা জানাইলেন। চিত্তকোমলতা রহস্যে ঢাকিয়া বুদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন ছেলেদুটি কাক তাড়াইতে পারে কিনা এবং পারে শুনিয়া কাক তাড়াইবার জন্য পনের বৎসরের কম বয়স্ককে সংঘে প্রবেশ করাইবার অনুমতি দিলেন। সংঘের বালকদিগকে 'শ্রমণের' অর্থাৎ 'বালক শ্রমণ' বলা হইত।

এক ভিক্ষুর শিক্ষাধীন দুইটি শ্রমণের পরস্পরের সহিত দুষ্ক্রিয়া করায় নিয়ম হইয়াছিল কোনও ভিক্ষুর অধীনে একাধিক শ্রমণের থাকিবে না। সারিপুত্রের ভক্ত এক গৃহস্থ নিজপুত্রকে সারিপুত্রের নিকটে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করাইবার ইচ্ছা করিলে সারিপুত্র সম্মত হইলেন না কারণ বুদ্ধপুত্র রাহুল তখন তাঁহার শিক্ষাধীন ছিল। বুদ্ধ ইহা শুনিয়া সারিপুত্রকে দ্বিতীয় শ্রমণের গ্রহণে অনুমতি দিয়া বলিলেন "বিদ্বান ও সুযোগ্য ভিক্ষু ইচ্ছা করিলে একাধিক বা যতগুলিকে যথাযথভাবে শিক্ষা দিতে ও শাসনে রাখিতে পারেন, ততগুলি শ্রমণের লইতে পারিবেন"। এক শ্রমণের এক ভিক্ষুণীর সহিত দুষ্ক্রিয়া করায় সংঘ হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিল। এক ক্লীব প্রব্রজ্যা লইয়া যুবা ভিক্ষুদের দুষ্ক্রিয়ায় আহ্বান করায় ভিক্ষুরা তাহাকে 'মর্ মর্' বলিয়া তাড়াইয়া দিল। তখন সে বলিষ্ঠ শ্রমণেরদের আহ্বান করিলে তাহারাও তাহাকে তাড়াইয়া দিল। অবশেষে সে হাতিশাল-ঘোড়াশালের লোকদের কাছে গিয়া দুষ্ক্রিয়া করিলে তাহারা বলিতে লাগিল "শাক্যপুত্রীয় শ্রমণরা ক্লীব, যাহারা ক্লীব নহে তাহারা ইহাদের সহিত দুষ্ক্রিয়া করে, ইহারা দুশ্চরিত্র"। বুদ্ধ জানিতে পারিয়া ক্লীবকে বহিষ্কার করিয়াছিলেন। অবস্থাপন্ন পরিবারের একটি লোকের আত্মীয়স্বজন মারা গেলে সে জীবিকার্জনের শ্রমে বিমুখ হইয়া ভিক্ষাপাত্র ও চীবর সংগ্রহ করিয়া মাথা মুড়াইয়া ভিক্ষু সাজিয়া আরামে উপস্থিত হইল। অন্য ভিক্ষুরা তাহার কবে উপসম্পদা হইয়াছে, তাহার উপাধ্যায় কে প্রভৃতি প্রশ্ন করিলে সে ভিক্ষুদের কথার অর্থ বুঝিতে পারিল না। তখন সংঘনিয়মাবলীতে অভিজ্ঞ ভিক্ষু উপালি তাহাকে পরীক্ষা করিলে সে সব কথা স্বীকার করিল—ইহাকেও বহিষ্কার করা হইল।

এক মাতৃহন্তা ও এক পিতৃহন্তা প্রব্রজ্যা লইতে আসিয়া পরীক্ষার সময়ে উপালির কাছে স্বদোষ স্বীকার করায় তাহাদেরও সংঘে লওয়া হয় নাই। লোক দুইটি বোধহয় অনুতপ্ত হইয়া আসে নাই। নরহন্তা কয়েকজন দস্যু রাজসৈন্যের হাতে ধরা পড়িয়াছিল, অপরেরা পলাইয়া গিয়া প্রব্রজ্যা লইল। ধৃতদের বিচারের পর প্রাণদণ্ড হওয়ায় যখন বধ্যভূমিতে লইয়া যাওয়া হইতেছিল তখন পথে তাহাদের দেখিয়া পলাতকরা বলাবলি করিতেছিল "ভাগ্যে পলাইয়াছিলাম, ধরা পড়িলে মরিতে হইত!" অন্য ভিক্ষুরা ইহা শুনিয়া প্রশ্ন করায় তাহারা ব্যাপার স্বীকার করিয়া বহিষ্কৃত হইয়াছিল। এক বনের মধ্যে ডাকাত পড়িয়া কয়েকজন ভিক্ষুণীর ধর্মনাশ করিয়াছিল; তাহাদেরও কয়েকজন ধরা পড়িল, কয়েকজন পলাইয়া গিয়া প্রব্রজ্যা লইয়া অবশেষে পূর্বোক্ত ঘটনার মত অপরাধ প্রকাশ করিল। এক উভলিঙ্গ ব্যক্তি প্রব্রজ্যা লইয়া উভয়প্রকারে দুষ্ক্রিয়া করিত। ইহারা সকলেই বহিষ্কৃত হইয়াছিল। বিকলাঙ্গ ব্যাধিগ্রস্ত প্রভৃতিরাও প্রব্রজ্যা লইলে লোকে নিন্দা করায় ইহা নিষিদ্ধ হইয়াছিল। এক ভিক্ষুর উপসম্পদার পর তাহার স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে "সন্ন্যাসীর পক্ষে স্ত্রীসম্ভোগ দুর্লভ" এই কথা বলিয়া স্ত্রী তাহাকে সম্ভোগে প্রবৃত্ত করাইল এবং ইহাতে ভিক্ষুব আরামে ফিরিতে দেরি হওয়ায় অন্যেরা প্রশ্ন করিলে সে ঘটনা বলিল, তাহাতে অন্যেরা নিন্দা করিল। ভিক্ষু বলিল ইহা যে অকর্তব্য তাহা সে জানিত না (সে অবশ্যই জানিত কিন্তু ইহা তাহাকে প্রকাশ্যে জানান হয় নাই বলিয়া বোধহয় সে 'নেকা' সাজিয়াছিল)। বুদ্ধ শুনিতে পাইয়া বলিলেন প্রব্রজ্যার্থীকে এই নিয়মগুলি একটি একটি করিয়া বলিয়া দিতে হইবে—১. সকল প্রকারের, এমনকি তির্যকযোনির সহিত পর্যন্ত মৈথুন ত্যাগ করিতে হইবে। ২. অদত্ত কোনও দ্রব্য গ্রহণ করা যাইবে না। ৩. ইচ্ছাপূবক কোনও প্রাণী হত্যা করিতে পারা যাইবে না। ৪. লোকোত্তব কোনও শক্তিসামর্থের অহংকার করা যাইবে না—এমনকি "আমি নির্জনস্থান ভালবাসি" এরূপও বলা যাইবে না (বুদ্ধ যে অনাথপিণ্ডদকে বলিয়াছিলেন "হে গৃহপতি, তথাগতেরা নির্জনস্থান ভালবাসেন" এবং তাঁহার নির্জনতাপ্রিয়তা প্রসিদ্ধ ছিল বলিয়া তাঁহার অনুকরণে অনেকে বোধহয় বলিতে আরম্ভ করিয়াছিল যে তাহারাও পরম বিবিক্তসেবী)।

নূতন ভিক্ষুরা বহুপ্রকার অনাচার আরম্ভ করিল। কেহ উপযুক্ত ভাবে বস্ত্রধারণ না করিয়া ভিক্ষায় বাহির হইত, কেহ লোকের আহার্যের উপর উচ্ছিষ্ট ভিক্ষাপাত্র ধরিয়া ভিক্ষা চাহিত, কেহ ভোজনশালায় তারস্বরে কলরব আরম্ভ করিল। লোকে নিন্দা করিয়া বলিতে লাগিল "ইহারা তো নিমন্ত্রণের সময়ে ব্রাহ্মণেরা যেরূপ করে সেইরূপই করিতেছে।" বুদ্ধ ভিক্ষুদের তিরস্কার করিয়া নিয়ম করিলেন নূতন ভিক্ষুদিগকে পুরাতন ভিক্ষুদের নিকট শিক্ষাধীন থাকিতে হইবে। শিক্ষক-ভিক্ষুকে 'উপাধ্যায়' ও ছাত্র-ভিক্ষুকে 'সার্দ্ধবিহারিক' বলা হইত। গুরুশিষ্যের পরস্পরসম্বন্ধ বিষয়ে বুদ্ধ বলিয়াছিলেন "উপাধ্যায়ের উচিত সার্দ্ধবিহারিককে পুত্রতুল্য মনে করা, সার্দ্ধবিহারিকের উচিত উপাধ্যায়কে পিতৃতুল্য মনে করা। পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবান, বিশ্বাসবান ও ঐক্যবান হইয়া উভয়ে এইরূপে উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে।" সার্দ্ধবিহারিককে ভৃত্যের মত উপাধ্যায়ের সেবা করিতে হইত, উপাধ্যায়কেও সার্দ্ধবিহারকের যত্ন লইতে ও পীড়াদিতে শুশ্রূষা করিতে হইত। কিন্তু অচিরেই উপাধ্যায়-সার্দ্ধবিহারিকের মধ্যে অমিল দেখা দিল—অনেক সার্দ্ধবিহারিক উপাধ্যায়ের কথা শুনিল না, তাঁহার কাজ করিল না, তাঁহাকে মান্য করিল না। বুদ্ধ অবাধ্যগণকে ভর্ৎসনা করিলেও বিবাদ থামিল না। তখন নিয়ম হইল উপাধ্যায় বাক্যে বা ইঙ্গিতে সার্দ্ধবিহারিককে শিক্ষাচ্যুত করিতে পারিবেন। অনেক অপরাধী ক্ষমা চাহিয়া পুনর্গৃহীত হইল, অনেকে ক্ষমাপ্রার্থনা না করায় তাহা অপরাধ বলিয়া গণ্য হইল। কোনও উপাধ্যায় ক্ষমাপ্রার্থীকে ক্ষমা করিলেন না, কেহ দুষ্ট সার্দ্ধবিহারিককে পদচ্যুত করিলেন না, কেহ নিরপরাধকে পদচ্যুত করিলেন। এসবই অপরাধরূপে গণ্য হইল।

এক ব্রাহ্মণকে কেহ প্রব্রজ্যাদানে স্বীকৃত না হওয়ায় ব্রাহ্মণ সদুঃখে বুদ্ধকে ইহা জানাইলে বুদ্ধ শিষ্যগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে কেহ কোনও ভাল কথা বলিতে পারে কিনা। সারিপুত্র বলিলেন ব্রাহ্মণ একবার তাঁহাকে একহাতা অন্ন ভিক্ষা দিয়াছিল। বুদ্ধ বলিলেন "সাধু সাধু সারিপুত্র, সৎলোক কৃতজ্ঞ হয়, তুমি ব্রাহ্মণকে দীক্ষা দাও।" এই সময়ে নিয়ম হয় কাহাকেও দীক্ষাদানে আপত্তি হইতে পারে মনে হইলে দীক্ষাদাতা একজন সুযোগ্য ভিক্ষুদ্বারা সংঘে এইভাবে তিনবার

'জ্ঞপ্তি' বা প্রস্তাব উপস্থিত করিবেন—"হে ভদন্তগণ, সংঘ আমার কথা শ্রবণ করুন। অমুক ব্যক্তি আয়ুষ্মান্ অমুকের নিকট উপসম্পদা লইতে চাহেন। যদি সংঘের সম্মতি থাকে তবে অমুক ব্যক্তিকে আয়ুষ্মান্ অমুকের উপাধ্যায়ত্বে সংঘ উপসম্পদা দান করুন। ইহাই জ্ঞপ্তি।" পুনরায়—"হে ভদন্তগণ, সংঘ আমার কথা......উপসম্পদা লইতে চাহেন। অমুক ব্যক্তিকে আয়ুষ্মান অমুকের উপাধ্যায়ত্বে সংঘ উপসম্পদা দান করিলেন। ইহাতে যাঁহার সম্মতি আছে তিনি তুষ্ণী থাকুন এবং যাঁহার আপত্তি আছে তিনি বলুন।" এইরূপ তিনবার বলিবার পর কোনও আপত্তি উপস্থাপিত না হইলে প্রস্তাবক ভিক্ষু পুনরায় বলিতেন "অমুক ব্যক্তিকে আয়ুষ্মান্ অমুক ভিক্ষুর উপাধ্যায়ত্বে সংঘ উপসম্পদা দান কবিলেন। ইহাতে সংঘের সম্মতি আছে, তাই সংঘ তুষ্ণী আছেন। ইহাই আমি বুঝিলাম।" পণ্ডিতেরা মনে করেন এই বিধি লিচ্ছবি মল্ল শাক্য প্রভৃতিদের গণতান্ত্রিক বিধানসভায় অনুসৃত প্রথা হইতে গৃহীত হইয়াছিল। কোনও বিষয়ে মতভেদ উপস্থিত হইলে সাধারণতঃ অধিকাংশের মতই গ্রাহ্য হইত কিন্তু বুদ্ধ নিয়ম করিয়াছিলেন যে, সুবিজ্ঞ শীলবান পণ্ডিত ও প্রবীণ ভিক্ষুরা যদি অধিকাংশের মত ভ্রান্ত বা অসঙ্গত মনে করেন তবে তাহা গ্রাহ্য হইবে না। বুদ্ধের নিকট সংখ্যা অপেক্ষা গুণের মর্যাদাই অধিক ছিল। এক ব্যক্তি উপসম্পদার পর অনাচার করায় অন্যভিক্ষুরা আপত্তি করিলে সে বলিল "আমি তো আপনাদের কাছে উপসম্পদা চাহি নাই, আপনারা আমাকে উপসম্পদা দিলেন কেন?" তখন নিয়ম হইল উপসম্পদাপ্রার্থী প্রথমে সংঘের নিকট বিনীতভাবে "সংঘ কৃপা করিয়া সংসারমুক্তির জন্য আমাকে উপসম্পদা দান করুন" এইরূপ নিবেদন করিলে তবে তাহার বিষয়ে যথারীতি জ্ঞপ্তি উপস্থাপন করা যাইবে।

কয়েকজন ধনী গৃহস্থভক্ত পালা করিয়া ভিক্ষুদের নিমন্ত্রণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। এক ব্রাহ্মণ ইহা দেখিয়া সংঘে প্রবেশ করিল এবং ধনীদের নিমন্ত্রণের পালা ফুরাইয়া গেলে অন্যেরা যখন বলিল "চল, এখন ভিক্ষায় বাহির হওয়া যাউক" তখন ব্রাহ্মণ বলিল "আমি ভিক্ষায় বাহির হইবার জন্য সংঘে প্রবেশ করি নাই, তোমরা আমাকে যদি খাইতে দাও তবে আমি থাকিব, নতুবা গৃহে ফিরিয়া যাইব।"

"তবে কি তুমি পেটের জন্য প্রব্রজ্যা লইয়াছিলে ?"

"হাঁ।"

বুদ্ধ জানিতে পারিয়া ব্রাহ্মণকে প্রশ্ন করিলেন এবং তাহার উত্তর শুনিয়া তাহাকে তিরস্কার করিয়া নিয়ম করিলেন উপসম্পদার সময়ে প্রার্থীকে ভিক্ষুরা এই চারিটি 'নিশ্রয়' সম্বন্ধে বুঝাইয়া দিবে—১. যে ভিক্ষু হইয়াছে তাহাকে যাবজ্জীবন ভিক্ষান্নের উপর নির্ভর করিতে হইবে, নিমন্ত্রণাদি অতিরিক্ত লাভ। ২. যে ভিক্ষু হইয়াছে তাহাকে যাবজ্জীবন পথ শ্মশান প্রভৃতি হইতে সংগৃহীত বস্ত্রে প্রস্তুত চীবরের উপর নির্ভর করিতে হইবে, অন্য প্রকার বস্ত্র অতিরিক্ত লাভ। ৩. যে ভিক্ষু হইয়াছে তাহাকে যাবজ্জীবন বৃক্ষতলে বাসের উপর নির্ভর করিতে হইবে, অন্যপ্রকার আবাসস্থান অতিরিক্ত লাভ। ৪. যে ভিক্ষু হইয়াছে তাহাকে যাবজ্জীবন পূতিগোমূত্রমাত্র ভেষজের উপর নির্ভর করিতে হইবে, অন্যপ্রকার ঔষধ অতিরিক্ত লাভ।

এক দীক্ষার্থী যুবক নিশ্রয়গুলির কথা শুনিয়া বলিল "উপসম্পদার পর এগুলির কথা শুনিলে আমার আগ্রহ বাড়িত কিন্তু এখন আমি উপসম্পদা লইব না, এগুলি আমার ভাল লাগে না ও ঘৃণ্য মনে হয়"। তাহাতে নিয়ম হইল পূর্বে না বলিয়া ঠিক উপসম্পদার পরই নিশ্রয়গুলির কথা বলিতে হইবে। কোন কোনও ভিক্ষু দুই-তিনজন মাত্র ভিক্ষুকে লইয়া সংঘ করিয়া দীক্ষার্থীকে উপসম্পদা দান করিল, ইহাতে নিয়ম হইল দশজনের কম ভিক্ষুকে লইয়া সংঘ করা যাইবে না। অনেক ভিক্ষু নিজেদের উপসম্পদা লাভের অল্পদিন পরেই সার্দ্ধবিহারিককে উপসম্পদা দান করিলে বুদ্ধ এক ভিক্ষুকে বলিয়াছিলেন "তোমারই উচিত অন্যের নিকট শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করা। কি করিয়া তুমি নিজেকে অপরের শিক্ষক হইবার উপযুক্ত মনে করিলে ? অতিসত্বর তুমি শিষ্যসংগ্রহের বাসনায় মুগ্ধ হইয়াছ !" তারপর তিনি নিয়ম করিলেন কেহ নিজে দশ বৎসরের কম সময় ভিক্ষু হইলে অন্যকে উপসম্পদা দিতে পারিবে না। দশ বৎসর ভিক্ষু থাকিবার পর যে-সে ভিক্ষু উপসম্পদা দান করিবার ফলে অনেক মূর্খ নির্বোধ ও অযোগ্য উপাধ্যায়ের বুদ্ধিমান পণ্ডিত ও সুযোগ্য সার্দ্ধ-বিহারিক হইল। একটি অন্য সম্প্রদায়ের লোক ভিক্ষু হইয়া উপাধ্যায়কে তর্কে হারাইয়া পুনরায় গিয়া পূর্বসম্প্রদায়ে যোগ দিল এবং কিছুদিন পরে

আবাব আসিয়া উপসম্পদা প্রার্থনা করিল। ইহাতে নিয়ম হইল অন্য সম্প্রদায়ের লোক দীক্ষা চাহিলে তাহাকে চারমাস 'পরিবাস' পালন করিতে অর্থাৎ পরীক্ষাধীন থাকিতে হইবে এবং এই সময়ে তাহার আচারব্যবহারের উপর তীক্ষ্নদৃষ্টি রাখা হইবে, কিন্তু উপসম্পদার 'পব পূর্বসম্প্রদায়ে ফিরিয়া গেলে তাহাকে আর কখনও সংঘে লওয়া হইবে না। জটিল (জটাধারী), অগ্নি-উপাসক ও শাক্যবংশীয়রা পূর্বে অন্য সম্প্রদায়ে থাকিলেও বুদ্ধ তাহাদের পরিবাস-মার্জনায় অনুমতি দিয়াছিলেন। জটিলদের সম্বন্ধে ইহার কারণ বলা হইয়াছে যে তাহারা কর্মফলে বিশ্বাসী কিন্তু ইহা বোধহয় ঠিক নহে, কাবণ অন্য অনেকেও—যেমন নিগ্রর্ন্থরা—কর্মফলে বিশ্বাসী ছিল। জটিলদের নেতৃস্থানীয়রা পূর্বেই বুদ্ধেব শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া বোধহয় তাহাদের সম্বন্ধে নিয়ম শিথিল করা হইয়াছিল। শাক্যবংশীয়দের পরিবাস-মার্জনার কারণ বুদ্ধ বলিয়াছিলেন "আমার জ্ঞাতিদিগকে আমি এই বিশেষ সুবিধা দিলাম।" আরও নিয়ম হইল শুধু দশ বৎসর ভিক্ষু থাকিলেই হইবে না, কেবলমাত্র উপযুক্ত ও পণ্ডিত ভিক্ষুই দীক্ষা দিতে পারিবেন।

কোন কোনও উপধ্যায়ের মৃত্যু হইলে বা তিনি সংসারে ফিরিয়া গেলে বা অন্যসম্প্রদায়ে যোগ দিলে সার্দ্ধবিহারিকরা যথেচ্ছাচার আরম্ভ করিল। ইহাতে নিয়ম হইল তাহাদের শিক্ষাসমাপ্তির জন্য 'আচার্য'-রূপে অন্য ভিক্ষু নিযুক্ত হইবেন। আচার্যের শিক্ষাধীনকে 'অন্তেবাসী' বলা হইত। আচার্য অন্তেবাসীর সম্বন্ধ উপাধ্যায়-সার্দ্ধবিহারিকের মতই হইল।

পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে একবার মহামারী উপস্থিত হইলে লোকে বৈদ্য জীবকের শরণাপন্ন হইয়াও তাঁহার চিকিৎসা পায় নাই। জীবক কিন্তু ভিক্ষুদের চিকিৎসা কবেন দেখিয়া একটি ভদ্রসন্তান রোগগ্রস্ত হইয়া সংঘে প্রবেশ করিল এবং জীবকেব চিকিৎসায় সুস্থ হইবার পর সংসাবে ফিরিয়া গেল। পরে জীবকের সহিত সাক্ষাৎ হইলে জীবকের প্রশ্নের উত্তরে সে তাহার সংঘপ্রবেশের কারণ স্বীকার করায় জীবক বুদ্ধের কাছে আপত্তি জানাইলে রোগগ্রস্তদের সংঘপ্রবেশ নিষিদ্ধ হইয়াছিল। একবার স্থান-পরিবর্তন প্রয়োজন হইলেও অনেক ভিক্ষু স্থানত্যাগ করিল না, কারণ যদি তাহাদের গুরুরাও না যান তবে নূতন স্থানে গেলে তাহাদের গুরু-পরিবর্তন করিতে হইবে এবং ইহাতে দশ বৎসর এক গুরুর শিক্ষাধীন থাকায় ব্যাঘাত

হইবে। ইহাতে বুদ্ধ নিয়ম করিলেন বুদ্ধিমান ও উপযুক্ত ভিক্ষুর পাঁচ বৎসর শিক্ষাগুরুর আশ্রয়ে থাকিলেই চলিবে, যে নির্বোধ তাহাকে চিরজীবন আশ্রয়ে থাকিতে হইবে এবং উপযুক্ত লোক বিনা আশ্রয়েও থাকিতে পারিবে। শ্রমণেরদের জন্য এই নিয়মগুলি পালনের ব্যবস্থা হইয়াছিল—১. প্রাণীহত্যা হইতে বিরতি ২. অদত্তগ্রহণ হইতে বিরতি ৩. মৈথুন হইতে বিরতি ৪. মিথ্যাবাদ হইতে বিরতি ৫. মগ্যাদি পান হইতে বিরতি ৬. অকালভোজন হইতে বিরতি ৭. নৃত্য গীত বাগ্য ও রঙ্গদর্শন হইতে বিরতি ৮. মাল্য গন্ধ বিলেপন মণ্ডন বিভূষণ হইতে বিরতি ৯. উচ্চ ও বৃহৎ শয্যা হইতে বিরতি, এবং ১০. স্বর্ণরৌপ্য গ্রহণ হইতে বিরতি। কোন কোনও শ্রমণের ভিক্ষুগণকে মান্য করিত না, ইহাতে নিয়ম হইল ভিক্ষুরা শ্রমণেরদিগকে দণ্ড দিতে পারিবে—যেমন কোন কোনও স্থানে শ্রমণেরদের প্রবেশ নিষেধ প্রভৃতি। কোনও ভিক্ষু শ্রমণেরদের সমগ্র সংঘারামে প্রবেশ নিষেধ করিল, কেহ শ্রমণেরদের আহার নিষেধ করিল। বুদ্ধ জানিতে পারিয়া নৃশংস দণ্ডদান নিষেধ করিলেন।

সংঘের দুষ্টগণের মধ্যে ছয়জন ভিক্ষু প্রধান ছিল, এজন্য ইহাদের 'ষড়্‌বর্গীয়' বলা হইত। কথিত আছে উরুবিল্ব-ঋষিপত্তনে বুদ্ধের পূর্বসঙ্গী সেই 'পঞ্চভিক্ষু'র মধ্যে একজন এই দলে ছিল। ইহারা নানাবিধ অনাচার করিত বলিয়া শেষে অনেক অপকর্মই ইহাদের নামে চালান হইত। 'আশ্রয়' (অর্থাৎ শিক্ষাদাতা উপাধ্যায়-আচার্যের অধীন থাকা) লইয়া অনেক সমস্যা উঠিল। একাকী স্থানান্তরে যাইবার সময়ে পথে চলিতে চলিতে এক ভিক্ষুর হঠাৎ স্মরণ হইল তাহার আশ্রয় কেহ নাই—ইহাতে নিয়ম হইল পথে চলিবার সময়ে আশ্রয় না থাকিলেও চলিবে। অন্যান্য ঘটনার পর আরও নিয়ম হইল অসুস্থ অবস্থায় বা রোগীভিক্ষুর সেবা করিবার সময়ে আশ্রয় না থাকিলেও চলিবে এবং উপযুক্ত আশ্রয় পাইবামাত্র গ্রহণ করিবার ইচ্ছা থাকিলে বিনা আশ্রয়েও থাকা যাইবে। কোনও ভিক্ষু দোষ করিয়া তাহা স্বীকার না করিয়া সংসারে ফিরিয়া আবার উপসম্পদার জন্য আসিলে তাহাকে দোষের কথা বলা হইত। পুনঃপুনঃ দোষস্বীকার ও শাস্তিগ্রহণ না করিলে তাহাকে বহিষ্কার করা হইত। একজনকে উপসম্পদা দানের সময়ে ভিক্ষু কাশ্যপ আনন্দকে পাঠ পড়িতে বলিলে পাঠের মধ্যে উপসম্পদা-

দাতার নাম করিতে হয় বলিয়া আনন্দ বলিলেন "স্থবির কাশ্যপ বয়সে আমার অনেক বড়, আমি তাঁহার নাম করিতে পারিব না"। বুদ্ধ শুনিয়া বলিলেন উপসম্পদা-পাঠের সময়ে উপাধ্যায়কে গোত্রনামেও অভিহিত করা যাইবে।

এইরূপ আরও বহু ঘটনা ও সেই সেই সম্পর্কে প্রবর্তিত বিবিধ নিয়মের কথা উল্লিখিত আছে। এই সবেতেই দেখা যায় বুদ্ধ কিরূপ উদার বিবেচক কোমল ও করুণচিত্ত ছিলেন এবং সকলকে কর্তব্যপালনের পূর্ণ সুযোগ দিতে ও শিষ্যদের সকল অসুবিধা নিবারণ করিতে চাহিতেন। তিনি ক্ষমাশীল হইলেও অন্যায়কারীকে তীব্র ভৎর্সনা করিতেন। বহু ঘটনায় দেখা যায় তিনি নির্বোধ ও দুষ্টদের প্রায়ই 'মোঘপুরুষ' বলিয়া সম্বোধন করিতেন—সে যুগে অপদার্থ, অমনুষ্য প্রভৃতি অর্থে বোধহয় এই আখ্যাই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইত। আরও দেখা যায় তিনি কাহাকেও ভৎর্সনার সময়ে প্রায়ই বলিতেন "ইহা অন্যায়, অনুচিত ও শ্রমণের অনুপযুক্ত।" অন্যায় কার্য সম্বন্ধে তিরস্কারের সময়ে তিনি আরও বলিতেন "ইহাতে অপ্রসন্নেরাও প্রসন্ন হইবে না, প্রসন্নদেরও সংখ্যাবৃদ্ধি হইবে না"। ইহাতে বুঝা যায় লোকমতের প্রতি তাঁহার প্রখর দৃষ্টি ছিল।

বোধিলাভের পর উরুবিল্ব হইতে ঋষিপত্তনে যাইবার পথে উপক নামক যে আজীবিকের সহিত বুদ্ধের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, সেই উপক এক বনে তপস্যা করিবার সময়ে প্রত্যহ চাপা নাম্নী এক ব্যাধকন্যার দর্শনে মদনকাতর হইয়া গুহায় পড়িয়া রহিল। ব্যাধ তাহাকে কয়েকদিন না দেখিতে পাইয়া তাহার অন্বেষণে গুহায় আসিয়া ব্যাপার শুনিয়া কন্যার সম্মতিক্রমে উভয়ের বিবাহ দিল এবং উপক তপস্যা ছাড়িয়া ব্যাধবৃত্তি আরম্ভ করিল। কিছুদিন পরে উপকের একটি পুত্র জন্মিল। চাপার বোধহয় পতিসন্তোষ হয় নাই—ছেলেটি কাঁদিলে চাপা তাহাকে বলিত "ওরে উপকের ছেলে, সন্ন্যাসীর ছেলে, ব্যাধের ছেলে, কাঁদিস্ না, কাঁদিস্ না!" উপক ইহাতে অপমান বোধ করিয়া বুদ্ধের নিকট গিয়া সংঘে প্রবেশ করিল। চাপাও পরে ভিক্ষুণী হইয়াছিল।

তিষ্য নামক বুদ্ধের এক পিস্তুতো ভাই বৃদ্ধবয়সে ভিক্ষু হইয়াছিলেন—স্থূলদেহ ছিলেন বলিয়া সংঘে ইঁহার নাম ছিল 'স্থূল তিষ্য'। ইনি পর্যাপ্ত

আহারাদি করিয়া সুবেশ পরিয়া সভাগৃহের মাঝখানে বসিয়া থাকিতেন। নবাগত কয়েকজন ভিক্ষু তাঁহাকে কোনও মহাস্থবির মনে করিয়া তাঁহার পদসেবা করিতে চাহিলে তিনি কোনও উত্তর না দেওয়ায় তাহাদের মধ্যে এক তরুণ জিজ্ঞাসা করিল তিষ্য কতদিন সংঘে প্রবেশ করিয়াছেন এবং তিনি সম্প্রতি সংঘে প্রবেশ করিয়াছেন শুনিয়া অপরের সেবা গ্রহণ করার জন্য তরুণভিক্ষু তিষ্যকে বিদ্রূপ করিয়া হাতে তুড়ি দিল। তিষ্য ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া "জানিস্ আমি ক্ষত্রিয়, তোদের সবংশে ধ্বংস করিব" বলিয়া শাসাইয়া বুদ্ধের কাছে অভিযোগ করিলেন। বুদ্ধ তিষ্যকে ভিক্ষুদের নিকট ক্ষমা চাহিতে বলিলেন কিন্তু পুনঃপুনঃ বলায়ও তিষ্য ক্ষমা চাহিলেন না। ফলে কি হইল, শাস্ত্রে লিখিত নাই। এরূপ আরও কয়েকটি ঘটনায় দেখা যায় তাঁহার আত্মীয় ব্যক্তিরা অন্যায় করিলে বুদ্ধ তাহাদের দোষ ঘোষণা করিয়া ক্ষমা চাহিতে ও শাস্তিগ্রহণ করিতে বলিতেন কিন্তু তাহারা না শুনিলে বহিষ্কার পর্যন্তের আজ্ঞা দিতেন না। বহিষ্কৃত না হইলেও অবশ্য ইহাতেই সেইরূপ ব্যক্তিরা সংঘের নিকট অপদস্থ হইয়া থাকিত—ইহাতে শাস্তির উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হইত, বুদ্ধের সহিত অপরাধীর আত্মীয়তা বোধেরও অবমাননা হইত না। ইহাতে বুদ্ধের কোমলতা বুঝা যায়।

এক আজীবিক এক গৃহে ভিক্ষা পাইত। গৃহিনী বুদ্ধের উপদেশ শুনিতে যাইবার ইচ্ছা করে জানিয়া আজীবিক তাহাকে নিষেধ করিল কিন্তু গৃহিনী লোকমুখে একদিন বুদ্ধকে আহারের নিমন্ত্রণ করিল। গৃহিনীর পুত্র যখন বুদ্ধকে আহারপ্রস্তুতের সংবাদ দিতে যাইতেছে তখন আজীবিক পুত্রকে শিখাইয়া দিল সে যেন বুদ্ধকে ভুল পথে লইয়া যায়, তাহাতে পুত্র ও আজীবিক উভয়েরই ভাগ বাড়িবে! আজীবিক পরে আহারার্থে আসিয়া বুদ্ধকে আহারে উপবিষ্ট দেখিয়া গৃহিনীকে গালাগালি করিয়া অন্যত্র চলিয়া গেল। অন্য লোকের অন্যায় গ্রাহ্য না করিয়া নিজদোষ দূর করাই উচিত, এই বলিয়া বুদ্ধ দুঃখিতা নারীকে প্রবোধ দিয়াছিলেন।

এক ব্যাধ প্রত্যহ প্রাতঃকালে রাজগৃহে মৃগমাংস বিক্রয় করিতে আসিত। এক ধনীকন্যা তাহার সুগঠিত দেহ দেখিয়া দাস পাঠাইয়া খোঁজ লইয়া গোপনে গৃহত্যাগ করিয়া ব্যাধের সহিত মিলিত হইয়া তাহার পত্নীরূপে বনে বাস করিতে লাগিল। একদিন ব্যাধের জালে কোনও পশু না

পড়ায় ব্যাধ ভাবিল কেহ বোধহয় লুকাইয়া জালবদ্ধ পশুদের ছাড়িয়া দিতেছে। খুঁজিতে খুঁজিতে এক ঝোপের আড়ালে ধ্যানস্থ বুদ্ধকে দেখিয়া ব্যাধ ধনুতে তীর লাগাইয়া বুদ্ধকে মারিবার উদ্যোগ করিতেছে এমন সময়ে তাহার স্ত্রী আসিয়া ব্যাপার দেখিয়া বলিল "আমার বাবাকে মারিও না।" ব্যাধ পরে সস্ত্রীক বুদ্ধের ভক্ত হইয়াছিল।

এক ভিক্ষু এক গৃহস্থপত্নীর গৃহে ভিক্ষা পাইত। স্ত্রীলোকটি বুদ্ধের উপদেশ শুনিতে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় ভিক্ষু তাহাকে নিষেধ করিল, কারণ বুদ্ধের উপদেশ শুনিলে ভিক্ষুর প্রতি আর নারীব তত ভক্তি থাকিবে না! নিষেধ না মানিয়া নারী বুদ্ধের কাছে গেলে ভিক্ষু রাগতভাবে বুদ্ধকে বলিল তিনি যেন এই অল্পবুদ্ধি নারীর পক্ষে বোধগম্য হয় এরূপ সাদাসিধা উপদেশ দেন (অর্থাৎ তিনি বেশি উপদেশ দিলে তাঁহার তুলনায় ভিক্ষুর জ্ঞানন্যূনতা ধরা পড়িয়া যাইবে)! ভিক্ষুর মনোভাব বুঝিতে পারিয়া বুদ্ধ তাহাকে ভৎর্সনা করিয়াছিলেন।

অনাথপিণ্ডদের পুত্র উন্মার্গগামী ও পিতার অবাধ্য ছিল। অনাথপিণ্ডদ পুত্রকে বলিয়াছিলেন সে যদি প্রত্যহ বুদ্ধের কাছে গিয়া একটি ধর্মশ্লোক শিক্ষা করে তবে তিনি তাহাকে প্রতিশ্লোকের জন্য সহস্রমুদ্রা দিবেন। ফলে কি হইয়াছিল আখ্যানে নাই, সম্ভবতঃ শ্রেষ্ঠীপুত্রের কোনও মতিপরিবর্তন হয় নাই।

মাতাপিতার আপত্তি সত্ত্বেও এক যুবা প্রব্রজ্যা লইলে মাতাপিতাও পুত্রের সঙ্গে থাকিবার জন্য প্রব্রজ্যা লইল এবং তিনজনে সর্বদা একত্র গল্পগুজব করিয়া কাটাইত। ভিক্ষুরা ইহাতে বিরক্ত হইয়া বুদ্ধকে জানাইলে তিনি তাহাদের সাংসারিক ব্যবহারের জন্য মাতাপিতা-পুত্রকে তিরস্কার করিয়াছিলেন।

বুদ্ধের নির্ভয়তা ও বিজিগীষায় একটি কাহিনী প্রসিদ্ধ। এই ঘটনার সময়ে তাঁহার বয়স পঞ্চান্ন বৎসর হইয়াছিল। দস্যু অঙ্গুলিমাল কোশলরাজ্যে লুণ্ঠন ইত্যাদি বহু উপদ্রব করিতেছিল, নিহত ব্যক্তিদের হাতের আঙ্গুল কাটিয়া মালার মত গলায় পরিত বলিয়া তাহার ঐ নাম হয়। রাজা প্রসেনজিৎ সৈন্য পাঠাইয়াও দস্যুকে ধরিতে পারিলেন না। বুদ্ধ একবার বলিলেন, যে বনে অঙ্গুলিমাল থাকে তিনি সেই বনের মধ্য দিয়া যাইবেন,

শিষ্যগণ নিষেধ করিলেও তিনি শুনিলেন না। গভীর বনের মধ্যে অঙ্গুলিমাল সম্মুখে আসিয়া তাঁহাকে থামিতে বলিলে বুদ্ধ না থামিয়া বলিলেন "আমি তো থামিয়াই আছি, তুমিই থাম।" যাহাকে লোকে এত ভয় করিত, সে এরূপ তাচ্ছিল্যে কিছু বিস্মিত হইয়া বুদ্ধের কথার অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে বুদ্ধ বলিলেন তিনি অহিংসাধর্মে স্থির আছেন কিন্তু সে তাহা নাই। বোধহয় উভয়ে আরও বাক্যবিনিময়ের ফলে দস্যু বুদ্ধের শিষ্য হইয়া দস্যুবৃত্তি ত্যাগ করিয়া তাঁহার সঙ্গে চলিল। কিরূপ ব্যক্তিকে বশীভূত করিয়াছেন, সম্ভবতঃ তাহা লোককে দেখাইবার জন্য বুদ্ধ অঙ্গুলিমালকে সঙ্গে লইয়া কয়েকস্থান ঘুরিয়া শ্রাবস্তীতে আসিলেন। প্রসেনজিৎও সম্ভবতঃ ইহা শুনিয়া কৌতূহলী হইয়া জেতবনে আসিলেন (উপাখ্যানে আছে তিনি ইহা জানিতেন না, কিরূপে অঙ্গুলিমালকে ধরা যায় সেই বিষয়ে পরামর্শের জন্য তিনি বুদ্ধের কাছে আসিয়াছিলেন)। রাজার উদ্বিগ্নমূর্তি দেখিয়া বুদ্ধ রহস্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন রাজাকে অত উদ্বিগ্ন দেখাইতেছে কেন? বিম্বিসার বা লিচ্ছবিগণ বা অন্য কোনও রাজা কি তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যোগ করিতেছেন? প্রসেনজিৎ তখন অঙ্গুলিমালের কথা বলিলে বুদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন তাহাকে সেখানে দেখিলে রাজা কি করিবেন? রাজা বলিলেন "ভদন্ত, আমি তাহাকে সম্মান দেখাইব"। অঙ্গুলিমাল সেখানেই বসিয়াছিল, কিন্তু রাজা তাহা জানিতেন না। বুদ্ধ সন্নিকটে উপসিষ্ট অঙ্গুলিমালকে দেখাইয়া দিলে ঘোরকর্মা দস্যুর অতর্কিত সান্নিধ্যে প্রসেনজিৎ থরথর কম্পমান হইলেন, তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইল। পাছে দস্যু তাঁহাকে হঠাৎ আক্রমণ করে, বোধহয় এই ভয়ে প্রসেনজিৎ তাহাকে আহারবস্ত্রগৃহাদি দিতে চাহিলে অঙ্গুলিমাল বলিল তাহার তিনখণ্ড বস্ত্র আছে, আর কিছুরই প্রয়োজন নাই।

অঙ্গুলিমাল একবার ভিক্ষায় বাহির হইয়া প্রসববেদনা-কাতরা এক নারীকে পথপার্শ্বে দেখিয়া বুদ্ধকে জানাইল। বুদ্ধ তাহাকে নারীর নিকটে গিয়া বলিতে বলিলেন যে, অঙ্গুলিমাল কখনও কাহারও কোনও অনিষ্ট করে নাই, সে বলিতেছে নারীর যাতনার উপশম হউক। অঙ্গুলিমাল বলিল একথা বলিলে তাহার পক্ষে মিথ্যা বলা হইবে। তখন বুদ্ধ তাহাকে বলিতে বলিলেন যে, সংঘপ্রবেশের পর সে কাহারও অনিষ্ট করে নাই। অঙ্গুলিমালের এই উক্তিতে নাকি নারীর যাতনা দূর হইল। বলা বাহুল্য

বুদ্ধের উদ্দেশ্য ছিল অঙ্গুলিমালের মনে অহিংসাভাবের প্রতি শ্রদ্ধা-উদ্দীপন করা।

বৃজিবংশীয় এক রাজপুত্র ভিক্ষু হইয়াছিল। রাত্রে বৈশালীনগরীতে উৎসববাদ্য শুনিয়া উৎসবে যোগদান করিতে না পারার দুঃখে তাহার মনে ভিক্ষু হইবার জন্য অনুশোচনা হইল। পরদিন প্রাতে বুদ্ধকে একথা জানাইলে তিনি তাহাকে সংসার-দুঃখকষ্টের কথা স্মরণ করাইয়াছিলেন।

এক ব্রাহ্মণ যোগবলে নাভি হইতে জ্যোতি বাহির করিতে পারিত। সে বা বুদ্ধ কে বড়, ইহা লইয়া ভিক্ষুদের সহিত ব্রাহ্মণের তর্ক হইলে ব্রাহ্মণ বুদ্ধকে নাভিজ্যোতি দেখাইতে যতবার গন্ধকুটির চৌকাঠ পার হইল ততবার তাহার জ্যোতি নির্বাপিত হইল, বাহিরে আসিলেই আবার জ্যোতি প্রদীপ্ত হইল। ব্রাহ্মণ ভাবিল বুদ্ধের কোনও শক্তিশালী মন্ত্র জানা আছে, মন্ত্রটি শিক্ষার জন্য ব্রাহ্মণ বুদ্ধকে ধরিয়া পড়িল। বুদ্ধ বলিলেন তাঁহার শিষ্য হইলে তিনি মন্ত্র শিখাইবেন। ব্রাহ্মণ তখন সংঘে প্রবেশ করিল। বোধহয় নন্দের অপ্সরালাভের মত ব্রাহ্মণের মন্ত্রশিক্ষা আর হইয়া উঠে নাই। অপর এক ব্রাহ্মণ নরকপাল ঠুকিয়া বলিতে পারিত মৃতকের স্বর্গ বা নরক কোথায় গতি হইয়াছে। শক্তি দেখাইবার জন্য বুদ্ধের কাছে গেলে তিনি পাঁচটি নর-কপাল সাজাইয়া তাহাদের কাহার কি গতি হইয়াছে বলিতে বলিলেন। ব্রাহ্মণ বলিল একজনের স্বর্গ, একজনের নরক, একজনের নরজন্ম ও একজনের পশুজন্ম-লাভ হইয়াছে, কিন্তু পঞ্চমের কথা সে কিছু বলিতে না পারায় বুদ্ধ বলিলেন তিনি উহাও বলিতে পারেন, উহার অর্হত্ত্বলাভ হইয়াছে। ব্রাহ্মণ এই অধিকতর কপালবিদ্যা লাভের আশায় তাঁহার শিষ্য হইয়াছিল।

ভিক্ষুরা নগরে বা পথেঘাটে কোনও বিষয় দেখিয়া কিছু আলোচনা করিতেছে শুনিলে বুদ্ধ প্রায়ই জিজ্ঞাসা করিতেন "ভিক্ষুগণ, তোমরা কি আলোচনা করিতেছ?" সেই উপলক্ষ্যে তিনি নানা দৃষ্টান্ত কাহিনী প্রভৃতিও বলিতেন—ইহার মধ্যে অনেক কথা তাঁহার বা অপরের পূর্বপূর্ব জীবনের কাহিনীরূপে শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। বাজে কথার আলোচনা শুনিলে তিনি সেই প্রসঙ্গে ভিক্ষুদের মন উচ্চতর বিষয়ে নিযুক্ত করিবার চেষ্টা করিতেন।

ভিক্ষুরা একবার পথযাত্রান্তে নানাস্থানের বেলে আঠাল প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার মাটি সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিল। বুদ্ধ বলিয়াছিলেন "এসব

জমি বাহিরের, তোমাদের উচিত ভিতরের মন-জমি পরিষ্কার করা।" ভিক্ষুরা একবার নগরের পথে বৃষ্টির মধ্যে বিচারশালায় আশ্রয় লইয়া বিচারপতি মহামাত্ররা অর্থ লইয়া একের সম্পত্তি অন্যকে দিতেছেন দেখিয়া স্থির করিল ইঁহারা অধার্মিক। বুদ্ধ শুনিয়া বলিলেন "যাহারা যথেচ্ছ নিষ্পত্তি করে তাহাদের বিচারপতি নাম দেওয়া অন্যায়"।

এক ভিক্ষু পূর্বে হাতি চালাইত। এক মাহুত হাতিকে বশে আনিতে পারিতেছে না দেখিয়া সে ভিক্ষুদের বলিল হাতির দেহের অমুক অমুক স্থানে অঙ্কুশ মারিলে হাতিকে বশ করা যায়, মাহুত তাহা শুনিয়া সেইরূপ করিয়া হাতিকে বশে আনিল। বুদ্ধ শুনিয়া ভিক্ষুকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিলেন নিজেকে বশে আনাই তাহার পক্ষে যথেষ্ট হইবে। লোকটি বোধহয় নিজের কর্তব্য না করিয়া অপরের উপর শিক্ষকতা করিতে ভালবাসিত। একটি হাতি কাদায় পড়িয়া উঠিতে না পারায় মাহুত মাথায় রণসাজ পরিয়া হাতির কানের কাছে রণবাদ্য বাজাইলে হাতি প্রবলবিক্রমে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া কাদা হইতে উঠিয়া পড়িয়াছিল। বুদ্ধ শুনিয়া ভিক্ষুদিগকে এইরূপ বিক্রমে ইন্দ্রিয়সুখকর্দম হইতে মুক্তিলাভের উপদেশ দিয়াছিলেন। ভিক্ষুরা এক বন্দীশালার পাশ দিয়া যাইবার সময়ে দৃঢ়বদ্ধ বন্দীদের দেখিলে বুদ্ধ বলিয়াছিলেন তৃষ্ণাই মানুষের দৃঢ়তম বন্ধন।

স্থবির কাশ্যপের এক সার্দ্ধবিহারিক কাজে ফাঁকি দিত। সে একবার স্থবিরের নামে আহার্য লইয়া নিজে খাইল এবং কাশ্যপ এজন্য তিরস্কার করায় সে তাঁহার কুটিরে আগুন লাগাইয়া দিয়াছিল। এক ভিক্ষুর সহিত এক ব্যাধের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। ব্যাধ সেদিন কোনও শিকার না পাইয়া ভিক্ষুর জন্যই এরূপ হইয়াছে মনে করিয়া ভিক্ষুর উপর কুকুর লেলাইয়া দিল। ভিক্ষু আত্মরক্ষার জন্য গাছে উঠিলে ব্যাধ তাহার পায়ে তীর মারিতে লাগিল, পা বাঁচাইতে গিয়া ভিক্ষুর চীবর খসিয়া নীচে ব্যাধের উপর পড়িল। চীবরাচ্ছন্ন ব্যাধকে ভিক্ষু মনে করিয়া কুকুর ব্যাধের উপরে পড়িয়া ব্যাধকে মারিয়া ফেলিল। ভিক্ষু অনুতপ্ত হইয়া বুদ্ধকে ইহা জানাইলে তিনি বলিয়াছিলেন ব্যাধের মৃত্যুতে ভিক্ষুর কোনও দোষ হয় নাই। এক লোভী ভিক্ষু স্থান হইতে স্থানান্তরে গিয়া চীবর সংগ্রহ করিত। দুইটি চীবর ও একটি দামী কম্বল ভাগ করা লইয়া অপর দুই ভিক্ষু বিবাদ

করিতেছে দেখিয়া এই ভিক্ষু বিবাদ মিটাইবার ভাণ করিয়া দুইজনকে এক একখানি চীবর দিয়া কম্বলটি আত্মসাৎ করিল। আর এক ভিক্ষু অপরকে রাত্রে জাগিয়া ধ্যানাভ্যাসের উপদেশ দিয়া নিজে সারারাত্র ঘুমাইত। এক ভিক্ষুর ধারণা ছিল সে খুব ভাল ধর্মব্যাখান করিতে পারে কিন্তু ব্যাখান করিতে গেলে কিছুই পারিত না। তাহার শ্রোতারা একবার তাহাকে লাঠি লইয়া তাড়া করিলে সে পলাইতে গিয়া খানায় পড়িয়া গিয়াছিল।

এক ভিক্ষু এক স্থবিরকে ভিক্ষাংশ দিল কিন্তু স্থবির কোনও কৃতজ্ঞতাবাক্য না বলিয়া চলিয়া গেলেন। বুদ্ধ শুনিয়া বলিলেন "যে কাকের মত নির্লজ্জ বা দাম্ভিক বা চক্ষুলজ্জাহীন বা নীচ, তাহার পক্ষে জীবন সহজ কিন্তু যে বিনয়ী ও শুদ্ধাচারী তাহার পক্ষে জীবন কঠিন"। এক শ্রমণের ভিক্ষায় যাহা পাইত তাহারই নিন্দা করিয়া নিজগৃহের বিত্তসম্পত্তির বড়াই করিত। ভিক্ষুরা কয়েকজন শ্রমণেরকে ঐ নিন্দুক শ্রমণেরের গ্রামে পাঠাইয়া খবর লইয়া জানিল উহার পিতা দ্বারপালের কাজ করে। বুদ্ধকে একথা জানাইলে তিনি সেই শ্রমণেরকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিলেন "যে অহংকারী ও দোষদর্শী তাহার ধ্যান ও প্রজ্ঞা লাভ হয় না, কিন্তু যে নিজে কর্তব্যপরায়ণ সে অন্যের ত্রুটি দেখাইয়া দিলে তাহাকে দোষধরা বলা যায় না"। এক শ্রমণের বুদ্ধের নিকট হইতে চলিয়া যাইতেছিল এমন সময়ে বুদ্ধ ভিক্ষুদের জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমরা একজন স্থবিরকে যাইতে দেখিয়াছ কি?" ভিক্ষুরা বলিল তাহারা একজন শ্রমণেরকে যাইতে দেখিয়াছে।

"সে শ্রমণের নহে, সে স্থবির,"

"ভদন্ত, তাহাব তো বয়স অল্প,"

"বয়স হইলেই বা স্থবিবের আসনে বসিলেই আমি লোককে স্থবির বলি না। যে সত্য বুঝে ও অন্যের প্রতি করুণা দেখায় সেই প্রকৃত স্থবির।"

কয়েকজন স্থবির কয়েকটি তরুণভিক্ষু ও শ্রমণেরকে তাহাদের উপাধ্যায়দের চীবর রঙাইতে দেখিয়া পরস্পর বলিলেন "আমরা এত ভাল বাক্‌বিন্যাস করিতে পারি কিন্তু অন্যে তো আমাদের এত কাজ করিয়া দেয় না!" তাঁহারা বুদ্ধের কাছে প্রস্তাব করিলেন যে, অন্যের নিকট শিক্ষাধীন থাকিলেও ধর্মবাচনা করিবার পূর্বে তরুণ ভিক্ষুগণ যেন তাঁহাদের নিকট থাকিয়া উন্নতি

লাভ করে কারণ তাঁহারা ধর্মব্যাখ্যানে সুপটু। বুদ্ধ বলিলেন "তোমরা বাক্‌পটু বলিয়াই যে আমি তোমাদের দক্ষ মনে করি তাহা নহে; যাহার সকল দোষ দূর হইয়াছে সেই যথার্থ দক্ষ"। এক ভিক্ষু নিজেকে অতি বুদ্ধিমান মনে করিয়া সকলের সহিত তর্ক করিত এবং হারিয়া গিয়া প্রতিপক্ষকে অমুক দিন অমুক স্থানে আসিয়া পুনরায় তাহার সহিত তর্কে আহ্বান করিত কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই সেখানে উপস্থিত হইয়া লোককে ডাকিয়া বলিত প্রতিপক্ষ যখন আসিল না তখন বুঝিতে হইবে প্রতিপক্ষ পরাজয় স্বীকার করিতেছে। বুদ্ধ জানিতে পারিয়া তাহাকে বলিলেন "শুধু মাথা মুড়াইলেই ভিক্ষু হয় না, ভিক্ষুকে সদা সত্যবাদী হইতে হইবে"। নিমন্ত্রিত হইয়া আহারের পর চলিয়া আসিবার সময়ে ভিক্ষুদের নিমন্ত্রণ-কর্তাকে ধন্যবাদজ্ঞাপক কোনও কথা বলিবার প্রথমে নিয়ম ছিল না। ইহাতে লোকে অসন্তুষ্ট হওয়ায় বুদ্ধ ধন্যবাদজ্ঞাপনের নিয়ম করিলেন। অন্য সম্প্রদায়ের লোকে বলিতে লাগিল "ভিক্ষুরা ধন্যবাদ জানাইতে দীর্ঘ বক্তৃতা করে, আমরা মুনি বলিয়া মৌন থাকি"। বুদ্ধ শুনিয়া বলিলেন "মৌন থাকিলেই মুনি হয় না। নিশ্চয়তার অভাব ও অন্যকে কিছু জানিতে দিতে কার্পণ্য, এগুলিও মৌনের কারণ হইতে পারে"। ভিক্ষু পোঠিল খুব ধর্মব্যাখান করিত কিন্তু বুদ্ধ তাহাকে বলিলেন সে আত্মোন্নতির প্রয়াস মোটেই করে না। তিনি তাহাকে দেখিলেই বলিতেন "তুচ্ছ পোঠিল, এস"; "তুচ্ছ পোঠিল, বস"; "তুচ্ছ পোঠিল, নমস্কার কর" প্রভৃতি। ইহাতে চৈতন্যোদয় হইয়া সে আত্মোন্নতিসাধনে যত্নবান হইল।

প্রত্যন্তদেশের একস্থানে কয়েক ভিক্ষু বর্ষাবাস করিয়াছিল। সে গ্রামের লোক গ্রাম সুরক্ষিত করিতে ব্যস্ত থাকায় ভিক্ষুদের কোনও খবর লয় নাই। ভিক্ষুরা পরে একথা বুদ্ধকে জানাইলে তিনি বলিলেন "সুখে থাকা সকল সময়ে হইয়া উঠে না এবং তাহাতে বিশেষ কিছু যায় আসেও না; গ্রামের লোক যেমন গ্রাম সুরক্ষিত করিতেছিল, তোমাদের উচিত সেইরূপ নিজেদের সুরক্ষিত করা"। কয়েকটি তরুণ ভিক্ষু গ্রামের তরুণীদের নিকট পুষ্পাভরণাদি পাঠাইত ও তাহাদের সহিত গীতবাদ্যাদি অমোদপ্রমোদে যোগ দিত। বুদ্ধ শুনিতে পাইয়া সারিপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়নকে পাঠাইয়া এই ভিক্ষুদের অন্যত্র সরাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এক গৃহস্থ এক ভিক্ষুকে খাইতে দিত

এবং অপরদের নিমন্ত্রণ করিলে সেই ভিক্ষুর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করিত। একবার কয়েকজন স্থবির সেই গ্রামে আসিলে গৃহস্থ প্রথমে স্থবিরদের ও পরে ভিক্ষুকে নিমন্ত্রণ জানাইল, কিন্তু ভিক্ষু ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া নিমন্ত্রণ অস্বীকার করিল। পরদিন ভিক্ষু ভাবিল গিয়া দেখিবে স্থবিরদের কি খাইতে দেওয়া হয়। আহার্য দেখিয়া সে বলিল সবই ঠিক হইয়াছে, তবে তিলের নাড়ু হয় নাই। গৃহস্থ বলিল "বহুদিন পূর্বে দক্ষিণাপথের কয়েকজন বণিক পূর্বদেশে গিয়া একটি কুক্কুটী আনিয়াছিল। একটি কাকের সহিত মিলনে কুক্কুটীর শাবক জন্মিল। শাবক যখনই কাকের ডাক ডাকিতে যাইত তখনই কুক্কুটের ডাক বাহির হইত এবং যখনই কুক্কুটের ডাক ডাকিতে যাইত তখনই কা-কা রব বাহির হইত। সেইরূপ বুদ্ধবচনে বহু রত্ন থাকিলেও এই ভিক্ষু মুখ খুলিলেই 'তিলের নাড়ু' ছাড়া আর কিছু শুনা যায় না।" ভিক্ষু ইহাতে রাগিয়া শ্রাবস্তীতে গিয়া বুদ্ধকে জানাইলে বুদ্ধ ভিক্ষুকে গৃহস্থের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিতে বলিয়াছিলেন।

দুই বিদ্বান ব্রাহ্মণভ্রাতা ভিক্ষু হইয়া বুদ্ধের নিকট প্রস্তাব করিয়াছিল যে তাঁহার উপদেশাবলী যাহাতে বিভিন্ন জাতির লোকের হাতে বিকৃত না হয় সেজন্য তাহারা উহা সংস্কৃতভাষায় রূপান্তর করিবে। বুদ্ধ তিরস্কার করিয়া বলিলেন ইহা করিবার কোনও প্রয়োজন নাই, প্রত্যেকেই নিজ নিজ ভাষায় তাঁহার শিক্ষা গ্রহণ করিবে। বুদ্ধ একবার উপদেশ দিবার সময়ে হাঁচিলে সমবেত ভিক্ষুরা সমস্বরে "ভগবান বুদ্ধ দীর্ঘজীবী হউন, ভগবান বুদ্ধ দীর্ঘজীবী হউন" বলিয়া বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল এবং ইহাতে উপদেশের বাধা হইল। বুদ্ধ বলিলেন "ভিক্ষুগণ, কেহ হাঁচিলে লোকে যদি বলে 'দীর্ঘজীবী হও', তাহাতেই কি তাঁহার দীর্ঘজীবন বা মৃত্যু হয় ?" ভিক্ষুদের স্বীকার করিতে হইল যে তাহা হয় না। তখন বুদ্ধ এরূপ বলা নিষেধ করিয়া দিলেন। ভিক্ষুরা হাঁচিলে লোকে স্বস্তিবচন বলিলে ভিক্ষুরা ইহার পর চুপ করিয়া থাকিত, লোকে ইহাতে অসন্তুষ্ট হইত। ইহা জানিতে পারিয়া বুদ্ধ বলিলেন "গৃহীগণ মাঙ্গলিকে বিশ্বাস করে, তাহারা স্বস্তিবচন বলিলে তোমাদেরও তাহা বলিতে অনুমতি দিলাম"। ভিক্ষুরা আরামের যেখানে সেখানে মূত্রপুরীষত্যাগ করিয়া অশুচি করিত। ইহাতে বুদ্ধ নির্দিষ্ট শৌচস্থান প্রভৃতির বিবিধ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

বর্ষাবাসের সময়ে বহু ভিক্ষু একত্র বাসের ফলে তাহাদের মধ্যে নানারূপ বিসম্বাদের সৃষ্টি হইত। একবার কয়েক ভিক্ষু একত্র বর্ষাবাসের সময়ে কয়েকটি নিয়ম পালন করিবে স্থির করিল, তাহার মধ্যে একটি নিয়ম ছিল পরস্পরের সহিত কথা না বলা। নিয়মগুলি পালনের ফলে বর্ষাবাসের সময়ে তাহাদের মধ্যে কোনও অশান্তির সৃষ্টি হইল না। বর্ষান্তে বুদ্ধের সহিত সাক্ষাতের জন্য আসিলে বুদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন বর্ষাবাস তাহাদের কিরূপ কাটিয়াছে এবং শান্তিতে কাটিয়াছে শুনিয়া বোধহয় কিছু বিস্মিত হইয়া—কারণ এরূপ প্রায়ই ঘটিত না—জিজ্ঞাসা করিলেন কিরূপে তাহা সম্ভব হইল। ভিক্ষুরা তাহাদের পালিত নিয়মগুলির কথা বলায় বুদ্ধ অন্যদের বলিলেন "ভিক্ষুগণ, এই অমনুষ্যেরা শান্তিতে কাটাইয়াছে মনে করিতেছে কিন্তু বস্তুতঃ অন্যায়ভাবে কাটাইয়াছে—ইহারা 'গরুভেড়ার পালের মত কাটাইয়াছে! তৈর্থিকদের (নিগ্রন্থাদি অন্য সম্প্রদায়) মত ইহারা মৌনব্রত কি করিয়া গ্রহণ করে? ভিক্ষুগণ, আমি নিষেধ করিতেছি তোমরা মৌনব্রত গ্রহণ করিতে পারিবে না।" বুদ্ধপুত্র রাহুল একবার রাত্রে উপস্থিত হইয়া কোথাও স্থান না পাইয়া বুদ্ধের শৌচকুটিরে রাত্র কাটাইয়াছিল। বুদ্ধ প্রত্যূষে সেখানে প্রবেশের সময়ে রাহুল জাগিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিয়াছিল।

সারিপুত্র, মৌদ্গল্যায়ন ও আনন্দ

পূর্বে বলা হইয়াছে সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন সদ্বংশজাত অবস্থাপন্ন-গৃহস্থসন্তান ছিলেন। উভয়েই পণ্ডিত ও বুদ্ধিমান এবং ধর্মপ্রচার ও সংঘ-শাসনাদি বিষয়ে বুদ্ধের প্রধান সহায় ছিলেন। সারিপুত্রে সাত্ত্বিকভাবের এবং মৌদ্গল্যায়নে কিছু রাজসিক ভাবের প্রাধান্য ছিল। সারিপুত্র ধীর শান্ত ও যুক্তিতর্কনিপুণ ছিলেন, মৌদ্গল্যায়ন বিদ্বান ও বুদ্ধিমান হইলেও সব বিষয়ে একটু জোর দেখাইতেন এবং বর্ণিত আছে তিনি 'ইদ্ধি' (ঋদ্ধি, অলৌকিক শক্তিসামর্থ্য) দেখাইতে ভালবাসিতেন। বুদ্ধ বহুবিষয়ে ইঁহাদের উপর নির্ভর করিতেন ও ইঁহাদের পরামর্শে চলিতেন এবং সকল প্রয়োজনীয় কার্যে ইঁহাদের ডাকাইয়া পাঠাইতেন। ইঁহারা বুদ্ধের শুধু শিষ্য নহে, সহকর্মী ছিলেন। আনন্দ বড় ভালমানুষ ছিলেন। কোমলতা সহৃদয়তা প্রভৃতি

হৃদয়বৃত্তি তাঁহার প্রবল ছিল, যদিচ তিনি খুব তীক্ষ্নমেধাবান ছিলেন না। বুদ্ধ আনন্দের সহিত সময়ে সময়ে রহস্যাদিও করিতেন।

একবার বুদ্ধ সারিপুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন অমৃতে শ্রদ্ধার অন্ত হয়, একথা সারিপুত্র মানেন কিনা। সারিপুত্র বলিলেন এ বিষয়ে তিনি বুদ্ধের মতের উপর নির্ভর করেন না। মনে হয় এই প্রশ্নোত্তরে কিছু রঙ্গ ছিল। সারিপুত্র মহাজ্ঞানী ও বুদ্ধের সহকর্মী হইলেও—বুদ্ধ তাঁহাকে প্রায় সমপদস্থের মতই দেখিতেন—বুদ্ধকে অত্যন্ত ভক্তি করিতেন এবং ইহা বুদ্ধের মনঃপূত ছিল না, তাই বোধহয় বুদ্ধ পরিহাস করিয়া বলিতে চাহিয়াছিলেন যে সারিপুত্র যখন নিজেও অমৃত লাভ করিয়াছেন তখন তাঁহার বুদ্ধভক্তি কিছু কম হওয়া উচিত! সারিপুত্রের উত্তরেও হাস্যরস ছিল, তিনি বোধহয় বলিতে চাহিয়াছিলেন যে বুদ্ধকে কতদূর ভক্তি করা উচিত বা না, তাহা তিনি নিজেই স্থির করিবেন। ভিক্ষুরা ইহা না বুঝিয়া সারিপুত্রকে দাম্ভিক ও বুদ্ধের প্রতি ভক্তিহীন মনে করিল। বুদ্ধ তখন বলিলেন সারিপুত্রের কথার অর্থ তাহা নহে, তিনি বলিতেছেন যে তিনি নিজেই ইহা উপলব্ধি করিয়াছেন (অর্থাৎ মুখে যাহাই বলুন, প্রকৃতপক্ষে সারিপুত্র জানেন যে তাঁহার পক্ষে বুদ্ধের প্রতি অতিভক্তির প্রয়োজন নাই)।

সারিপুত্র এত বিনয়ী ছিলেন যে অনিচ্ছায়ও কাহারও মনে বিন্দুমাত্র কষ্ট দিয়াছেন জানিলে অতিকনিষ্ঠেরও নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেন। বুদ্ধ বলিয়াছিলেন সারিপুত্রের মত লোকের পক্ষে ক্রোধ বা বিদ্বেষ পোষণ করা অসম্ভব, সারিপুত্রের মন বিশাল পৃথিবী, ইন্দ্রকীল (নগরদ্বারের সম্মুখস্থ স্তম্ভ বা গৃহদ্বারের সম্মুখস্থ প্রস্তর অথবা দ্বারের চৌকাঠ) বা হ্রদের মত ধীর, আঘাত করিলেও বিচলিত হয় না।

এক গৃহী এক নির্জনবাসী ভিক্ষুর নিকট উপদেশ শুনিতে চাহিলে ভিক্ষু নীরব রহিলেন। তখন গৃহী সারিপুত্রের কাছে গেলেন কিন্তু তাঁহার উপদেশ গৃহীর অতি কঠিন ও দীর্ঘ মনে হওয়ায় গৃহী আনন্দের কাছে গেলেন। আনন্দের উপদেশ তাঁহার অতি সংক্ষিপ্ত মনে হইল। গৃহী বুদ্ধের কাছে গিয়া তাঁহার অসন্তুষ্টির কথা জানাইলে বুদ্ধ বলিলেন লোকে চিরদিনই নীরব, বহুভাষী ও মিতভাষীর কোন না কোনও নিন্দা করে, নিন্দার অতীত কেহই নহে; মূর্খের নিন্দাপ্রশংসায় কিছু যায় আসে না, পণ্ডিতের নিন্দাপ্রশংসাই যথার্থ।

সারিপুত্র এক সাদ্ধবিহারিককে কিছুতেই ধ্যানে চিত্তস্থির করাইতে পারিলেন না। শ্মশানে গলিত শবের বিকার দর্শন প্রভৃতিতেও কিছুতেই সংসার-অনিত্যতা, সকল বস্তুর পরিবর্তনশীলতা প্রভৃতি বিষয়ে তাহার মনঃ হইল না। সারিপুত্র নবীন ভিক্ষুকে বুদ্ধের সমীপে লইয়া গেলে বুদ্ধ প্রশ্ন করিয়া জানিলেন সে স্বর্ণকারপুত্র, স্বর্ণলতার উপর ফুল আঁকার কাজ করিত। বুদ্ধ বুঝিলেন তাহার মন সুকুমার বিষয়ে অভ্যস্ত বলিয়া শবাদি অপবিত্র পদার্থে তাহার চিত্তস্থৈর্য আসিতেছে না, তিনি তাহাকে একটি সদ্যপ্রস্ফুটিত পদ্ম সম্মুখে রাখিয়া অনিত্যতাধ্যান করিতে বলিলেন—ধীরে ধীরে পদ্মের বিবর্ণতা অবশতা ও শুষ্কতা-প্রাপ্তি দেখিয়া ভিক্ষুর সকল পদার্থের নশ্বরতার জ্ঞান জন্মিল।

সারিপুত্রের ক্রোধ নাই শুনিয়া এক ব্রাহ্মণ তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য পিছন হইতে তাঁহাকে আঘাত করিল কিন্তু সারিপুত্র গ্রাহ্য করিলেন না। ব্রাহ্মণ ইহাতে প্রীত হইয়া সারিপুত্রকে আহারের নিমন্ত্রণ করিল। সারিপুত্রকে আঘাত করিবার জন্য ভিক্ষুরা ব্রাহ্মণের নিন্দা করিলে সারিপুত্র তাহাদের ব্যাপার বুঝাইলেন। বুদ্ধ শুনিয়া বলিয়াছিলেন, যে অপরকে আঘাত করে সে ব্রাহ্মণই নহে। ভিক্ষু অশ্বজিতের নিকটে প্রথমে বুদ্ধের কথা শুনিয়া সারিপুত্র বুদ্ধের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন বলিয়া কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপে সারিপুত্র অশ্বজিতের অভিমুখে ফিরিয়া মাথা নোয়াইয়া নমস্কার করিতেন। ভিক্ষুরা না বুঝিয়া মনে করিল সারিপুত্র বোধহয় দিক্‌পূজা করেন, তাহারা বুদ্ধকে সারিপুত্রের কুসংস্কারের কথা জানাইলে বুদ্ধ তাহাদিগকে সারিপুত্রের মনোভাব বুঝাইয়া দিয়াছিলেন।

সারিপুত্র একবার বুদ্ধপুত্র রাহুলকে সঙ্গে লইয়া নালন্দায় গিয়া মাতৃগৃহে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা যখন আহারে বসিয়াছেন তখন মাতা রূপসারি সংসারত্যাগ করিয়া ভিক্ষু হওয়ার জন্য সারিপুত্রের নির্বুদ্ধিতার নানাবিধ নিন্দা করিলেন—"যেমন বুদ্ধি তাই মাথা মুড়াইয়া নেড়াদের সঙ্গে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছ, চিরদিন ভিক্ষা করিয়াই খাইও!" ইত্যাদি। সারিপুত্র কিছু না বলিয়া নিঃশব্দে আহার সমাপন করিলেন। নালন্দা হইতে ফিরিয়া রাহুল বুদ্ধকে ইহা জ্ঞাপন করিলে বুদ্ধ সারিপুত্রের প্রশংসা করিয়াছিলেন। রূপসারি বোধহয় পুত্রের গৌরব অবশেষে বুঝিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা অনেকদিন পরে। কথিত আছে চালা উপচালা ও শিশু-উপচালা নাম্নী

সারিপুত্রের তিন ভগিনীও ভিক্ষুণী হইয়াছিলেন; শেষ নামদ্বয় সম্ভবতঃ কাল্পনিক হইতে পারে।

বুদ্ধ একবার বৈশালী হইতে শ্রাবস্তীতে যাইবার সময়ে 'ষড়্‌বর্গীয়' ভিক্ষুরা আগে গিয়া সব স্থান অধিকার করিয়া লইল। সারিপুত্র পিছনে আসিতেছিলেন, কেহ তাঁহার জন্য জায়গা ছাড়িয়া না দেওয়ায় সারিপুত্র বৃক্ষতলে রাত্রিযাপন করিলেন। প্রত্যূষে নিদ্রাভঙ্গে উঠিয়া বুদ্ধ কাসিলেন, সারিপুত্রও কাসিলেন। বুদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন "বাহিরে কে?"

"ভদন্ত, আমি সারিপুত্র।"

বুদ্ধ বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "সারিপুত্র, তুমি এখানে বসিয়া আছ কেন?" সারিপুত্র ঘটনা বলিলেন। বুদ্ধ পরে শিষ্যবর্গকে ডাকাইয়া সারিপুত্রকে জায়গা ছাড়িয়া না দিবার জন্য ভর্ৎসনা করিয়া বলিয়াছিলেন সংঘে সারিপুত্রের স্থান শুধু তাঁহারই পরে। সারিপুত্রকে পরে শাস্ত্রে 'ধর্মসেনাপতি' আখ্যায় অভিহিত করা হইত। ইহাতে বুঝা যায় সংঘে তাঁহার পদ ও কার্য কিরূপ ছিল। আর একবার সারিপুত্র গম্ভীররাত্রে আসিয়া পৌঁছিলে তাঁহাকে দেখিয়া ভিক্ষুরা আনন্দে এমন কলরব আরম্ভ করিয়া দিল যে বুদ্ধের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি কুটিরের বাহিরে আসিয়া গণ্ডগোল করার জন্য ভিক্ষুদের এবং সারিপুত্রকেও তিরস্কার করিলেন।

বুদ্ধের কিছু পূর্বেই সারিপুত্রের মৃত্যু হয়, তখন উভয়েই বৃদ্ধ হইয়াছেন। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে সারিপুত্র একবার বুদ্ধের প্রতি ভক্তি প্রকাশ করিয়া ভর্ৎসিত হইয়াছিলেন—শাস্ত্রে ইহা অতি গম্ভীরভাবে বর্ণিত আছে কিন্তু ইহাতেও বোধহয় বুদ্ধের রঙ্গপ্রিয়তা ছিল। সারিপুত্র বলিয়াছিলেন 'ভদন্ত, আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা এরূপ যে আমার মনে হয় আপনার অপেক্ষা জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ কোনও ব্রাহ্মণশ্রমণ নাই, ছিলেন না এবং হইবেনও না;"

"সারিপুত্র, তোমার মুখে বড় বড় কথা শুনা যাইতেছে! তুমি সকল বিষয় সম্পূর্ণ না জানিয়া সিংহনাদ করিতেছ! তাহা হইলে সুদীর্ঘ অতীতে যে অর্হৎ বুদ্ধগণ তথাগতত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তুমি তাঁহাদের সকলকেই জান, তোমার মনদ্বারা তাঁহাদের মন বুঝিয়াছ, তাঁহাদের আচারব্যবহার জ্ঞান ও মত কিরূপ ছিল এবং তাঁহাদের কি গতি হইয়াছে তাহা সবই তুমি জান!"

"না ভদন্ত, তাহা নহে",

"সারিপুত্র, সুদীর্ঘ ভবিষ্যতের যে অর্হৎ বুদ্ধগণ তথাগতত্ব প্রাপ্ত হইবেন তাঁহাদের সকলকেই তবে তুমি নিশ্চয় জান, তোমার মনদ্বারা ......"

"না ভদন্ত, তাহা নহে,"

"সারিপুত্র, তবে তুমি অন্ততঃ আমার মনের সব কথা জান ......"

"না ভদন্ত, তাহাও নহে,"

"সারিপুত্র, তবে দেখিতেছ যে তুমি অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের তথাগতদের সম্পূর্ণ জান না! তবে তুমি কিরূপে ঐরূপ বড় বড় কথা বলিয়া সিংহনাদ করিতেছ?"

কোনওরূপ আতিশয্যই বুদ্ধ ভালবাসিতেন না। এক ভিক্ষু তাঁহার সম্মুখে বসিয়া একদৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত। বর্ষা আরম্ভ হইলে বুদ্ধ এই ভিক্ষুকে অন্যত্র বর্ষাবাসে পাঠাইয়া বলিয়াছিলেন "যে ধর্মকে দেখে, সেই আমাকে দেখে।"

এক ব্রাহ্মণী স্বামীকে আরামে গিয়া চারজন স্থবিরকে আহারের নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া আসিতে বলিলে ব্রাহ্মণ চারজন শ্রমণেরকে লইয়া আসায় ব্রাহ্মণী তাহাদের তাড়াইয়া দিল, ব্রাহ্মণ পুনরায় গিয়া সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়নকে লইয়া আসিল। ইঁহারা আসিয়া শ্রমণেরদের তাড়াইয়া দিবার কথা শুনিয়া নিজেরাও চলিয়া গিয়াছিলেন।

বুদ্ধের চল্লিশ বৎসর বয়সের সময়ে অর্থাৎ যখন তিনি প্রচারব্রত নূতন আরম্ভ করিয়াছেন তখন রাজগৃহের এক গৃহস্থ গঙ্গাস্নানে গিয়া একখণ্ড চন্দনকাঠ পাইয়াছিল। সেই কাঠে একটি ভিক্ষাপাত্র বানাইয়া গৃহস্থ এক অতি উচ্চ বাঁশের খুঁটির মাথায় তাহা বাঁধিয়া প্রচার করিল যে, যে শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ 'ইদ্ধি'-বলে শূন্যে উঠিয়া পাত্রটি নামাইতে পারিবে, সেই উহা পাইবে। সেখানে অনেক লোকসমাগম হইল—সেযুগে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের লোক নিজ নিজ 'ইদ্ধি'র গর্ব করিয়া আত্মসম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠতাপ্রতিপাদনে প্রয়াসী হইত। সমাগতগণের মধ্যে নিগ্রন্থগুরু মহাবীর সম্বন্ধে বৌদ্ধেরা যাহা বর্ণনা করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ সত্য নাও হইতে পারে, কারণ নিগ্রন্থ ও বৌদ্ধদিগের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকায় সে বিবরণ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও ঈর্ষা-প্রসূত হইতে পারে। বৌদ্ধেরা বলিয়াছেন মহাবীর স্বশিষ্যগণকে শিখাইয়া দিলেন যে

তাহারা যেন গৃহস্থের কাছে গিয়া বলে যে সামান্য একটা দ্রব্যের জন্য মহাবীরের মত লোকের কাছে 'ইদ্ধি'-প্রদর্শন দাবি না করিয়া গৃহস্থ যেন অম্‌নিই মহাবীরকে পাত্রটি দান করে। গৃহস্থ ইহাতে সম্মত না হওয়ায় মহাবীর শিষ্যদের সহিত যুক্তি করিলেন যে তিনি খুঁটির নীচে দাঁড়াইয়া যেন শূন্যে উঠিতে যাইতেছেন এরূপ ভঙ্গি করিবেন এবং শিষ্যগণ সামান্য দ্রব্যের জন্য শক্তিপ্রকাশে নিষেধ করিতে করিতে বলপূর্বক যেন তাঁহাকে হাতপা ধরিয়া মাটিতে শোয়াইয়া ফেলে। পরে শিষ্যরা ঘটনাস্থলে সেরূপ করিলে মহাবীর ভূশায়িত অবস্থায় গৃহস্থকে বলিলেন তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহাকে শূন্যে উঠিতে দিতে চাহিতেছে না, অতএব গৃহস্থ যেন পাত্রটি তাঁহাকেই দেয়। কিন্তু গৃহস্থ ইহাতেও ভুলিল না। মৌদ্‌গল্যায়ন ও ভিক্ষু পিণ্ডোল-ভরদ্বাজ সেই পথে যাইতেছিলেন। মৌদ্‌গল্যায়নের কথায় পিণ্ডোল শূন্যে উঠিয়া পাত্রটি নামাইলেন এবং উভয়ে সপাত্র বুদ্ধসমীপে উপস্থিত হইলে বুদ্ধ 'ইদ্ধি'-প্রদর্শনের জন্য পিণ্ডোলকে ভর্ৎসনা করিয়া পাত্রটি ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন প্রয়োজন হইলে তিনি স্বয়ং 'ইদ্ধি' দেখাইবেন, অন্য কোনও ভিক্ষুর দেখাইবার প্রয়োজন নাই। বিম্বিসার ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বুদ্ধ বলিয়াছিলেন রাজার আম-বাগানের ফল একা বিম্বিসারেরই ভোগ্য, অন্যে কি তাহা ভোগ করিতে পারে? কথিত আছে এই ঘটনার চারমাস পরে শ্রাবস্তীতে বহুলোকের সম্মুখে নাকি আকাশে উত্থান, একদিনে আমের আঁটি হইতে গাছ জন্মান, স্বর্গে গমন প্রভৃতি বহু 'ইদ্ধি' দেখাইয়া বুদ্ধ লোককে চমৎকৃত করেন। আরও কথিত আছে এই সময়ে তিনি এক বর্ষা স্বর্গে গিয়া বাস করিয়াছিলেন, ইন্দ্রাদি দেবতা ও তাঁহার জননীর নিকট ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন, ইত্যাদি। তাঁহাকে এই সময়ে নাকি পৃথিবীতে দেখা যায় নাই এবং কিছুদিন পরে তিনি স্বর্গ হইতে ফিরিয়া আবার শিষ্যগণকে দেখা দিয়াছিলেন। মনে হয় প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধ এই বর্ষা কোনও নির্জনস্থানে অজ্ঞাতভাবে একাকী যাপন করিয়াছিলেন।

দ্বাদশ বর্ষার সময়ে দেশে দুর্ভিক্ষ লাগে এবং অশ্বব্যবসায়ীরা ভিক্ষুদের আহার দান করে। মৌদ্‌গল্যায়ন 'ইদ্ধি'-বলে আহার সংগ্রহের কথা বলিলে বুদ্ধ নাকি তাঁহাকে নিষেধ করেন (অর্থাৎ বুদ্ধ নিষেধ না করিলে যেন মৌদ্‌গল্যায়ন অবশ্যই তাহা করিতে পারিতেন, শিষ্যগণ নিষেধ না করিলে মহাবীর যেমন আকাশে উঠিতে পারিতেন!)

ব্রাহ্মণদের প্ররোচনায় বিমলানাম্নী এক রূপজীবিনী মৌদ্‌গল্যায়নের বাসস্থানে আসিয়া তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিবার চেষ্টা করে কিন্তু মৌদ্‌গল্যায়ন তাহাকে তর্জনগর্জন করিয়া বিতাড়িত করেন। রমণী ইহাতে লজ্জিত হইয়া ভিক্ষুণী হইয়াছিল।

শ্রমণদের অনুপস্থিতিতে কেহ তাহাদের বস্ত্রাদি দানে ইচ্ছা করিলে সারিপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়ন তাহা তাঁহাদের নিকট পাঠাইতে বলিয়াছিলেন—ইহাতে ভিক্ষুরা মনে করিল উঁহারা লোভী। বুদ্ধ তাহাদের ভুল বুঝাইয়া দিয়াছিলেন।

আনন্দের বুদ্ধসেবকত্ব

বুদ্ধের জীবনের শেষভাগে আনন্দ তাঁহার পরিচারক ও নিত্যসঙ্গী ছিলেন। আনন্দের সংঘপ্রবেশের সময় হইতেই ইহা হয় নাই। প্রথমে ভিক্ষুরা সুবিধামত পালা করিয়া বুদ্ধের পরিচর্যা করিত কিন্তু ইহাতে সময়ে সময়ে নানা অসুবিধা হইত। পরিচারক ভিক্ষু অনেক সময়ে স্বকর্তব্য বুঝিত না এবং অবাধ্যতাও করিত। বুদ্ধের প্রায় পঞ্চাশ বৎসর বয়সের সময়ে মেঘিয় নামক ভিক্ষু তাঁহার পরিচারকত্ব করে। বুদ্ধের নিষেধ না মানিয়া সে একবার এক আমবাগানে একাকী গিয়া নির্জনে ধ্যানাভ্যাসের চেষ্টা করে কিন্তু তাহার মনে কামেচ্ছা জাগ্রত হয়। আর একবার নাগসমাল নামক ভিক্ষু বুদ্ধের পরিচারক ছিল। পথভ্রমণের সময়ে এক চৌরাস্তায় উপস্থিত হইয়া নাগসমাল বুদ্ধকে বলিল "ভদন্ত, এই দিকে আসুন, আমাদের এই পথে যাইতে হইবে।" বুদ্ধ বলিলেন "নাগসমাল, এই দিকে এস, আমাদের এই পথে যাইতে হইবে।" নাগসমাল তাঁহার কথা না শুনিয়া চৌরাস্তার মাঝখানে তাঁহার পাত্রচীবর নামাইয়া রাখিয়া "ভদন্ত, এই আপনার পাত্র ও চীবর রহিল" বলিয়া নিজ ইচ্ছামত পথে চলিয়া গেল।

এইসব কারণে একজন যোগ্য ভিক্ষু তাঁহার পরিচারক হউক, বুদ্ধ বৃদ্ধবয়সে এরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করায় সারিপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়ন এই ভার লইতে চাহিলেন কিন্তু তাঁহাদের অন্য গুরুতর কর্তব্য আছে বলিয়া বুদ্ধ তাহাতে সম্মত হইলেন না। তখন ভিক্ষুরা আনন্দকে এই ভার লইতে বলিলে আনন্দ সলজ্জকুণ্ঠিত ভাবে একপার্শ্বে বসিয়া রহিলেন এবং অবশেষে বলিলেন "ভগবান আমার মনোভাব জ্ঞাত আছেন; যদি তাঁহার অনভিপ্রেত

না হয় তবে আমাকে এই মহাসম্মান অর্পণ করুন"। বুদ্ধ ইহাতে সম্মতি দিলে সংঘে জ্ঞপ্তি দ্বারা আনন্দকে এই কার্যভার দেওয়া হইল। আনন্দ অতি নিষ্ঠার সহিত বুদ্ধের সেবা করিতেন। তিনি বিনয়ী নির্লোভ ও নিরভিমান ছিলেন। ভক্তেরা তাঁহার হাতে বুদ্ধের জন্য বস্ত্রাদি দান করিলে আনন্দ তাহা হইতে কখনও নিজের জন্য কিছু রাখিতেন না, বুদ্ধকে প্রদত্ত আহারাদি ভিক্ষার অংশ গ্রহণ করিতেন না, বুদ্ধকে কেহ নিমন্ত্রণ করিলে নিজেকেও নিমন্ত্রিত বোধ করিতেন না এবং বুদ্ধের সহিত এক কক্ষে কখনও শয়ন করিতেন না। তিনি সর্বত্র বুদ্ধের অনুগমন করিতেন। বুদ্ধের দর্শনার্থীদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া তিনি বুদ্ধকে সংবাদ দিতেন এবং বুদ্ধের সুবিধা অসুবিধা বুঝিয়া লোককে বুদ্ধের সমীপে আনিতেন। বুদ্ধের কাছে যে কোনও সময়ে যাইবার তাঁহার অধিকার ছিল। বুদ্ধ কোনও উপদেশ দিলে আনন্দ পরে পুনরায় বুদ্ধকে প্রশ্ন করিয়া তাহার পুনরাবৃত্তি শুনিতেন। সংঘের বহু সংবাদ বুদ্ধ আনন্দকেই প্রশ্ন করিয়া শুনিতেন এবং সংঘের প্রতি তাঁহার অনেক নির্দেশাদি প্রায়ই আনন্দের মুখে প্রেরিত হইত। আনন্দের সহৃদয়তা সরলতা ও কোমলতার কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। বুদ্ধের সহিত কাহারও কোনও বিষয়ে প্রয়োজন থাকিলে লোকে প্রথমে আনন্দকে বলিত, আনন্দ হাসিমুখে সকলের কাজ সমাধা করিয়া দিতেন। নারীগণের প্রতি আনন্দ বিশেষ কৃপালু ছিলেন, তাঁহারাও তাঁহার প্রতি প্রসন্ন ছিলেন। রাজা প্রসেনজিৎ তাঁহার অন্তঃপুরিকাদের নিকট ধর্মোপদেশের জন্য বুদ্ধকে অনুরোধ করিলে বুদ্ধ আনন্দের উপর একবার এই ভার দিয়াছিলেন। নারীদের আনন্দের প্রতি প্রসন্নতা ইহা হইতে বুঝা যায় যে, হিউয়েন ৎসাং ভারতভ্রমণের সময়ে মথুরাইতে দেখিয়াছিলেন পর্বদিনে বৌদ্ধগণ বুদ্ধ, সারিপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়নের স্তূপে পূজা করে, বালকেরা রাহুলের স্তূপে পূজা করে এবং নারীগণ আনন্দের স্তূপে পূজা করে।

[চুল্লবগ্‌গ ও মহাবগ্‌গ, ধম্মপদট্‌ঠকথা ; থেরগাথা ও থেরীগাথা টীকা।]

৮

নারীকাহিনী

বুদ্ধের গৃহী-স্ত্রীভক্তগণের মধ্যে প্রধানা ছিলেন বিশাখা। ইঁহার দানাদি সম্বন্ধে বৌদ্ধশাস্ত্রে বহুকাহিনী আছে। ইঁহার পিতা ছিলেন সাকেত-নগরবাসী শ্রেষ্ঠী ধনঞ্জয়। শ্রাবস্তীর শ্রেষ্ঠী মিগারের পুত্র পুণ্যবর্ধনের সহিত বিশাখার বিবাহ হয়। বিশাখার শ্বশুর প্রথমে নগ্নশ্রমণদের ভক্ত ছিলেন, পরে বিশাখার প্রভাবেই বুদ্ধভক্ত হইয়াছিলেন; শ্বশুরের এই মাতৃতুল্য হিতসাধনের জন্য বৌদ্ধশাস্ত্রে বিশাখা 'মিগারমাতা' নামে খ্যাতা। বিবাহের পর বিশাখা পতিগৃহে আসিলে মিগার তাঁহাকে নগ্নশ্রমণদের প্রণাম করিতে বলিলেন, কিন্তু তাহাতে ঘৃণাবোধ হওয়ায় বিশাখা সেখান হইতে চলিয়া আসিলেন। নগ্নশ্রমণরা ইহাতে কুপিত হইয়া মিগারকে পরামর্শ দেন যে নববধূকে যেন বিতাড়িত করা হয়। বিশাখা ও তাঁহার পিতা সম্ভবতঃ পূর্ব হইতেই বুদ্ধভক্ত ছিলেন। বিবাহের পর পতিগৃহে যাইবার সময়ে ধনঞ্জয় কন্যাকে দশটি উপদেশ দিয়াছিলেন যথা—ভিতরের অগ্নি বাহিরে লইও না, বাহিরের অগ্নি ভিতরে আনিও না; যে দেয় তাহাকে দিও, যে না দেয় তাহাকে দিও না; যে দেয় তাহাকেও দিও, যে না দেয় তাহাকে দিও; সুখে উপবেশন করিও, সুখে আহার করিও, সুখে শয়ন করিও; অগ্নি প্রজ্বলিত রাখিও এবং গৃহদেবতাদিগকে শ্রদ্ধা করিও। মিগার পাশের ঘরে ছিলেন এবং তিনিও ইহা শুনিতে পাইলেন। তারপর পিতা বৈবাহিককে বলিলেন কন্যার বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ উপস্থিত হইলে আটজন মধ্যস্থদ্বারা যেন তাহার বিচার করা হয়। দশটি উপদেশ, নগ্নশ্রমণগণকে প্রণাম প্রভৃতি ঘটনা অনাথপিণ্ডদের কন্যা ছোট-সুভদ্রা সম্বন্ধেও শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। সম্ভবতঃ এগুলি প্রচলিত কাহিনী হইতে গৃহীত হইয়াছিল। বধূ বিশাখা পতিগৃহে পৌঁছিবার রাত্রেই তাঁহার একটি ঘোটকী বৎসপ্রসব করে। বিশাখা দাসীদের সঙ্গে অশ্বশালায় গিয়া নববৎসকে স্নানাদি করাইয়া আসিলেন। একদিন মিগার আহারে বসিয়াছেন এবং বিশাখা তাঁহার পরিচর্যারতা আছেন এমন সময়ে এক বৌদ্ধভিক্ষু বাড়ীতে প্রবেশ করিলে বিশাখা ভিক্ষুকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইলেন এবং মিগার ইহা দেখিয়াও যেন দেখিলেন না। পরে

"আমার শ্বশুর বাসি ভাত খাইতেছেন" এই কথা বলিয়া বিশাখা ভিক্ষুকে চলিয়া যাইতে বলিলেন। শ্বশুর ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাইতে বলিলে বিশাখা উত্তর দিলেন তাঁহারও তো মাতাপিতা আছেন, চলিয়া যাইতে বলিলেই তিনি চলিয়া যাইতে বাধ্য নহেন, মধ্যস্থগণ দ্বারা প্রথমে যেন তাঁহার বিচার করা হয়। শ্বশুর মধ্যস্থগণকে আহ্বান করিলে তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তরে বিশাখা বলিলেন তিনি পূর্বজন্মের সুকর্মকে 'বাসি ভাত' বলিয়াছিলেন, কারণ ভিক্ষুকে ভিক্ষাদান করিয়া মিগার এই জন্মে পুণ্যসঞ্চয় করিলেন না। মিগার তখন বিশাখার মধ্যরাত্রে গৃহত্যাগের কথা উত্থাপন করিলে বিশাখা ঘোটকীপ্রসবের কথা বলিলেন। মধ্যস্থরা বলিলেন বিশাখার কোনও দোষ হয় নাই। শ্বশুর তখন বৈবাহিকের উপদেশগুলির অর্থ কি জিজ্ঞাসা করিলে বিশাখা বলিলেন উহার অর্থ স্বামী-শ্বশুর প্রভৃতির দোষের কথা কাহাকেও বলিও না, তাঁহাদের বিরুদ্ধে কেহ কিছু বলিলে তাহা তাঁহাদের জানাইও না; যাহারা জিনিষ লইয়া প্রত্যর্পণ করে না তাহাদের কিছু দিও না কিন্তু দরিদ্র লোক কিছু চাহিলে প্রত্যর্পণ করিতে পারুক বা না পারুক তাহা দিও; শ্বশুরশাশুড়ী বা স্বামীর সম্মুখে বসিয়া থাকিও না; তাঁহাদের আহার না হইলে আহার করিও না, তাঁহারা শয়ন না করিলে শয়ন করিও না, তাঁহাদিগকে অগ্নিবৎ পূজা এবং দেবতাবৎ জ্ঞান করিও। মিগার তখন নিজভুল বুঝিতে চাহিয়া ক্ষমাপ্রার্থনা করিলে বিশাখা বলিলেন তিনি এখন দোষমুক্তা কিন্তু এগৃহে আর থাকিবেন না। শ্বশুর বহু অনুনয় করিলে বিশাখা বলিলেন যদি বিশাখা বুদ্ধকে গৃহে নিমন্ত্রণ করিতে পারেন তবেই তিনি থাকিবেন। মিগার ইহাতে সম্মত হইলেন এবং বুদ্ধের উপদেশ শুনিয়া নগ্ন-শ্রমণদের ত্যাগ করিয়া বুদ্ধের ভক্ত হইলেন।

একবার বিশাখা বুদ্ধের উপদেশ শুনিতে আসিয়া মহামূল্য শিরোভূষণ খুলিয়া বাহিরে রাখিয়া আসিয়াছিলেন এবং গৃহে ফিরিবার সময়ে তিনি উহা লইতে ভুলিয়া গেলে আনন্দ তাহা দেখিতে পাইয়া তুলিয়া রাখিয়াছিলেন। বিবাহের সময়ে পিতৃদত্ত যৌতুকের মধ্যে একটি অলংকার ছিল এই শিরোভূষণ, কিন্তু আনন্দ প্রত্যর্পণ করিতে গেলে বিশাখা তাহা গ্রহণে অস্বীকৃতা হইয়া বলিলেন উহা বিক্রয় করিয়া যে অর্থ হইবে সংঘ তাহা গ্রহণ করুন। অলংকার কিন্তু এত মহামূল্য ছিল যে তাহার ক্রেতা জুটিল না, তখন বিশাখাই উপযুক্ত-

মূল্যে তাহা পুনঃক্রয় করিলে সেই অর্থে 'পূর্বারাম' নামক একটি বিহার নির্মিত হয়। বুদ্ধ মধ্যে মধ্যে পূর্বারামেও বাস করিতেন।

বিশাখা একবার সশিষ্য বুদ্ধকে আহারে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। পূর্ব-রাত্রে প্রবলবৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছিল। বুদ্ধ ভিক্ষুদের বৃষ্টিজলে স্নান করিতে বলিলে তাহারা চীবর ছাড়িয়া বৃষ্টিতে স্নান করিতে লাগিল। বিশাখার গৃহে আহার্য প্রস্তুত হইলে দাসী বিহারে সংবাদ দিতে আসিয়া ত্যক্তচীবর স্নানরত ভিক্ষুদের দেখিয়া বিশাখাকে গিয়া বলিল বিহারে ভিক্ষুরা নাই, নগ্নশ্রমণরা বৃষ্টিতে ভিজিতেছে। বিশাখা দাসীকে পুনরায় পাঠাইলেন—ইতিমধ্যে ভিক্ষুরা স্নান সারিয়া নিজ নিজ কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল, দাসী কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া বাড়ীতে গিয়া বলিল আরামে কোনও ভিক্ষু নাই, কোনও লোক নাই। যথাসময়ে বুদ্ধ সশিষ্যে আসিয়া আহারের পর বিশাখা তাঁহার নিকট এই বর চাহিলেন যে তিনি যাবজ্জীবন ভিক্ষুগণকে বর্ষাকালীন বস্ত্র দান করিবেন। উপাখ্যানে বস্ত্র ব্যতীত বিশাখার অন্ন ঔষধ যাগু (দুগ্ধপক্ক অন্ন) এবং ভিক্ষুণীগণকে উদকশাটিক (স্নানবস্ত্র) দানের প্রস্তাবও এই সঙ্গে উল্লিখিত আছে, কিন্তু সম্ভবতঃ এগুলি বিভিন্ন সময়ে ঘটিয়াছিল। বুদ্ধ এই বরপ্রার্থনার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বিশাখা দাসীর বৃত্তান্ত উল্লেখ করিয়া বলিলেন "ভদন্ত, নগ্নতা অশুচি ও বিরক্তিকর।" ভিক্ষুণীদের উদকশাটিক সম্বন্ধে বিশাখা বলিয়াছিলেন "ভিক্ষুণীরা নগ্ন হইয়া নদীতে স্নান করে এবং বেশ্যারা উপহাস করিয়া তাহাদের বলে 'যৌবন থাকিতে কাম-ভোগ ত্যাগে লাভ কি? কামভোগ কি অনুচিত? বৃদ্ধবয়সে কামভোগ ত্যাগ করিও, ইহাতে তোমাদের দুইদিকই রক্ষা হইবে' এবং ভিক্ষুণীরা ইহাতে অপ্রস্তুত বোধ করে। ভদন্ত, নারীর নগ্নতা অশুচি ঘৃণ্য ও বিরক্তিকর।"

"বিশাখে, এই বর প্রার্থনায় তোমার নিজের স্বার্থ কি?"

বিশাখা বলিলেন কোনও ভিক্ষুর মৃত্যুসংবাদ আনীত হইলে বুদ্ধ যখন মৃত ভিক্ষুর সকৃতাগামিত্ব অনাগামিত্ব প্রভৃতি ফল ব্যাখ্যা করিবেন, তখন বিশাখা ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করিবেন সেই মৃতভিক্ষু কখনও শ্রাবস্তীতে আসিয়া-ছিলেন কিনা, এবং আসিয়াছিলেন শুনিলে বিশাখা বুঝিবেন মৃতভিক্ষু তাঁহার প্রদত্ত বস্ত্রাদি পাইয়াছিলেন এবং ইহাতে বিশাখার তৃপ্তি সন্তোষ ও আনন্দ হইবে। বুদ্ধ ইহাতে বিশাখার বহু প্রশংসা করেন।

বিশাখার এক দৌহিত্রীর মৃত্যু হইয়াছিল। বিশাখা শোকার্তা হইয়া বুদ্ধের নিকট গেলে বুদ্ধ তাঁহাকে সান্ত্বনাদান করিয়া শ্রাবস্তীতে প্রত্যহ কত লোকের মৃত্যু হয় তাহা চিন্তা করিতে বলিয়াছিলেন।

বিশাখার গৃহের একটি বালিকা এক তরুণ ভিক্ষুর জন্য পানীয়জল আনিতে গিয়া জলে নিজমুখ দেখিয়া হাসিলে ভিক্ষুও হাসিল। বালিকা বলিল "যে হাসে সে মাথাকাটা!" তরুণ ভিক্ষু বলিল "তুই মাথাকাটা, তোর বাপ মাথাকাটা, তোর মা মাথাকাটা।" বালিকা কাঁদিতে কাঁদিতে বিশাখার কাছে অভিযোগ করিলে বিশাখা ভিক্ষুর ক্রোধশান্তির চেষ্টা করিলেন কিন্তু ভিক্ষু বলিল বালিকা তাঁহাকে কেন অপমান করিবে? বুদ্ধ শুনিয়া ইন্দ্রিয়সুখের বিষয় লইয়া বিদ্রূপ করার জন্য ভিক্ষুকে দোষ দিয়াছিলেন।

এক যুবতী দেবদত্তের দলে প্রব্রজ্যা লইয়াছিল। গৃহে থাকিতেই তাহার গর্ভসঞ্চার হইয়াছিল কিন্তু যুবতী তাহা বুঝিতে পারে নাই। দেবদত্ত পাপ সন্দেহ করিয়া যুবতীকে দল হইতে বহিষ্কার করিলে সে বুদ্ধের নিকট গিয়া প্রতিকার প্রার্থনা করিল। বুদ্ধ রাজা প্রসেনজিৎ, অনাথপিণ্ডদ, বিশাখা ও অপর কয়েকজনকে মধ্যস্থ নিয়োগ করিলেন। সংঘনিয়মাবলীতে অভিজ্ঞ ভিক্ষু উপালির উপর বিচার পরিচালনার ভার রহিল। উপালির অনুরোধে বিশাখা পর্দার অভ্যন্তরে যুবতীকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন গৃহে থাকিতেই তাহার গর্ভসঞ্চার হইয়াছিল। উপালি ভিক্ষুণীকে নির্দোষ ঘোষণা করিলেন। যথাকালে তাহার একটি পুত্র প্রসব হইলে প্রসেনজিৎ শিশুকে গ্রহণ করেন।

অনাথপিণ্ডদের গৃহের সুজাতা নাম্নী এক নববধূ সকলের অবাধ্য ছিল। বুদ্ধ তাহার কাছে উত্তমা স্ত্রী স্বামীর বশবর্তিনী হয়, একথা ব্যাখ্যা করায় বধূ নম্র হইয়াছিল। অনাথপিণ্ডদের কন্যা ছোট-সুভদ্রার পতিকুল নগ্ন-শ্রমণদের ভক্ত ছিলেন, কিন্তু তাহার কথায় তাহার শাশুড়ী বুদ্ধকে আহারে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।

কৃশা-গৌতমী নাম্নী শ্রাবস্তীর এক নারীর পুত্রের মৃত্যু হইলে সে পুত্রের পুনর্জীবন লাভের জন্য বুদ্ধের নিকটে গেলে বুদ্ধ তাহাকে যে গৃহে কখনও কাহারও মৃত্যু হয় নাই, এমন গৃহ হইতে শ্বেত সর্ষপ সংগ্রহ করিয়া আনিতে বলিয়াছিলেন। সর্ষপ মন্ত্রতন্ত্রে ব্যবহৃত হইত, গৌতমী ভাবিল সেই সর্ষপে বুদ্ধ তাহার মৃতপুত্রকে বাঁচাইবেন, কিন্তু গৃহে-গৃহে সর্ষপ প্রার্থনা করিয়া যখন সে

দেখিল যেখানে কাহারও মৃত্যু হয় নাই এমন গৃহ নাই তখন তাহার জ্ঞানোদয় হইলে বুদ্ধ তাহাকে মৃত্যুর অবশ্যম্ভাবিত্ব-উপদেশে সান্ত্বনা দিয়াছিলেন।

আলবি নগরের এক তন্তুবায়কন্যা বুদ্ধের উপদেশ শুনিতে আসিত। একবার এই বালিকা না আসা পর্যন্ত বুদ্ধ উপদেশদান আরম্ভ করেন নাই। পিতার মাকুতে সুতা ভরিতে বালিকার বিলম্ব হইয়াছিল। সে আসিলে বুদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন "কোথা হইতে আসিতেছ?" বালিকা বলিল সে তাহা জানে না। সে কোথায় যাইবে জিজ্ঞাসা করায় বালিকা একই উত্তর দিল। বুদ্ধ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "জান না কি?" বালিকা বলিল জানে। বুদ্ধ বলিলেন "জান?" বালিকা বলিল "না"। ভিক্ষুরা বালিকার অদ্ভুত উত্তর শুনিয়া নিন্দা করিলে বুদ্ধ বালিকাকে তাহার কথার অর্থ বুঝাইতে বলিলেন। বালিকা বলিল "কোথা হইতে আসিয়া সংসারে জন্মিয়াছি জানি না, মৃত্যুর পর কোথায় জন্মিব জানি না, একদিন নিশ্চয় মৃত্যু হইবে জানি কিন্তু কবে মৃত্যু হইবে জানি না।" বালিকা বোধহয় কয়েকবার বুদ্ধের উপদেশ শুনিতে আসিয়া তাহার সামর্থ্যের অতিরিক্ত 'পাকা পাকা' কথা বলিয়া তাঁহাকে প্রশ্নাদি করিত, তাই তিনি তাহার সহিত একটু রঙ্গ করিয়াছিলেন! বালিকা গৃহে ফিরিয়া দেখিল তন্তুবায় নিদ্রিত, সে তাঁতের পার্শ্বে বসিয়া পিতার নিদ্রাভঙ্গের অপেক্ষায় রহিল। তন্তুবায় নিদ্রাভঙ্গে উঠিয়াই তাঁতে এক টান দিলে তাঁতের এক প্রান্ত বালিকার বক্ষে লাগিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু হইল। শোকার্ত তন্তুবায় বুদ্ধের নিকট আসিলে তাঁহার উপদেশ শুনিয়া সংঘে প্রবেশ করিয়াছিল।

রাজগৃহের পুণ্যানাম্নী এক দরিদ্রা দাসী অনেকরাত্র পর্যন্ত ধান ভাণ্ডিয়া শয়নে যাইবার সময়ে গৃধ্রকূটে ভিক্ষুদের প্রদীপের আলোক দেখিয়া ভাবিত বোধহয় উহাদের কেহ পীড়িত বা কাহাকেও সাপে কামড়াইয়াছে, তাই ভিক্ষুরা এত রাত্রে জাগিয়া আছে। বুদ্ধ ভিক্ষায় বাহির হইলে দাসী একবার তাঁহাকে প্রণাম ও তাঁহার আশীর্বাদ প্রার্থনা করিয়া নিজের পোড়া রুটি তাঁহাকে ভিক্ষা দিয়াছিল। বুদ্ধ তাহা গ্রহণ করিয়া পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিলে দাসী ভাবিল (এবং সম্ভবতঃ মুখেও বলিল) বোধহয় তিনি পরে দরিদ্রের পোড়ারুটি পথের কাক-কুকুরকে দিয়া রাজরাজড়ার বাড়ীতে গিয়া আহার করিবেন। বুদ্ধ আনন্দকে পথপার্শ্বে চীবর বিছাইতে বলিলেন

এবং তাহাতে বসিয়া দাসীর পোড়ারুটি খাইলেন, দাসী ইহাতে কৃতার্থ বোধ করিল। ভিক্ষুদের পরে এই বিষয় আলোচনা করিতে শুনিয়া বুদ্ধ বলিয়াছিলেন "দাতা অনুসারে দানের মূল্য হয়।"

বৈশালীর গণিকা আম্রপালী বিচিত্র যানে আরোহণ করিয়া কোটিগ্রামে বুদ্ধদর্শনে আসিয়া তাঁহাকে স্বগৃহে আহারের নিমন্ত্রণ করে এবং বুদ্ধ তাহাতে সম্মত হইলে আম্রপালী স্বগৃহে ফিরিতেছিল। বুদ্ধ কোটিগ্রামে আসিয়াছেন শুনিয়া লিচ্ছবিগণ বিচিত্রবসন ও অলঙ্কারাদি ধারণ করিয়া যানারোহণে বুদ্ধদর্শনে যাইতেছিল, পথে আম্রপালীর যান তাহাদের যানের চাকায় চাকা ঘষিয়া গেল। যুবকরা জিজ্ঞাসা করিল "আম্রপালি, তুমি আমাদের চাকায় চাকা ঘষিয়া গেলে কেন?"

"আর্যপুত্রগণ, আজ আমি ভিক্ষুসংঘসহ ভগবান বুদ্ধকে স্বগৃহে নিমন্ত্রণ করিয়াছি,"

"আম্রপালি, তোমাকে লক্ষমুদ্রা দিব, তুমি এই নিমন্ত্রণটি আমাদের ছাড়িয়া দাও,"

"আর্যপুত্রগণ, সমগ্র বৈশালীরাজ্য দিলেও আমি এই নিমন্ত্রণ ছাড়িব না।" যুবকরা ইহাতে ক্ষুণ্ণ হইয়া হাতে তুড়ি দিয়া বলিল "এই আমওয়ালী আমাদের জিতিয়া গেল, এই আমওয়ালীর কাছে আমরা হারিয়া গেলাম!"

সুবেশধারী লিচ্ছবিগণ নিকটে উপস্থিত হইলে বুদ্ধ ভিক্ষুদের বলিলেন "ভিক্ষুগণ, তোমাদের মধ্যে যাহারা কখনও দেবতাদের দেখ নাই, তাহারা এই লিচ্ছবিদের দেখ, ভাল করিয়া নিরীক্ষণ কর এবং দেবতাদের সহিত ইহাদের সাদৃশ্য লক্ষ্য কর!" বুদ্ধ সুন্দর কিছু দেখিলেই তাহার প্রশংসা করিতেন ও অন্যদেরও তাহা দেখিতে বলিতেন। লিচ্ছবিরা বুদ্ধকে আহারের নিমন্ত্রণ করিলে বুদ্ধ বলিলেন তিনি গণিকা আম্রপালীর গৃহে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন। যুবকরা পুনরায় (অবশ্য নিজেদের মধ্যে) বলিল "এই আমওয়ালীর কাছে আমরা হারিলাম, এই আমওয়ালী আমাদের জিতিয়া গেল!" বুদ্ধ আম্রপালীর গৃহে আহারান্তে আম্রপালী তাঁহাকে একটি আম্রবন দান করিল এবং পরে আম্রপালী ভিক্ষুণী হইয়াছিল। এই গণিকার প্রতি লিচ্ছবি যুবকদের ঈর্ষার কারণ বুঝা যায় না। সম্ভবতঃ আম্রপালী তখন বিগতযৌবনা অনাদৃতা হইয়াছিল, নতুবা বিলাসীগণ তাহাকে 'আমওয়ালী' বলিয়া বোধহয় তাচ্ছিল্য

করিত না। মহাপরিনিব্বান-সুত্তের বিবরণে দেখা যায় আম্রপালীর দান বুদ্ধের মৃত্যুর মাত্র কয়েক মাস পূর্বে ঘটিয়াছিল—ইহা হইতেও আম্রপালীর প্রৌঢ়ত্ব অনুমান হয়, কারণ বিম্বিসারের যৌবনকালেই আম্রপালী বিখ্যাতা হইয়াছিল এরূপ আখ্যাত আছে, অথবা বোধহয় অন্য কোনও কারণে আম্রপালী লিচ্ছবি-গণের অপ্রীতিভাজন হইয়াছিল।

নারীকর্তৃক বুদ্ধনির্যাতন

বুদ্ধের মত লোককেও স্ত্রীলোকের হাতে লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছিল।

যখন তাঁহার প্রায় পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়স তখন দুইটি ঘটনা ঘটে। বুদ্ধের খ্যাতিতে ঈর্ষান্বিত হইয়া শ্রাবস্তীর ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে অপদস্থ করিবার জন্য চিঞ্চা নাম্নী তাহাদের অধীন এক শিক্ষার্থিনীকে নিযুক্ত করিল। চিঞ্চা প্রত্যহ সন্ধ্যার পর সাজসজ্জা করিয়া জেতবনের দিকে যাইত, জেতবন হইতে বুদ্ধের উপদেশ শুনিয়া ফিরিবার সময়ে ভক্তেরা তাহাকে দেখিতে পাইত। জেত-বনের নিকটে ব্রাহ্মণদের একটি আলয়ে রাত্রি কাটাইয়া প্রত্যূষে সে পুনরায় জেতবনের দিক হইতে নগরের দিকে আসিত, প্রাতে ভক্তেরা বুদ্ধের নিকটে যাইবার সময়ে তাহাকে ফিরিতে দেখিতে পাইত। কোথায় যাইতেছে বা কোথা হইতে আসিতেছে লোকে জিজ্ঞাসা করিলে চিঞ্চা উত্তর দিত "সে কথায় তোমাদের কাজ কি?" এইরূপ কিছুদিন নিয়মিত যাতায়াত করিবার পর চিঞ্চা লোককে বলিতে লাগিল সে বুদ্ধের সহিত জেতবনে রাত্রিবাস করে। লোকে ইহাতে কানাকানি করিতে আরম্ভ করিল। কিছুদিন পরে সে শরীরে বলদের চোয়ালের হাড় ঘসিয়া হাত পা ফুলাইয়া কাপড়ের নীচে পেটের উপর একটা কাঠের চাপ বাঁধিয়া গর্ভলক্ষণ প্রকাশ করিয়া জেত-বনে উপস্থিত হইয়া মিলিত ভক্তদের সম্মুখে বুদ্ধকে বলিল "তুমি তো শ্রমণ, উপদেশ দিয়া বেড়াও, কিন্তু আমার অবস্থা এখন কি হইবে? যে ঘরে রাত্রে তোমার সহিত থাকিতাম তাহা প্রসবের উপযুক্ত নহে, জিনিষপত্র টাকাকড়িও আমার কিছু নাই, তোমার তো অনেক বড়লোক ভক্ত আছে, তাহাদের বলিয়া আমার জন্য ভাল বন্দোবস্ত করিয়া দাও" ইত্যাদি। এইভাবে চিঞ্চা অতিপরিচিতের মত আরও অনেক কথা বলিতে লাগিল। বুদ্ধ তাহার এই হীন কলঙ্কের উত্তরে বলিলেন "ভগিনি, তোমার কথা সত্য কি মিথ্যা তাহা তুমিও জান এবং আমিও জানি।" চিঞ্চা তখন বুদ্ধকে মিথ্যাবাদী ধর্মধ্বজী

প্রভৃতি বলিয়া নানারূপ বিদ্রূপ করিতে লাগিল। ধর্মের কল বাতাসে নড়ে; এই সময়ে হঠাৎ চিঞ্চার পেটে বাঁধা সুতা ছিঁড়িয়া গিয়া কাঠের চাপটা মাটিতে পড়িয়া তাহার প্রতারণা প্রকাশ করিয়া দিল—আখ্যায়িকায় আছে দেবতারা ইঁদুর ও দম্‌কা হাওয়ারূপে আসিয়া চিঞ্চার পেটে বাঁধা সুতা কাটিয়া তাহার কাপড় উড়াইয়া ফেলিয়াছিলেন।

এক ব্রাহ্মণের মাগন্দিয়া নাম্নী অতিসুন্দরী কন্যা ছিল। কন্যা বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে অনেকে তাহাকে বিবাহ করিতে চাহিল ও ইহাতে বিবাদের সূত্রপাত হইল। বুদ্ধ একদিন ব্রাহ্মণের গৃহে ভিক্ষা লইতে আসিয়াছিলেন। কন্যাকে লইয়া নানা লোকের বিবাদ অবসান করিবার জন্য ব্রাহ্মণ স্থির করিল বুদ্ধের সহিত কন্যার বিবাহ দিয়া দিবে। পত্নীর সহিত পরামর্শ করিয়া ব্রাহ্মণ বুদ্ধের কাছে প্রস্তাব উত্থাপন করিল। বুদ্ধ কিছুই না বলিয়া সেস্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। ব্রাহ্মণ ছাড়িবার পাত্র নহে, সে ঠিক করিল আবার বুদ্ধকে ধরিবে। ব্রাহ্মণপত্নী কিন্তু অল্পেই বুঝিয়াছিল এ সন্ন্যাসী ভুলিবার লোক নহে, সে স্বামীকে নিষেধ করিল। পত্নীর নিষেধ না শুনিয়া ব্রাহ্মণ কন্যাকে বসনভূষণে সাজাইয়া বুদ্ধের কাছে লইয়া গেল। বুদ্ধ বলিলেন তাঁহার সকল রিপু জয় হইয়াছে, তিনি কামের অতীত, মাগন্দিয়া যতই সুন্দরী হউক তিনি তাহাকে পদনখের দ্বারাও স্পর্শযোগ্য মনে করেন না। ব্রাহ্মণ কন্যাকে লইয়া ফিরিয়া আসিল। প্রত্যাখ্যাতার প্রতিহিংসাবৃত্তি প্রসিদ্ধ; মাগন্দিয়াও বুদ্ধকে নির্যাতন করিতে ছাড়ে নাই। কন্যার জন্য শ্রেষ্ঠী রাজা ও অন্যান্য লোকের মধ্যে বিবাদের ঘটা দেখিয়া ব্রাহ্মণ তাহার ভ্রাতার হাতে কন্যাকে সমর্পণ করিয়া সস্ত্রীক সংসারত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। ব্রাহ্মণের ভ্রাতা মাগন্দিয়াকে কৌশাম্বীর রাজা উদয়নের নিকট লইয়া গেল। মাগন্দিয়ার রূপে মুগ্ধ হইয়া উদয়ন তাহাকে বিবাহ করিলেন। উত্তরকালে বুদ্ধ কৌশাম্বীতে আসিলে মাগন্দিয়া গুণ্ডা লাগাইয়া তাঁহাকে প্রকাশ্যপথে নানারূপে অপমান ও লাঞ্ছনা করাইল। বুদ্ধ ভিক্ষায় বাহির হইলেই এই গুণ্ডারা ও তাহাদের প্ররোচনায় নগরের অন্য লোক বুদ্ধের পিছনে পিছনে তাঁহাকে গালি দিতে দিতে ও নিন্দা করিতে করিতে যাইত। কৌশাম্বীতে বাস এত বিরক্তিকর হইয়া উঠিল যে আনন্দ বলিলেন "ভদন্ত, আমাদের এস্থান ত্যাগ করিয়া গেলে ভাল হয়।"

"আনন্দ, যেখানে যাইব সেখানকার লোকেও যদি আমাদের নির্যাতন করে ?"

"তবে আমরা সেস্থানও ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইব,"

"সেখানেও আমরা যদি নির্যাতিত হই তবে কি করিবে ?"

"ভদন্ত, তবে আমবা আবার স্থানত্যাগ করিব,"

"আনন্দ, একটু ধৈর্যধারণ করিলে আমরা এতগুলি পর্যটনের কষ্ট নিবারণ করিতে পারিব। যাহা অন্যত্র পাইব-ভাবিতেছি তাহা ধৈর্য অবলম্বন করিলে আমরা হয়তো এখানেই পাইব। আনন্দ, আমাদিগকে যুদ্ধহস্তীর মত অস্ত্রপ্রহারে অবিচলিত থাকিতে হইবে।"

মাগন্দিয়া রাজা উদয়নের মনেও বুদ্ধের প্রতি বিদ্বেষ জন্মাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। মাগন্দিয়া তাহার খুড়ার কাছ হইতে আটটি জীবন্ত মোরগ ও আটটি মরা মোরগ আনাইয়া জীবন্ত মোরগগুলি উদয়নের হাতে দিয়া বলিল তিনি যেন তাঁহার অন্যতমা পত্নী সামাবতীকে উহা রাঁধিতে দেন। উদয়ন মাগন্দিয়ার কথামত মোরগগুলি সামাবতীর কাছে পাঠাইলেন। সামাবতী বুদ্ধের ভক্ত ছিলেন, তিনি প্রাণিহত্যা করিতে অস্বীকার করিলেন। সামাবতী বুদ্ধের জন্য জীবন্ত মোরগ রাঁধেন কিনা দেখিবার জন্য মাগন্দিয়া তখন রাজাকে বুদ্ধের জন্য রাঁধিয়া দিতে সামাবতীর কাছে আবার মোরগ-গুলি পাঠাইতে বলিল। উদয়ন তাহাই করিলেন কিন্তু মাগন্দিয়া এইবার গোপনে জীবন্ত মোরগ বদলাইয়া মৃত মোরগগুলি সামাবতীর কাছে পাঠাইল। যে জীবের হত্যা আমি করি নাই তাহা খাইতে বুদ্ধের অনুমতি ছিল, তাই সামাবতী তাহা রাঁধিয়া রাজার কাছে পাঠাইলেন। মাগন্দিয়া তখন উদয়নকে বলিল "দেখিলে ? তোমাদের মত সামান্য লোকের জন্য উনি উহা করিতে রাজি হন নাই !" বুদ্ধ যে বলিয়াছিলেন "অক্রোধ দ্বারা ক্রোধকে জয় করিবে, সাধুতা দ্বারা অসাধুতাকে জয় করিবে, দান দ্বারা কদর্যকে জয় করিবে, সত্যের দ্বারা মিথ্যাবাদীকে জয় করিবে"—এই উক্তি মাগন্দিয়া সম্বন্ধে খাটে নাই, ধৈর্যের দ্বারা কৌশাম্বী জয়ের আশাও তাঁহাব পূর্ণ হয় নাই। সে কথা আমরা পরে আলোচনা করিব।

কয়েকজন সম্ভ্রান্ত যুবা তাহাদের স্ত্রীদের সুশিক্ষা পাইবার জন্য বিশাখার তত্ত্বাবধানে রাখিয়াছিল। শ্রাবস্তীতে একবার "সাত"দিনের জন্য মদ্যপান

উৎসব ঘোষণা করা হইল। এই যুবকেরা তাহাদের স্ত্রীদের প্রস্তুত তীব্র সুরাপান করিল; উৎসবের শেষে স্ত্রীরা ভাবিল তাহারা নিজেরা তো সুরাপান করিতে পারিল না, তাই তাহারা স্থির করিল স্বামীদের অজ্ঞাতসারে তাহারা লুকাইয়া সুরাপান করিবে। বিশাখাকে সঙ্গে লইয়া তাহারা একটি আরামে বেড়াইতে গেল। বস্ত্রের ভিতরে লুকাইয়া তাহারা সঙ্গে সুরা লইয়া গিয়া পান করিয়া প্রমত্ত অবস্থায় আরামে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। ইহাতে লোকনিন্দা হইবে বলিয়া বিশাখা চিন্তিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন স্বামীদের কাছে তাহারা কি উত্তর দিবে? স্ত্রীরা বলিল তাহারা অসুখের ভাণ করিবে। স্বামীরা স্ত্রীদের দেখিতে না পাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিল তাহাদের অসুখ হইয়াছে কিন্তু স্ত্রীরা সুরাপান করিয়াছে বুঝিতে পারিয়া তাহারা স্ত্রীদের প্রহার করিল। পরে আর একটি উৎসবে স্ত্রীরা আবার সুরাপান করিতে ইচ্ছা করিল কিন্তু বিশাখা তাহাদের আরামে লইয়া যাইতে অস্বীকার করিলেন। স্ত্রীরা ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিল তাহারা বুদ্ধদর্শনে যাইতে চাহে। বিশাখা ইহাতে সম্মত হইলেন, স্ত্রীরা গন্ধমাল্য ও লুকাইয়া সুরাপাত্র সঙ্গে লইয়া চলিল। জেতবনে গিয়া স্ত্রীরা যথেচ্ছ এখানে ওখানে ঘুরিয়া বেড়াইল ও গোপনে সুরাপান করিল। বিশাখা স্ত্রীদের উপদেশ দিতে বুদ্ধকে অনুরোধ করিলেন কিন্তু স্ত্রীদের তখন এমন মত্তাবস্থা যে তাহারা টলিয়া পড়িতেছিল, অচিরেই তাহারা বুদ্ধের সম্মুখে নৃত্যগীত আরম্ভ করিয়া দিল, তাঁহার নিকটে আসিয়া নানা ভঙ্গিতে হাততালি দিয়া হাসিতে লাগিল। বর্ণনায় আছে বুদ্ধ চক্ষু হইতে জ্যোতিঃশিখা বাহির করিয়া তাহাদের দিকে তাকাইলেন—ইহার অর্থ বোধহয় এই যে তিনি তাহাদের প্রতি রোষকষায়িত ভ্রূভঙ্গ করিয়াছিলেন, কারণ অবিলম্বেই নেশা ছুটিয়া গিয়া তাহারা শান্ত হইয়া বসিয়াছিল।

ঈর্ষাপর ব্রাহ্মণেরা সুন্দরী নাম্নী এক পরিব্রাজিকার সহায়তায় বুদ্ধকে চরিত্রহীন প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। সুন্দরীও চিঞ্চার মত সন্ধ্যা-সকাল জেতবনের দিকে যাতায়াত করিতে লাগিল, লোকে জিজ্ঞাসা করিলে বলিত সে বুদ্ধের সহিত গন্ধকুটিতে রাত্রিযাপন করে। লোকে কানাকানি করিতে আরম্ভ করিলে চক্রান্ত পাছে স্ত্রীলোকের দুর্বলতায় পণ্ড হইয়া যায় এজন্য ব্রাহ্মণেরা গুণ্ডা লাগাইয়া সুন্দরীকে হত্যা করাইয়া

জেতবনের নিকটে আবর্জনাস্তূপের নীচে মৃতদেহ লুকাইয়া রাখিয়া রটনা করিয়া দিল পরিব্রাজিকা সুন্দরীকে পাওয়া যাইতেছে না। রাজার কাছে গিয়া তাহারা বলিল তাহাদের সন্দেহ হয় বুদ্ধের শিষ্যেরা বুদ্ধের কলঙ্ক গোপন করিবার জন্য সুন্দরীকে হত্যা করিয়াছে। রাজা তাহাদের সুন্দরীকে অন্বেষণের অনুমতি দিলেন। তাহারা অনেক খোঁজাখুঁজির ভাণ করিয়া জেতবনের নিকটের আবর্জনাস্তূপ হইতে মৃতদেহ বাহির করিল। রাজার আদেশে ব্রাহ্মণেরা মৃতদেহ নগরের পথে পথে লইয়া আনুষঙ্গিক ঘটনা ঘোষণা করিল। লোকে ভিক্ষুদের নিন্দা করিতে লাগিল। ভিক্ষুরা বুদ্ধকে ইহা জানাইলে তিনি মিথ্যাবাদীর অশুভ পরিণাম সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন। বুদ্ধ ও ভিক্ষুরা হত্যা অস্বীকার করিতেছেন শুনিয়া রাজা রাজপুরুষদিগকে ব্যাপার অনুসন্ধান করিতে বলিলেন। রাজপুরুষেরা সর্বত্র চর পাঠাইলেন; চরেরা এক শৌণ্ডিকালয়ে শুনিতে পাইল কতকগুলি লোক মাতাল হইয়া এ-উহাকে বলিতেছে "তুই সুন্দরীকে মারিয়াছিস্"। লোকগুলাকে ধরিয়া রাজার নিকটে উপস্থিত করা হইলে রাজার প্রশ্নের উত্তরে তাহারা স্বীকার করিল যে ব্রাহ্মণদের দ্বারা নিয়োজিত হইয়া তাহারা সুন্দরীকে হত্যা করিয়াছে। রাজা ব্রাহ্মণদের ডাকাইয়া নগরে একথা ঘোষণা করিতে বলিলেন এবং গুণ্ডাদের ও অপরাধী ব্রাহ্মণদের প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করিলেন।

শিষ্যগণ ও নারী

সংসারত্যাগী হইলেও ভিক্ষুদিগকে মধ্যে মধ্যে নারীরূপের মোহে পড়িতে হইত, গৃহীভক্তেরাও কেহ কেহ নারীসংক্রান্ত বিষয়ে জড়িত হইয়া বুদ্ধের শরণ বা উপদেশ লইতে আসিত; অন্যান্য ব্যাপার উপলক্ষেও নারী সম্বন্ধে বুদ্ধকে নানা কথা বলিতে হইত।

রাজগৃহে শ্রীমতী নামে এক গণিকা ছিল। কথিত আছে বৈদ্য জীবকের মত সেও গণিকা শালবতীর গর্ভজাতা ছিল। শ্রীমতী ভিক্ষুদের মুক্তহস্তে ভিক্ষা দিত। এক ভিক্ষুর মুখে ইহা শুনিয়া আর এক ভিক্ষু শ্রীমতীর গৃহে ভিক্ষা করিতে গেল। শ্রীমতী সেদিন অসুস্থ থাকায় তাহার দাসীরা ভিক্ষুকে আহার করাইল এবং ভিক্ষুর আহারান্তে দাসীরা শ্রীমতীকে ধরাধরি করিয়া ভিক্ষুর কাছে লইয়া আসিলে তাহার রূপযৌবনশোভা দেখিয়া ভিক্ষুর

চিত্তবিকার উপস্থিত হইল, সে আরামে ফিরিয়া আহারনিদ্রা ত্যাগ করিয়া একান্তে পড়িয়া রহিল। বুদ্ধ শুনিয়া তখন কিছু বলিলেন না। কয়েকদিন পরে শ্রীমতীর মৃত্যু হইল। বুদ্ধ বিম্বিসারকে বলিয়া মৃতদেহের সৎকার স্থগিত রাখাইলেন (মৃতা গণিকার অর্থসম্পত্তি রাজার প্রাপ্য বলিয়া তাহার সৎকারও বোধহয় রাজার করণীয় ছিল)। কয়েকদিন পরে বুদ্ধ বিম্বিসারকে বলিয়া পাঠাইলেন তিনি ভিক্ষুদের লইয়া শ্রীমতীর দেহ দেখিতে যাইবেন, রাজাও যেন উপস্থিত থাকেন। বুদ্ধ সেই বাসনাকাতর ভিক্ষুকেও সঙ্গে লইলেন এবং সকলকে কৃমিকুলসমাচ্ছন্ন শ্রীমতীর গলিত শব দেখাইয়া শরীরের পরিণাম চিন্তা করিতে বলিলেন। বুদ্ধ রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন শ্রীমতীকে একরাত্রের জন্য লোকে কত অর্থ দিত। বিম্বিসার বলিলেন লোকে পঞ্চাশ কার্ষাপণ দিত। বুদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন "এখন এ দেহের জন্য লোকে কত দিবে?" রাজা বলিলেন কিছু দেওয়া দূরে থাক, ইহার সৎকারের জন্য তিনি আদেশ না দিলে কেহ উহা স্পর্শও করিবে না। বুদ্ধ বলিলেন "যে দেহের প্রতি লোকের এত লোভ ছিল তাহার এই পরিণাম! ভিক্ষুগণ, শ্রীমতীর দেহের অবস্থা দেখিয়া বিনাশশীল শরীরের প্রতি আসক্তি যে বিরূপ মূর্খতা তাহা তোমরা শিক্ষা কর।" শ্রীমতীর রূপে মুগ্ধ ভিক্ষুর ইহাতে মোহ কাটিয়া গেল। বুদ্ধ প্রায়ই ভিক্ষুদের শ্মশানক্ষেত্রে গিয়া মৃতদেহের পরিণাম দেখিয়া দেহের ও দৈহিক বিষয়ের প্রতি আসক্তির ভ্রম বুঝিতে বলিতেন।

পূর্ণ নামক একটি দরিদ্রলোক শ্রেষ্ঠী সুমনের গৃহে চাকর ছিল। পূর্ণের স্ত্রী ও উত্তরা-নাম্নী কন্যাও সুমনের গৃহে কাজ করিত। পূর্ণ হঠাৎ অনেক ধনলাভ করিয়া বড়লোক হইলে—বর্ণনায় আছে সারিপুত্রকে সেবা করিবার ফলে তাহার এই ভাগ্যপরিবর্তন ঘটিয়াছিল—সুমনের পুত্রের সহিত উত্তরার বিবাহ হইল। সুমনরা বুদ্ধের ভক্ত ছিল না, ইহাতে উত্তরার সংঘসেবায় অসুবিধা হইত। গৃহকর্মও উত্তরাকে অনেক করিতে হইত। উত্তরা পিতাকে তাহার অসুবিধার কথা জানাইলে পূর্ণ পরামর্শ দিল উত্তরা যেন স্বামীকে বলিয়া গণিকা শ্রীমতীকে স্বামীর উপপত্নীরূপে গৃহে রাখে, তাহাতে যে অর্থ লাগে পূর্ণই তাহা দিবে। উত্তরার স্বামী ইহাতে সম্মত হইলে শ্রীমতীকে গৃহে আনিয়া রাখা হইল। শ্রীমতী ব্যাপার জানিত না, সে মনে করিত সেই বুঝি গৃহের কর্ত্রী। এদিকে উত্তরা নিশ্চিন্ত হইয়া ভিক্ষুদের জন্য

রন্ধনাদি করিয়া সময় কাটাইত। একদিন স্বামী উত্তরাকে দেখিয়া হাসিল, শ্রীমতী ইহাতে ঈর্ষায় অধীর হইয়া রান্নাঘরে ঢুকিয়া উত্তরার মাথায় গরম ঘি ঢালিয়া দিল এবং উত্তরার দাসী ইহাতে রাগিয়া শ্রীমতীকে মারিতে আরম্ভ করিলে উত্তরা দাসীকে ছাড়াইয়া লইল। তারপর সব শুনিয়া শ্রীমতী বুঝিল সে-রক্ষিতামাত্র এবং অনুতপ্তা হইয়া উত্তরার কাছে ক্ষমা চাহিলে উত্তরা বলিল বুদ্ধ যদি তাহাকে ক্ষমা করেন তবে সেও তাহাকে ক্ষমা করিবে। উভয়ে বুদ্ধের সমীপে গেলে বুদ্ধ শ্রীমতীকে ভৎর্সনা করিয়া অক্রোধদ্বারা ক্রোধজয়ের জন্য উত্তরার প্রশংসা করিলেন।

যে শাক্যনারীরা মহাপ্রজাবতীর সহিত আসিয়া ভিক্ষুণী হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে রূপনন্দা একজন ছিলেন এবং তাঁহার মনে রূপের জন্য খুব গর্ব ছিল। তিনি জানিতেন বুদ্ধ নারীরূপ অসার বলিয়াছেন, বুদ্ধের কাছে গেলে পাছে বুদ্ধ তাঁহার রূপের নিন্দা করেন এই ভয়ে তিনি বুদ্ধের নিকট যাইতেন না, তাঁহার কাছে গেলে তিনি অন্য ভিক্ষুণীদের পিছনে বসিয়া থাকিতেন। বুদ্ধ ইঁহার মনোভাব বুঝিলেন। বর্ণিত আছে ইঁহাকে দেখাইবার জন্য বুদ্ধ একদিন একটি অপরূপসুন্দরী মায়ামূর্তি সৃষ্টি করিলেন, ইহা দেখিয়া রূপনন্দা মোহিত হইয়া এই সুন্দরীর তুলনায় নিজেকে কাকের মত কুৎসিত মনে করিলেন। দেখিতে দেখিতে বুদ্ধ রূপনন্দার সম্মুখে এই মায়াময়ী সুন্দরীকে বিংশতিবর্ষীয়া যুবতী হইতে ক্রমান্বয়ে এক সন্তানের মাতা, মধ্যবয়স্কা, বৃদ্ধা ও ব্যাধিগ্রস্তা মূর্তিতে পরিবর্তিত করিলেন। রূপের এই পরিণাম দেখিয়া রূপনন্দার রূপাভিমান কাটিয়া গেল। বিম্বিসার-মহিষী ক্ষেমার সম্বন্ধেও অনুরূপ কাহিনী বর্ণিত আছে।

এক ভিক্ষু ধ্যানাভ্যাসের জন্য এক জীর্ণোদ্যানে গিয়াছিল। এক নগরশোভিনীও সেখানে অভিসারে গিয়াছিল কিন্তু তাহার প্রণয়ী না আসায় সে ইতস্তত: ঘুরিতে ঘুরিতে ভিক্ষুকে দেখিয়া ভাবিল "এই একটি লোক দেখিতেছি, ইহাকে ভুলান যাক"। চারিদিকে তাকাইয়া কেহ নাই দেখিয়া রমণী ভিক্ষুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া কয়েকবার অন্তর্বাস খুলিয়া আবার পরিল, কেশ খুলিয়া আবার বাঁধিল এবং হাততালি দিয়া হাসিতে লাগিল। ভিক্ষুর ইহাতে চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হইল কিন্তু কামের বশীভূত না হওয়া সম্বন্ধে বুদ্ধের উপদেশ স্মরণ করিয়া সে রক্ষা পাইল।

দুই ভাই সংঘে প্রবেশ করিয়াছিল; বড়ভাই সত্যই সন্ন্যাসী হইল কিন্তু ছোটভাই স্ত্রী ও গৃহের কথা ভাবিত। বুদ্ধ একবার ইহাদের গ্রামে আসিলে ছোটভাইয়ের স্ত্রীরা স্বামীকে ভুলাইয়া গৃহে ফিরাইবার অভিপ্রায়ে বুদ্ধকে স্বগৃহে আহারের নিমন্ত্রণ করিল। বুদ্ধ যাইবার পূর্বে ছোটভাই আহারব্যবস্থাদি ঠিক হইয়াছে কিনা দেখিবার জন্য তাহাদের বাড়ীতে গিয়া যখন আসনাদি ঠিক করিতেছে তখন তাহার স্ত্রীরা তাহাকে নানারূপে উত্যক্ত করিল, আসনগুলি উল্টাপাল্টা করিয়া দিয়া শেষে তাহার চীবর খুলিয়া লইয়া গৃহীর শ্বেতবস্ত্র পরাইয়া মাথায় ফুলের মালা জড়াইয়া দিল। সে তখনও শ্রমণের ছিল বলিয়া এই বেশেই বুদ্ধের কাছে ফিরিয়া সংবাদ দিল। ভিক্ষুরা তাহার সংঘত্যাগের কথা আলোচনা করিয়া বলিল বড়ভাইও বোধহয় গৃহে ফিরিবে কারণ তাহার স্ত্রীসংখ্যা আরও বেশি। বুদ্ধ শুনিয়া বলিলেন সে ভয় করিবার কারণ নাই, ছোট ভাইয়ের চিন্তা নানাবিষয়ে বিক্ষিপ্ত ছিল কিন্তু বড়ভাই সেরূপ নহে, যে সর্বদা আমোদের সন্ধানে থাকে সেই মারের হাতে পড়ে কিন্তু যে স্থির থাকে তাহার এরূপ হয় না।

কয়েকজন লিচ্ছবিবংশীয় যুবা আমোদের জন্য উদ্যানে যাইতেছিল, পথে একটি নগরশোভিনীকে দেখিয়া তাহাকে সঙ্গে লইল। উদ্যানে গিয়া ইহাকে লইয়া যুবাদের মধ্যে মারামারি আরম্ভ হইল এবং অবশেষে খুনাখুনি হইয়া কয়েকজন মারা পড়িল। ইহাদের মৃতদেহ বাঁশে বাধিয়া নগরে আনা হইল। ভিক্ষুরা ইহা দেখিয়া বুদ্ধকে বলিলে তিনি বলিলেন "কাম হইতে দুঃখ ও ভয়ের উৎপত্তি হয়"।

এক যুবক নারীদ্বেষী ছিল, এইজন্য তাহাকে লোকে 'অস্ত্রীগন্ধ-কুমার' বলিত, অর্থাৎ যে স্ত্রীলোকের গন্ধ সহিতে পারে না। মাতাপিতার বহু অনুরোধ সত্ত্বেও যুবক বিবাহ করিতে চাহিত না। অবশেষে সে একটি স্বর্ণপ্রতিমা নির্মাণ করিয়া বলিল ঐরূপ সুন্দরী কন্যা পাইলে সে বিবাহ করিবে। ব্রাহ্মণেরা অনেক অন্বেষণে পরমাসুন্দরী এক কন্যা পাইয়া যুবাকে দেখাইবার জন্য লইয়া আসিতেছিল কিন্তু বালিকা এত সুকুমার-দেহা ছিল যে গাড়ীর ঝাঁকানিতে পথে তাহার মৃত্যু হইল। যুবা সাগ্রহে কন্যার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল, তাহাকে অতি সন্তর্পণে এই সংবাদ

দেওয়া হইলেও যুবা আশাভঙ্গজনিত শোকে অধীর হইয়া উঠিল। বুদ্ধ তাহাদের গৃহে গিয়া যুবাকে কামনাই যে দুঃখ ও ভয়ের কারণ, এ বিষয়ে উপদেশ দিয়াছিলেন।

এক যুবকের পত্নী বিবাহের দিন হইতেই ব্যাভিচারিণীবৃত্তি আরম্ভ করিয়াছিল, যুবক লজ্জায় সমাজে মুখ দেখাইতে পারিত না। যুবক একদিন বুদ্ধের কাছে আসিল ; বুদ্ধ তাহার অনেক দিন না আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে যুবক তাহার লজ্জার কথা বলিল। বুদ্ধ বলিলেন "সংসারেব স্ত্রীলোক ঠিক যেন নদী পথ পান্থশালা প্রভৃতির মত, উহাদের সময়-অসময়ের কথা কেহ বলিতে পারে না।"

অনাথপিণ্ডদের ভ্রাতুষ্পুত্র ক্ষেম বড় প্রিয়দর্শন ছিল, স্ত্রীলোকেরা তাহাকে দেখিয়া আত্মহারা হইত এবং ক্ষেম সদা পরস্ত্রীলোলুপ হইয়া বেড়াইত। এক রাত্রে রাজপুরুষেরা ক্ষেমকে ধরিয়া রাজার নিকট উপস্থিত করিলে "মহাশ্রেষ্ঠীর (অনাথপিণ্ডদের) কথা ভাবিয়া আমার লজ্জা হয়" এই কথা বলিয়া প্রসেনজিৎ ক্ষেমকে ছাড়িয়া দিলেন। এরূপ দুই তিনবার ঘটিল। প্রসেনজিৎ বুদ্ধকে একথা জানাইলে বুদ্ধ বলিলেন "যে পরস্ত্রীগামী তাহার চারটি বিপত্তি হয় ; সে পাপ সঞ্চয় করে, শান্তিতে নিদ্রা যাইতে পারে না, নিন্দাভাজন হয় এবং নরকে গমন করে।"

এক ব্যক্তি তাহার দাসীর সহিত ব্যভিচার করিয়াছিল। তাহার স্ত্রী জানিতে পারিয়া দাসীর হাতপা বাঁধিয়া নাক কাটিয়া ঘরে বন্ধ করিয়া স্বামীকে লইয়া বুদ্ধের উপদেশ শুনিতে গেল। ইতিমধ্যে আত্মীয়স্বজন তাহাদের বাড়ীতে আসিয়া ব্যাপার দেখিয়া দাসীকে মুক্ত করিলে দাসীও বুদ্ধের নিকটে গিয়া সব কথা বলিল। বুদ্ধ গোপনপাপের নিন্দা করিয়া বলিলেন লোকে না দেখিলেও ইহাতে পরে অশুভ হয় কিন্তু পুণ্যের দ্বারা সর্বদাই আনন্দ লাভ হয়।

সুন্দরসমুদ্র নামক এক ধনী যুবক সংঘে প্রবেশ করিয়াছিল। তাহার মাতা এজন্য কাঁদিতেন। এক পণ্যস্ত্রী তাঁহাকে বলিল অর্থ পাইলে সে সুন্দরসমুদ্রকে সংসারে ফিরাইয়া আনিতে পারে। মাতা ইহাতে সম্মতা হইলেন। যে পথে সুন্দরসমুদ্র ভিক্ষায় বাহির হইত, স্ত্রীলোকটি সেখানে বাড়ী ভাড়া লইয়া কয়েকদিন তাহাকে ভিক্ষা দিয়া তারপর স্বগৃহে আহারের

নিমন্ত্রণ করিল। সুন্দরসমুদ্র কয়েকদিন তাহার গৃহে বারান্দায় বসিয়া আহার করিবার পর সে পথের ছোকরাদের পয়সা দিয়া শিখাইয়া রাখিল যে ভিক্ষু আহারে বসিলে তাহারা যেন বারান্দার উপর আসিয়া ধূলা উড়ায় ও বারণ করিলেও যেন না শুনে। পরদিন সুন্দরসমুদ্র আহারে বসিলে ছোকরারা আসিয়া সেইরূপ করিলে রমণী বলিল বারান্দায় অসুবিধা হয়, পরদিন হইতে ভিক্ষু যেন বাড়ীর মধ্যে বসিয়া আহার করেন। বাড়ীর মধ্যে কয়েকদিন আহারের পর স্ত্রীলোকটি ছোকরাদিগকে বাড়ীর মধ্যে ভিক্ষুর আহারস্থানে পূর্বের মত উৎপাত করিতে শিখাইয়া দিল। এইরূপে রমণী সুন্দরসমুদ্রকে ক্রমে বাড়ীর সবচেয়ে উপরের তলায় লইয়া গিয়া নির্জনে হাবভাব দেখাইয়া প্রলুব্ধ করিবার চেষ্টা করিল। বর্ণিত আছে সুন্দরসমুদ্রের চিত্ত চঞ্চল হইয়াছে এমন সময়ে সে দেখিতে পাইল যেন বুদ্ধ তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। ইহাতে মনে বল পাইয়া সে রক্ষা পাইল।

রাজা প্রসেনজিৎ সন্ততি নামক এক ব্যক্তিকে বিদ্রোহদমনের পুরস্কারস্বরূপে "সাত"দিন রাজত্ব করিতে ও একটি নর্তকী উপহার দিয়াছিলেন। সন্ততি সাতদিন ধরিয়া মদ্যপান করিল ও শেষদিন নৃত্যগীতরতা নর্তকীটি হঠাৎ তাহার সম্মুখে মরিয়া পড়িয়া গেল। ইহাতে শোকার্ত হইয়া সন্ততি বুদ্ধের শরণ লইলে তিনি তাহাকে উপদেশ দিয়া সংঘে প্রবেশ করাইয়াছিলেন।

এক দরিদ্র লোকের সুন্দরী পত্নীর উপর রাজা প্রসেনজিতের লুব্ধদৃষ্টি পড়িয়াছিল এবং তিনি স্থির করিলেন দরিদ্র লোকটিকে হত্যা করাইয়া তাহার পত্নীকে গ্রহণ করিবেন। এই অভিপ্রায়ে রাজা লোকটিকে রাজ-বাড়ীর কাজে নিযুক্ত করিলেন। তাঁহার অভিসন্ধি এই ছিল যে কোনও দোষ পাইলে তাহা উপলক্ষ্য করিয়া তিনি তাহাকে বধ করিবেন কিন্তু তাহার কোনও দোষ পাইলেন না। একদিন রাজা তাহাকে কঠিন কার্যের ভার দিয়া অন্যত্র পাঠাইলেন এবং বলিলেন তাঁহার স্নানের পূর্বেই তাহাকে ফিরিতে হইবে। লোকটি রাজার স্নানের পূর্বেই কার্যসমাধা করিয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখিল রাজার স্নানের পূর্বেই দ্বার বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। লোকটি তখন বিপদের সম্ভাবনা বুঝিয়া লোক ডাকিয়া সকলকে সাক্ষী থাকিতে বলিল যে সে কার্যসমাধা করিয়া রাজার স্নানের পূর্বেই ফিরিয়াছে। সেই রাত্রে প্রসেনজিৎ যখন শয্যায় শুইয়া স্ত্রীলোকটির কামনায় ছট্‌ফট্‌

করিতেছিলেন তখন কানে কিসের যেন ঘোর শব্দ শুনিতে পাইলেন। ইহাতে ভীত হইয়া তিনি ব্রাহ্মণদের ডাকাইলেন, ব্রাহ্মণেরা সুবিধা পাইয়া তাঁহাকে বলিল অনেক যাগযজ্ঞ করিলে ইহার উপশম হইবে। প্রসেনজিতের মহিষী মল্লিকা রাজাকে অল্পে ভয় পাইয়া লোকের সব কথায় বিশ্বাস করার জন্য নিন্দা করিয়া বুদ্ধের কাছে লইয়া গেলেন ; বুদ্ধ বলিলেন রাজা যে শব্দ শুনিয়াছেন তাহা নরকের পাপীদের আর্তনাদ।

বিশাখ নামক এক ব্যক্তি বুদ্ধের উপদেশ শুনিয়া অনাগামিত্বফল লাভ করিয়াছিল। একদিন বিশাখ বিষণ্নমনে বাড়িতে ফিরিতেছিল, তাহার স্ত্রী ধর্মদত্তা বাতায়নে দাঁড়াইয়া ছিল কিন্তু বিশাখ স্ত্রীকে দেখিয়া হাসিল না এবং আহারের সময়ে তাহাকে সঙ্গে খাইতেও ডাকিল না। স্ত্রী ভাবিল বিশাখ রাগ করিয়াছে কিন্তু বিশাখ পরে স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিল তাহার আর সংসারে থাকিবার ইচ্ছা নাই এবং তাহার সকল অর্থসম্পত্তি সে স্ত্রীকে দিতে চাহিল। ধর্মদত্তা বলিল "উচ্ছিষ্ট লইয়া আমি কি করিব ? আমাকে ভিক্ষুণী হইতে অনুমতি দাও"—যেমন উপনিষদেও বর্ণিত আছে স্বামী সম্পত্তিদানের কথা বলিলে যাজ্ঞবল্ক্যের পত্নী মৈত্রেয়ী বলিয়াছিলেন "যাহাদ্বারা আমি অমর হইব না, তাহা লইয়া আমি কি করিব ?" বিশাখ ইহাতে হৃষ্ট হইয়া স্ত্রীকে ভিক্ষুণীবিহারে লইয়া গেল। ধর্মদত্তা ভিক্ষুণীদের সহিত নির্জন স্থানে গিয়া ধ্যানাভ্যাস করিয়া অর্হত্ত্বফল লাভ করিল এবং অন্যদের উপকারের জন্য বিহারে ফিরিয়া আসিল। সে ফিরিয়াছে শুনিয়া বিশাখ বিস্মিত হইয়া বিহারে তাহার সহিত দেখা করিতে গেল ও ধর্মদত্তাকে পরীক্ষা করিবার জন্য ফলত্রয়ের কথা জিজ্ঞাসা করিল। ধর্মদত্তা ফলত্রয়ের কথা বুঝাইয়া বিশাখকে অর্হত্ত্বফলের কথা জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু বিশাখ উত্তর দিতে আরম্ভ করিলে ধর্মদত্তা দেখিল বিশাখ তাহার সীমার বাহিরে গিয়া পড়িয়াছে কারণ সে অনাগামিত্ব পর্যন্ত ফললাভ করিয়াছিল, অর্হত্ত্বফল লাভ করে নাই। ধর্মদত্তা তখন হাসিয়া বিশাখকে বুদ্ধের কাছে গিয়া এবিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতে বলিল (এইরূপ একটি কাহিনী যোগ-বাসিষ্ঠ গ্রন্থেও বর্ণিত আছে—রাজা শিখিধ্বজ ও তাঁহার রানী চুড়ালা একত্র সংসারত্যাগ করিয়া ব্রহ্মসাধনা আরম্ভ করেন এবং চুড়ালা প্রথমে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া শিখিধ্বজকে এবিষয়ে সাহায্য করিয়াছিলেন)।

ভদ্রা কুণ্ডলকেশা রাজগৃহের এক শ্রেষ্ঠীর কন্যা ছিল। একদিন এক বন্দীকে

রাজপথ দিয়া লইয়া যাওয়া হইতেছিল, সে বন্দীকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া তাহাকে বিবাহ করিতে চাহিলে তাহার পিতা রক্ষীদিগকে উৎকোচ দানে বন্দীকে মুক্ত করিয়া বন্দীর সহিত তাহার বিবাহ দিলেন। কিছুদিন পরে স্বামীর লোভ হইল স্ত্রীর অলঙ্কারগুলি আত্মসাৎ করিবে। সে স্ত্রীকে বলিল বন্দীদশায় সে গৃধ্রকুটে দেবতার কাছে পূজা মানিয়াছিল, এখন সেই পূজা দিতে হইবে। স্ত্রী পূজার আয়োজন করিল ও স্বামীর সহিত পূজা দিতে যাইবে বলিল। তাহাদের সঙ্গে লোকজন আসিতেছিল কিন্তু স্বামী তাহাদিগকে বিদায় করিয়া দিয়া একা স্ত্রীকে লইয়া চলিল। পথে স্বামীকে কোনও আদরের কথা বলিতে না শুনিয়া স্ত্রী তাহার দুরভিসন্ধি সন্দেহ করিল। গৃধ্রকুটের চূড়ায় পৌঁছিয়া স্বামী তাহাকে তাহার অলঙ্কারগুলি উত্তরীয়ে বাঁধিতে বলিলে স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিল "আমি কি অপরাধ করিলাম ?" স্বামী বলিল "মূর্খ, আমি তোমার অলঙ্কারগুলি লইবার জন্য এখানে আসিয়াছি"। স্ত্রী বলিল "প্রিয়তম, এসব অলঙ্কার কাহার ? আমিই বা কাহার ?" স্বামী উত্তর দিল সে ওসব ভাগাভাগির কথা জানে না। তখন স্ত্রী বলিল "ভাল, তাহাই হউক, কিন্তু প্রিয়তম, আমার এই ইচ্ছা পূর্ণ কর, অলঙ্কারপরিহিত অবস্থায় তোমাকে একবার আলিঙ্গন করিতে দাও।" স্বামী ইহাতে সম্মত হইলে স্ত্রী তাহাকে সম্মুখ হইতে আলিঙ্গন করিয়া তারপর যেন পিছন হইতে আলিঙ্গন করিবে এই ভাণ করিয়া ধাক্কা দিয়া চূড়া হইতে ফেলিয়া দিল। তারপর স্ত্রী নিগ্রর্ন্থসম্প্রদায়ে যোগ দিয়া শ্রমণী হইল। সে বুদ্ধিমতী ও বিদুষী ছিল এবং স্থান হইতে স্থানান্তরে গিয়া অন্য সম্প্রদায়ের লোককে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করিত। শ্রাবস্তীতে গিয়া একটি বালুকাস্তূপ বানাইয়া তাহাতে একটি আম্রশাখা পুঁতিয়া রাখিয়া সে বলিল যে তাহার সহিত তর্কযুদ্ধ করিতে চাহে, সে যেন এই আম্রশাখা উৎপাটন করে। সারিপুত্র সেখান দিয়া যাইবার সময়ে ব্যাপার শুনিয়া পথের ছোকরাদের শাখা তুলিয়া ফেলিতে বলিলেন। "সাত"দিন পরে কুণ্ডলকেশা আসিয়া ইহা দেখিল এবং অনেক লোককে আসিয়া তর্কযুদ্ধ শুনিতে নিমন্ত্রণ করিয়া সারিপুত্রের কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল কে প্রশ্ন করিবে ও কে উত্তর দিবে ? সারিপুত্র বলিলেন কুণ্ডলকেশা প্রশ্ন করুন, তিনি উত্তর দিবেন। তর্ক আরম্ভ হইলে কুণ্ডলকেশা যত প্রশ্ন করিল সারিপুত্র তাহার উত্তর দিলেন, শেষে তাহার প্রশ্ন ফুরাইয়া গেল, সে আর কি জিজ্ঞাসা

করিবে ভাবিয়া পাইল না। তারপর সারিপুত্র তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন- "এক কি?" নির্গ্রন্থরা বহুসংখ্যক আত্মা ও অগণ্য জড়-পরমাণুর (পুদ্গল) অস্তিত্বে বিশ্বাস করিত বলিয়া বোধহয় সারিপুত্র এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন। কুণ্ডলকেশা ইহার উত্তর দিতে না পারিয়া বলিল সে সারিপুত্রের শরণ লইতেছে। "আমার শরণ না লইয়া বুদ্ধের শরণ লও" এই কথা বলিয়া সারিপুত্র তাহাকে বুদ্ধের কাছে লইয়া গেলেন।

নন্দুত্তরা নাম্নী আর এক নির্গ্রন্থ শ্রমণী বাগ্মিত্বের জন্য বিখ্যাতা ছিলেন ও তর্কযুদ্ধ করিয়া বেড়াইতেন। মৌদ্গল্যায়ন নন্দুত্তরাকে তর্কে হারাইয়াছিলেন।

শ্রাবস্তীর এক শ্রেষ্ঠীর উৎপলবর্ণা নাম্নী এক পরমাসুন্দরী কন্যা ছিল। উৎপলবর্ণাকে বিবাহপ্রার্থী বহু লোক আসিল কিন্তু কেহই যাহাতে অসন্তুষ্ট না হয় এজন্য শ্রেষ্ঠী কন্যাকে ভিক্ষুণী হইতে বলিল। উৎপলবর্ণা ধর্মপ্রাণা ছিল বলিয়া সানন্দে ইহাতে সম্মত হইয়া বনে একটি কুটির বানাইয়া বাস করিতে লাগিল এবং ভিক্ষার জন্য শ্রাবস্তীতে যাইত। এক যুবক সম্বন্ধে উৎপলবর্ণার ভাই হইত ও তাহার পাণিপ্রার্থীদের মধ্যে একজন ছিল। উৎপলবর্ণার বাসস্থানের সন্ধান লইয়া যুবা তাহার অনুপস্থিতিতে কুটিরে গিয়া খাটের নীচে লুকাইয়া রহিল। উৎপলবর্ণা ভিক্ষা করিয়া কুটিরে ফিরিয়া খাটের উপর বসিল; বাহিরের আলোক হইতে ভিতরে আসিয়া সে ভাল দেখিতে পাইতেছিল না, এই অবসরে যুবা খাটের নীচ হইতে বাহির হইয়া উৎপলবর্ণার "আমার সর্বনাশ করিও না" এই ক্রন্দনে কর্ণপাত না করিয়া তাহার ধর্মনাশ করিয়া চলিয়া গেল। উৎপলবর্ণা ভিক্ষুণীদের একথা বলিলে ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুদের এবং ভিক্ষুরা বুদ্ধকে জানাইল। বুদ্ধ ভিক্ষুণীদের রক্ষার জন্য নগরের মধ্যে ভিক্ষুণীবিহার নির্মাণ করিয়া দিতে রাজা প্রসেনজিৎকে অনুরোধ করিলেন। এই ঘটনার পর ভিক্ষুরা বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিল ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তি করিলে অর্হতের কোনও দোষ হয় কিনা। বুদ্ধ বলিলেন পদ্মপত্রে যেমন জলস্পর্শ হয় না সেইরূপ অর্হৎদেরও কামেচ্ছা থাকে না।

একবার শ্রাবস্তীতে ভিক্ষাটন ও ভোজনের পর আনন্দ এক কূপে গিয়া দেখিলেন এক নারী জল তুলিতেছে। তিনি বলিলেন "ভগিনি, আমাকে জল দাও, আমি পান করিব।" নারী বলিল সে হীনজাতীয়া। আনন্দ বলিলেন "ভগিনি,

আমি তো তোমাকে তোমার জাতি বা কুলের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি না। যদি তোমার জল বেশি থাকে আমাকে দাও, আমি পান করিব"। জলপানান্তে আনন্দ চলিয়া গেলে নারী তাঁহার প্রতি প্রণয়াসক্ত হইয়া তাহার মাতার সহায়তায় আনন্দকে তাহাদের পল্লীতে আনাইয়াছিল এবং অনেকদিন আনন্দের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিল কিন্তু তাহার চেষ্টা সফল হয় নাই।

ভিক্ষুণীকথা

ভিক্ষুণীদের সংঘপ্রবেশের ইতিহাস পূর্বে বলা হইয়াছে। মহাপ্রজাবতী যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন তিনিই ভিক্ষুণীসংঘের নেত্রী ছিলেন। ভিক্ষুদের মধ্যে যেমন, ভিক্ষুণীদের মধ্যেও সেইরূপ নানা ঘটনার ফলে নানা নিয়ম প্রবর্তিত হইয়াছিল এবং তাহাদের মধ্যেও বহু কলহবিবাদ ও অনাচার ঘটিত। ভিক্ষুণীসংঘকে সর্বপ্রকারে ভিক্ষুসংঘের নীচে স্থান দেওয়া হইয়াছিল। মহাপ্রজাবতী একবার আনন্দের মুখে বুদ্ধের কাছে প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন যে বয়ঃকনিষ্ঠ ভিক্ষুদের বয়োজ্যেষ্ঠা ভিক্ষুণীদের প্রতি সম্মান দেখাইবার, দেখিলে উঠিয়া দাঁড়ান, নমস্কার প্রভৃতির নিয়ম করা হউক। এই অনুরোধের উত্তরে বুদ্ধ নাকি বলিয়াছিলেন ইহা তিনি কখনও হইতে দিতে পারেন না। যে সকল নিয়ম ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয়েরই পালনীয়, তাহার সম্বন্ধে বুদ্ধ মহাপ্রজাবতীকে বলিয়াছিলেন সেগুলি ভিক্ষুণীদিগকে ভিক্ষুদেরই মত সমানভাবে পালনের চেষ্টা করিতে হইবে এবং যে নিয়মগুলি ভিক্ষুদের প্রতি প্রযোজ্য নহে, শুধু ভিক্ষুণীদেরই প্রতিপালনীয়, সেগুলি ভিক্ষুণীদিগকে মর্ম অনুসারে পালনের চেষ্টা করিতে হইবে।

প্রাতিমোক্ষ (বিনয়ের মূল নিয়মাবলী) শুনাইবার জন্য ভিক্ষুদের ভিক্ষুণীসংঘের নিকট যাইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। লোকে বলাবলি করিল ভিক্ষুণীসংঘে ভিক্ষুদের পত্নী-উপপত্নীরা আছে, এখন উহারা আমোদ করিবে। ইহাতে ভিক্ষুদের পরিবর্তে ভিক্ষুণীদের নিজেদের দ্বারাই প্রাতিমোক্ষের ব্যবস্থা করা হয়। স্বকৃতদোষ স্বীকার ও শাস্তিগ্রহণ সম্বন্ধে সংঘের নিয়ম প্রথমে ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুদের সমীপে পালন করিত, কিন্তু ভিক্ষুণীবিহারে ভিক্ষুদের যাওয়া নিষিদ্ধ হইলে ভিক্ষুণীরা পথে, বন্ধ গলিতে বা চৌরাস্তায় ভিক্ষুদের সহিত দেখা হইলে সেখানেই উপযুক্ত স্থান মনে করিয়া মাটিতে

ভিক্ষাপাত্র রাখিয়া এক স্কন্ধে চীবর ফেলিয়া নতজানু হইয়া যুক্তহস্তে দোষস্বীকার ও শাস্তিগ্রহণ করিত, লোকে বুঝিতে না পারিয়া বলিল "ইহারা ভিক্ষুদের পত্নী বা উপপত্নী; গতরাত্রে অনাদর করিয়াছিল, এখন ক্ষমা চাহিতেছে!" ইহাতে ভিক্ষুণীদের নিজেদের মধ্যেই দোষস্বীকার ও শাস্তিগ্রহণের নিয়ম হইল।

"ষড়্‌বর্গীয়" ভিক্ষুরা ভিক্ষুণীদের প্রণয়াকর্ষণের জন্য তাহাদের গায়ে জল ছিটাইত ও অন্যপ্রকার অভদ্রতা ও অশ্লীলতা করিত। অপরাধী ভিক্ষুকে ভিক্ষুণীরা নমস্কার করিবে না, এই শাস্তির ব্যবস্থা হইল। ভিক্ষুণীরা অভদ্রতা করিলে তাহাদের এই শাস্তি হইল যে তাহারা ভিক্ষুবিহারে প্রবেশ করিতে পারিবে না। "ষড়্‌বর্গীয়" ভিক্ষুদের মত ভিক্ষুণীদেরও অনেকে বস্ত্রাদি বিষয়ে আতিশয্য করিত। মল্লবংশীয়া এক ভিক্ষুণী এক ক্ষীণজীবী ভিক্ষুকে পথে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিয়াছিল। উপপতির সহিত মিলনের ফলে এক প্রোষিতভর্তৃকা নারীর গর্ভসঞ্চার হইয়াছিল এবং এক ভিক্ষুণী এই নারীকে ব্যভিচারে সহায়তা করিত। গর্ভবতী অকালে গর্ভপাত করাইয়া ভিক্ষুণীকে ভিক্ষাপাত্রে লুকাইয়া ভ্রূণ সরাইয়া ফেলিতে বলিল। ভিক্ষুণী ভিক্ষাপাত্র উত্তরীয়ে ঢাকিয়া ভ্রূণ লইয়া যাইতেছিল, পথে এক ভিক্ষুর সহিত দেখা হইলে ভিক্ষু তাহাকে ভিক্ষার অংশ গ্রহণ করিতে বলিল, কারণ সে অন্য ভিক্ষু বা ভিক্ষুণীকে অংশ না দিয়া ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিত না। ভিক্ষুণী প্রথমে সম্মত হইল না, অবশেষে অনেক পীড়াপীড়ির পর পাত্রের আচ্ছাদন খুলিলে ব্যাপার দেখিয়া ভিক্ষু বিরক্ত হইয়া অন্যদিগকে ও বুদ্ধকে জানাইল। ইহাতে নিয়ম হইল ভিক্ষুণীরা নিজ ভিক্ষাপাত্র খুলিয়া ভিক্ষুদের দেখাইবে।

অর্দ্ধকাশী নাম্নী এক বারনারী প্রব্রজ্যা লইয়াছিল। স্বয়ং বুদ্ধের নিকট উপসম্পদা লইবার জন্য সে শ্রাবস্তীতে যাইবে স্থির করিল এবং ইহা জানিয়া দুষ্টলোকেরা শ্রাবস্তীর পথে অপেক্ষা করিয়া রহিল। অর্দ্ধকাশী সংবাদ পাইয়া লোকমুখে বুদ্ধকে ইহা জানাইলে তিনি অন্যলোকের মুখে তাহাকে উপসম্পদা দানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

দব নামক এক মল্লবংশীয় ভিক্ষুর উপর রাগিয়া অন্য কয়েক ভিক্ষু এক ভিক্ষুণীকে প্ররোচনা করিয়া বুদ্ধের কাছে অভিযোগ করাইয়াছিল যে দব তাহার ধর্মনাশ করিয়াছে। বুদ্ধ দবকে জানিতেন; দবের এবিষয়ে কিছু

স্মরণ আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলে দব বলিল "ভগবান আমাকে জানেন।" বুদ্ধ বলিলেন শুধু আত্মমর্যাদার দ্বারাই আত্মসমর্থন হয় না, দবকে এবিষয়ে স্পষ্ট উত্তর দিতে হইবে। তখন দব বলিল সে জীবনে কখনও, এমন কি স্বপ্নেও অব্রহ্মচর্য করে নাই। দবের কথায় বিশ্বাস করিয়া বুদ্ধ ভিক্ষুণীকে সংঘ হইতে বহিষ্কার করিতে বলিয়া সেখান হইতে উঠিয়া গেলেন। তখন প্ররোচক ভিক্ষুরা আসিয়া অপরাধ স্বীকার করিল।

ভিক্ষুণীসংঘে আরও বহুপ্রকার দোষত্রুটি ও অপরাধ প্রকাশ পাইত, সে সবের বিশদ বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন।

[ধম্মপদট্ঠকথা ; মহাবগ্গ ও চুল্লবগ্গ ; মহাপদুমজাতক ; থেরীগাথা-টীকা ; দিব্যাবদান।]



পুষ্পপাত্রহস্তে নারী—অজন্তাচিত্র

৯

সংঘে গোলযোগ

নবম বর্ষার পর বুদ্ধ যখন কৌশাম্বীতে ছিলেন তখন রানী মাগন্দিয়া লোক লাগাইয়া বুদ্ধকে কিরূপ নির্যাতন করিয়াছিল, সেকথা পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। দশম বর্ষে কৌশাম্বীভিক্ষুদের মধ্যে মহা বিসম্বাদ আরম্ভ হইল, ইহাতেও হয়তো মাগন্দিয়ার প্ররোচনা ছিল। বিবাদের আরম্ভ হয় অতি সামান্য বিষয় লইয়া। এক ভিক্ষু শৌচাগারে জল ফেলিয়াছিল, তাহাতে আর এক ভিক্ষু তাহাকে দোষ দিল। প্রথম ভিক্ষু বলিল সে ইচ্ছা করিয়া জল ফেলে নাই, তাহাতে দ্বিতীয় ভিক্ষু বলিল তবে তাহার কোনও অপরাধ হয় নাই। তারপর দ্বিতীয় ভিক্ষু গিয়া তাহার সঙ্গীদের বলিল প্রথম ভিক্ষু অপরাধ করিয়াছে কিন্তু তাহা বুঝিতেছে বা স্বীকার করিতেছে না। একথা লইয়া আলোচনা হইতে লাগিল এবং প্রথম ভিক্ষু সঙ্গীদের মুখে ইহা শুনিয়া বলিল দ্বিতীয় ভিক্ষু মিথ্যাবাদী কারণ একবার কোনও অপরাধ হয় নাই বলিয়া এখন সে উল্টা কথা বলিয়া বেড়াইতেছে। প্রথম ভিক্ষুর কথাও প্রচার হইয়া দ্বিতীয় ভিক্ষুর কানে গেল। দ্বিতীয় ভিক্ষু তখন দল জুটাইয়া প্রথম ভিক্ষুকে সংঘচ্যুত করাইল। ইহাতে মহা বিবাদ আরম্ভ হইল, প্রথম ভিক্ষুও দল জুটাইয়া তাহার সংঘচ্যুতিতে আপত্তি করিল। দুই পক্ষই দল বাড়াইতে লাগিল এবং ভিক্ষুণীদিগকেও নিজ নিজ দলে টানিল। যেখানেই একাধিক ভিক্ষু একত্র হইত সেখানেই তর্কাতর্কি বিবাদ আরম্ভ হইত। বুদ্ধকে জানান হইল যে যাহারা প্রথম ভিক্ষুকে সংঘচ্যুত করিয়াছে তাহারা বলিতেছে উহা বিধানানুযায়ীই হইয়াছে কিন্তু প্রথম ভিক্ষুর দল বলিতেছে উহা অবৈধ হইয়াছে এবং যাহারা সংঘচ্যুতির অনুমতি দিয়াছে তাহাদের নিষেধব্যবস্থা সত্ত্বেও তাহারা প্রথম ভিক্ষুর পক্ষসমর্থন করিতেছে। বুদ্ধ তাহাদের মিটমাট করিতে বলিয়া পাঠাইলেন কিন্তু ভিক্ষুরা শুনিল না, সর্বত্র দ্বন্দ্বকোলাহল বাধিয়া গেল। প্রায় সব ভিক্ষুই কোন না কোনও পক্ষ লইল কিন্তু কৌশাম্বীর ভিক্ষুরাই সর্বাপেক্ষা অধিক গোলযোগ করিল এবং কিছুতেই তাহাদিগকে নিরস্ত করা গেল না। বুদ্ধ শেষে তাহাদের নিকটে গিয়া

অনেক উপদেশ, অনেক গল্প উদাহরণ দ্বারা একতার প্রয়োজন ও দলাদলি বিসম্বাদের অনর্থ বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। তাঁহার সম্মুখে ভিক্ষুরা চুপ করিয়া থাকিত, তাঁহার উপদেশমত কাজ করিবে, বিবাদে নিরস্ত হইবে বলিত কিন্তু তিনি উঠিয়া গেলেই আবার বিবাদ বিসম্বাদ তর্ক আরম্ভ হইত। ভিক্ষুদের আচরণে বহুসহনশীল বুদ্ধেরও ধৈর্যচ্যুতি হইল, তিনি অতিষ্ট হইয়া উঠিলেন এবং কিছুতেই ইহাদেব সুবুদ্ধি হইতেছে না দেখিয়া বিরক্ত হইয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া সকলের অজ্ঞাতসারে একদিন একাকী সংঘত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

কয়েকস্থানে ঘুরিয়া বুদ্ধ প্রাচীনবংশদাব নামক একটি বাঁশবনে আসিলেন, সেখানে অনুরুদ্ধ নন্দিয় ও কিম্বিল নামে তিনজন ভিক্ষু বাস করিত। ইহারা পূর্বে ধনীসন্তান ছিল, বাঁশবনের রক্ষক বুদ্ধকে ঐ ধনীপুত্রদের বিরক্ত করিতে নিষেধ করিল। বুদ্ধের সহিত রক্ষকের কথা শুনিতে পাইয়া অনুরুদ্ধ দৌড়িয়া আসিয়া রক্ষককে নিরস্ত করিল। বুদ্ধ ভিক্ষুত্রয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন তাহারা শান্তিতে ও বিনাদ্বন্দ্বে আছে কিনা। তাহাদের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ নাই শুনিয়া তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন কিরূপে ইহা সম্ভব হইল। তাহারা বলিল তাহারা পরস্পরের প্রতি কার্যে ও চিন্তায় বন্ধুত্ব দেখায় ও প্রত্যেকেই নিজ নিজ ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া অপরদের ইচ্ছানুসারে কাজ করে, যে প্রথমে ভিক্ষাটন হইতে ফিরে সে অপর দুইজনের জন্য জল গামছা ও আসন প্রস্তুত করিয়া রাখে, যে সকলের শেষে ফিরে সে এগুলি যথাস্থানে আবাব রাখিয়া দেয় এবং বাকি দুইজনেব আহারের পর যাহা বাঁচে তাহা খাইয়া আহারের স্থান ধুইয়া মুছিয়া রাখে, প্রত্যেকে সর্বদা অপরের সুবিধা অসুবিধার কথা বিবেচনা করিয়া এইভাবে বিনাদ্বন্দ্বে থাকে। বুদ্ধ তাহাদের প্রশংসা কবিলেন; কৌশাম্বী-ভিক্ষুদের স্মরণে ইহাদের কথায় তাঁহার সম্ভবতঃ একটু আশ্চর্যই বোধ হইয়াছিল। এখান হইতে তিনি পারিলেয্যক নামক গ্রামের অনতিদূরে এক নির্জন বনে একটি শালগাছের নীচে কুটিব বানাইয়া একাকী বর্ষাযাপন করিলেন। ভিক্ষুদের দ্বন্দ্বকোলাহল ছাড়িয়া আসিয়া এখানে তাঁহার পরমশান্তি বোধ হইল। একটি বন্যহস্তী নাকি এখানে তাঁহার বশ হইয়াছিল। বর্ণিত আছে হস্তীটি তাঁহাকে জল আনিয়া দিত, সর্বদা কুটিরের দ্বারে

বসিয়া থাকিত এবং তিনি ভিক্ষায় গ্রামে বাহির হইলে তাঁহার পিছনে পিছনে যাইত। গ্রামের লোক হাতি দেখিয়া ভয় পাইলে বুদ্ধ হাতিকে আদর করিয়া কাছে ডাকিয়া লোককে আশ্বস্ত করিতেন। হাতিটি অনেক সময়ে তাঁহার ভিক্ষাপাত্র বহন করিত ও লোকে ভিক্ষা দিতে আসিলে পাত্র বাড়াইয়া ভিক্ষা লইত। মহাবগ্‌গের এই কাহিনীটিই বোধহয় বাড়াইয়া ধম্মপদট্‌ঠকথায় একটি বানর ভক্তের কথাও যোগ করা হইয়াছে, বানরটি তাঁহার সেবা করিত ও একবার বন্যমধু আনিয়া তাঁহাকে খাইতে দিয়াছিল।

এদিকে বুদ্ধের সংঘত্যাগে গৃহীভক্তদের মধ্যে ভিক্ষুদের প্রতি অত্যন্ত অসন্তোষের সৃষ্টি হইল। কৌশাম্বীর গৃহস্থেরা ভিক্ষুদিগকে ভিক্ষাদান বন্ধ করিলেন, দুষ্টেরা তখন জব্দ হইয়া আপোষে বিবাদ মিটাইয়া ফেলিল। গৃহস্থেরা বলিলেন শুধু তাহাতে হইবে না, বুদ্ধ যদি তাহাদের ক্ষমা করেন তবে তাঁহারা আবার ভিক্ষা দিতে আরম্ভ করিবেন, নচেৎ দিবেন না। ভিক্ষুরা গত্যন্তর না দেখিয়া বুদ্ধের অন্বেষণে বাহির হইল। বুদ্ধের সংঘত্যাগে অনাথপিণ্ডদ উদ্বিগ্ন হইয়া আনন্দকে গিয়া ধরিলেন যে ভগবানকে ফিরাইয়া আনিতে হইবে। আনন্দ কয়েকজন ভিক্ষুকে সঙ্গে লইয়া পারিলেয্যক বনে চলিলেন এবং বনে প্রবেশ করিবার পূর্বে অন্য ভিক্ষুদের বাহিরে রাখিয়া একাকী বুদ্ধের সমীপে গেলেন। বুদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন আনন্দ একা আসিয়াছেন, না সঙ্গে অন্য ভিক্ষুরাও আছে এবং আর যাহারা আসিয়াছে তাহাদেরও তাঁহার নিকট আনিতে বলিলেন। কৌশাম্বীর দুষ্টরা কেহ আছে কিনা দেখিবার জন্যই তিনি বোধহয় এরূপ করিয়াছিলেন। আনন্দ অনাথপিণ্ডদের সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইয়া ফিরিবার জন্য বহু মিনতি করিলে বুদ্ধ অবশেষে সম্মত হইলেন।

বুদ্ধ জেতবনে ফিরিয়াছেন শুনিয়া কৌশাম্বীর দুষ্টেরা সেখানে উপস্থিত হইল। ইহাদের আগমন সংবাদ শুনিয়া সারিপুত্র অনাথপিণ্ডদ বিশাখা মহাপ্রজাবতী প্রভৃতি বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিতে আসিলেন ইহাদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে। বুদ্ধ সারিপুত্রকে বলিলেন "যাহাদের কথা তোমার ন্যায্য মনে হয়, তুমি তাহাদের পক্ষসমর্থন করিও"; অনাথপিণ্ডদকে বলিলেন "উভয় দলকেই দান ও ভিক্ষা দিবে, উভয় দলেরই কথা শুনিবে এবং যাহারা

ন্যায্য কথা বলে মনে কর, তাহাদের সহিত যোগ দিবে"; মহাপ্রজাবতীকে বলিলেন "উভয় দলের কথা শুনিবে ও যাহারা ন্যায্য কথা বলে তাহাদের কথা গ্রহণ করিবে এবং ভিক্ষুসংঘের নিকট যখন ভিক্ষুণীদের কোনও প্রয়োজন উপস্থিত হইবে তখন যাহারা ন্যায্য বলে কেবল তাহাদেরই নিকট যাইবে"। কৌশাম্বীভিক্ষুরা উপস্থিত হইলে সারিপুত্র বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলেন তাহাদের বাসস্থানের কি ব্যবস্থা করা হইবে; বুদ্ধ বলিলেন তাহাদের পৃথক বাসস্থান দিতে হইবে কিন্তু দানভিক্ষাদি সম্বন্ধে যেন কোনও তারতম্য করা না হয়। বুদ্ধের এই বিধানগুলিতে মনে হয় তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল কৌশাম্বীভিক্ষুদের বুঝাইয়া দেওয়া যে তাহাদের কোনও অনিষ্ট করা বা তাহাদিগকে কোনও কষ্ট দেওয়া সংঘের অভিপ্রেত নহে, কিন্তু সংঘ তাহাদের সহিত 'অহিংস অসহযোগ' করিতেছে। বুদ্ধ অন্য ভিক্ষুগণকে কৌশাম্বীভিক্ষুদের সহিত বসিতে বা দাঁড়াইতে নিষেধ করিয়া দিলেন। কেহ কৌশাম্বীভিক্ষুদের কথা জিজ্ঞাসা করিলে বুদ্ধ আঙুল দিয়া তাহাদের দেখাইয়া বলিতেন "এই যে, ইহারাই সেই কৌশাম্বীর ভিক্ষুদল!"—এইরূপে লজ্জা দিয়া তিনি তাহাদের চৈতন্যোদয়ের চেষ্টা করিলেন। ফলে যে ভিক্ষু দোষ করিয়াছিল, সে তাহা স্বীকার করিল এবং তাহার দলের লোককে ইহা জানাইলে তাহারাও স্বীকার করিল যে তাহারই অপরাধ ছিল। অপরপক্ষকেও ইহা জানান হইল এবং দুইদল বুদ্ধের কাছে উপস্থিত হইলে তিনি বলিলেন অপরাধী যখন অপরাধ স্বীকার করিতেছে তখন সংঘের সভা ডাকাইয়া সকলে শান্তিস্থাপন করুক।

সংঘের ইতিহাসে দেখা যায় সামান্য সামান্য বিষয় লইয়া নিয়তই বিবাদ হইত।

[মহাবগ্গ; ধম্মপদট্ঠকথা।]

৯০

বুদ্ধের সমবেদনা ও সৌজন্যকুশলতা

আলবিতে একটি দরিদ্রলোক বুদ্ধের উপদেশ শুনিতে আসিত। একদিন উপদেশ আরম্ভের সময়ে এই লোকটিকে অনুপস্থিত দেখিয়া বুদ্ধ তাহার অপেক্ষায় বসিয়া রহিলেন। লোকটির একটি গরু হারাইয়া গিয়াছিল, গরু খুঁজিতে তাহার দেরি হইয়া গেল এবং গরু পাইবামাত্র সে অনাহারে ক্লান্তশরীরে বুদ্ধের কাছে আসিল। তাহার অবস্থা দেখিয়া বুদ্ধ ভিক্ষুদের জিজ্ঞাসা করিলেন আহার্য কিছু আছে কিনা ও লোকটিকে আহার করাইতে বলিলেন এবং তাহার আহার শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি উপদেশ আরম্ভ করিলেন না। আহারের পর লোকটি সুস্থ বোধ করিলে বুদ্ধ উপদেশ দিলেন। কথিত আছে জীবনে এই একমাত্র ঘটনায় বুদ্ধ ভিক্ষুদিগকে আহার্যের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন এবং অন্য লোককে আহার দিতে বলিয়াছিলেন। এ সম্পর্কে মনে রাখা প্রয়োজন যে সেযুগে মানুষের অন্য দুঃখকষ্ট যতই থাকুক, অন্নের অভাব হইত এরূপ দরিদ্রের সংখ্যা খুব বেশি ছিল না। দুর্ভিক্ষাদি ব্যতীত অন্নাভাবে লোকে বহুকষ্ট পাইতেছে বা মারা পড়িয়াছে এরূপ ঘটনা বৌদ্ধ বা জৈন শাস্ত্রে প্রায় দেখা যায় না। আলবি হইতে ফিরিবার পথে ভিক্ষুরা সামান্য একজন লোকের জন্য উপদেশ বন্ধ রাখিয়া তাহার প্রতি অত বেশি দৃষ্টি দিবার জন্য একটু লঘুভাবে বুদ্ধের বিরুদ্ধে মন্তব্য করিতেছিল। বুদ্ধ শুনিতে পাইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন "ভিক্ষুগণ, ক্ষুধার মত যন্ত্রণা আর নাই। আমি দেখিলাম এই যন্ত্রণা ভোগ করিতে করিতে উপদেশশ্রবণ তাহার পক্ষে বৃথা হইত, কারণ উপদেশে তাহার মন লাগিত না এবং সে তাহা ঠিক বুঝিতেও পারিত না।"

এক ভিক্ষুর উদরাময় হইয়াছিল, সে মূত্রপুরীষে লিপ্ত হইয়া পড়িয়া ছিল। আনন্দকে সঙ্গে লইয়া ভিক্ষুদের শয়নস্থান দিয়া যাইবার সময়ে এই পীড়িতভিক্ষুকে সেই অবস্থায় দেখিতে পাইয়া ভিক্ষুর কাছে আসিয়া বুদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন "ভিক্ষু, তোমার কি অসুখ হইয়াছে?"

"ভদন্ত, আমার পেটের অসুখ হইয়াছে";

"তোমার শুশ্রূষার জন্য কি কেহ আছে?"

"না, ভদন্ত";

"ভিক্ষুরা তোমার শুশ্রূষা করে না কেন?"

"ভদন্ত, আমি ভিক্ষুদের কোনও কাজ করিতে পারি না, তাই ভিক্ষুরা আমার শুশ্রূষা করে না।"

একথা শুনিয়া বুদ্ধ আনন্দকে বলিলেন "আনন্দ, জল আন, এই ভিক্ষুকে স্নান করাইব"। আনন্দ দৌড়িয়া জল লইয়া আসিলেন। বুদ্ধ জল ঢালিতে ও আনন্দ তাহাকে ধোয়াইতে লাগিলেন এবং তারপর উভয়ে ধরাধরি করিয়া তাহাকে খাটের উপর তুলিয়া শোয়াইয়া দিলেন। পরে বুদ্ধ ভিক্ষুদের ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন অমুক স্থানে একজন পীড়িত ভিক্ষু আছে তাহারা জানে কিনা এবং ভিক্ষুরা তাহার শুশ্রূষা করে না কেন? ভিক্ষুরা বলিল পীড়িত ভিক্ষুর কথা তাহারা জানে বটে কিন্তু ঐ ভিক্ষু তাহাদের কোনও কাজ করে না বলিয়া কেহ তাহার শুশ্রূষা করে না। বুদ্ধ বলিলেন "হে ভিক্ষুগণ, যাঁহারা তোমাদের শুশ্রূষা করিবেন সেই মাতাপিতা তোমাদের নাই; তোমরা যদি পরস্পরের সেবাশুশ্রূষা না কর তবে কে আর তোমাদের করিবে? ভিক্ষুগণ, যে আমার সেবা করিতে চাহে সে যেন পীড়িতের সেবা করে। পীড়িতের যদি উপাধ্যায় থাকেন তবে উপাধ্যায়ের, যদি আচার্য থাকেন তবে আচার্যের, নতুবা সার্দ্ধবিহারী বা অন্তেবাসী বা সহ-সার্দ্ধবিহারী বা সহ-অন্তেবাসী থাকিলে তাহাদের উচিত যতক্ষণ পর্যন্ত পীড়িতের প্রাণ থাকে বা যতদিন পর্যন্ত সে নীরোগ না হয় ততদিন তাহার সেবাশুশ্রূষা করা; ইহাদের মধ্যে কেহ না থাকিলে সমগ্র সংঘের উচিত তাহার সেবা করা"।

শ্রাবস্তীর ব্রাহ্মণ ও অন্য কোন কোনও সম্প্রদায়ের লোকেরা তাহাদের পুত্রদিগকে বুদ্ধভক্তদের ছেলেদের সহিত খেলিতে, ভিক্ষুদের নমস্কার করিতে বা জেতবনে যাইতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিল। একদিন ইহাদের কতকগুলি বালক জেতবনের সন্নিকটে খেলা করিতেছিল। খেলার সময়ে ছেলেদের আত্মপরভেদজ্ঞান থাকে না, এই দলে একটি বুদ্ধভক্তের ছেলেও ছিল। খেলিতে খেলিতে তাহাদের তৃষ্ণাবোধ হইল, তাহারা বৌদ্ধ ছেলেটিকে

জেতবনের মধ্যে গিয়া জলপান করিয়া তাহাদেরও জন্ত জল লইয়া আসিতে বলিল। ছেলেটি জেতবনে গিয়া সোজা গন্ধকুটিতে ঢুকিয়া বুদ্ধের কাছে জল চাহিল। দ্বিপ্রহরে ভিক্ষুদের বিশ্রামের সময়, বুদ্ধ নিজে জল আনিয়া বালককে দিলেন ও তাহার সঙ্গীদের ভিতরে ডাকিয়া আনিতে বলিলেন। ছেলেরা আসিলে তিনি সকলকে জল দিয়া তাহাদের বোধ্য বিষয়ে উপদেশ দিলেন। ছেলেরা বাড়ী ফিরিয়া মাতাপিতাকে জেতবনে প্রবেশ করিয়া বুদ্ধের হাতে জল খাওয়ার কথা বলিলে বাপমারা শুনিয়া আতঙ্কিত হইল। পাড়ার কয়েকজন বিজ্ঞলোক বাপমাদের বুঝাইল ও বুদ্ধের উপদেশ শুনাইল। বাপমারা তখন বলিল "আমাদের ছেলেদের শ্রমণ গৌতমের কাছেই শিক্ষার জন্ত পাঠাইব"। তাহারা বুদ্ধের কাছে গিয়া তাঁহার উপদেশ শুনিয়া তাঁহার ভক্ত হইল।

শ্রাবস্তীতে তিষ্য নামক ভিক্ষুর উৎকট চর্মরোগ হইয়াছিল, রোগ এমন বীভৎস হইল যে, কেহ তাহার কাছে না গিয়া তাহাকে বাহিরে ফেলিয়া রাখিয়াছিল। বুদ্ধ দেখিয়া তাহাকে স্নান করাইবার জন্ত জল গরম করাইলেন ও তাহাকে স্নানের ঘরে লইয়া যাইতেছিলেন কিন্তু ভিক্ষুরা তাঁহাকে লইতে না দিয়া নিজেরাই লইয়া গেল। বুদ্ধ তিষ্যের বস্ত্রাদি ধোয়াইয়া শুখাইয়া রাখিলেন ও নিজহাতে তাহাকে স্নান করাইলেন। স্নানের পর শুষ্কবস্ত্র পরিয়া যখন তাহার শরীর সুস্থ ও মন প্রসন্ন বোধ হইল তখন বুদ্ধ তাহাকে শরীর সম্বন্ধে শিক্ষা দিলেন।

একবার লিচ্ছবিদের অনেকে তাহাদের সভাগৃহে বসিয়া বুদ্ধের প্রশংসা করিতেছিল। লিচ্ছবি সেনাপতি সিংহও সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। সেনাপতি সিংহ জৈনগুরু মহাবীরের ভক্ত ছিলেন কিন্তু স্ববংশীয়দের মুখে বুদ্ধের প্রশংসা শুনিয়া তাঁহার বুদ্ধকে দেখিবার ইচ্ছা হইল। বর্ণনায় আছে তিনি মহাবীরের নিকট বুদ্ধের সহিত সাক্ষাতের অনুমতি চাহিলে মহাবীর বলিলেন "সিংহ, তুমি ক্রিয়াবাদী; অক্রিয়াবাদী শ্রমণ গৌতমের সহিত তুমি সাক্ষাৎ করিবে কেন? শ্রমণ গৌতম ক্রিয়াবাদে বিশ্বাস করেন না, তিনি অক্রিয়াবাদী ও শিষ্যদিগকে অক্রিয়াবাদ শিক্ষা দিয়া থাকেন।" গুরুর মুখে এই কথা শুনিয়া সিংহের বুদ্ধসন্দর্শনের ইচ্ছা নির্বাপিত হইল কিন্তু লিচ্ছবিদের মুখে পুনরায় বুদ্ধের সুখ্যাতি শুনিয়া সিংহের বুদ্ধকে দেখিবার ইচ্ছা পুনরায়

জাগ্রত হইল। তিনি মহাবীরের অনুমতি লইতে গেলে মহাবীর নাকি সেই একই কথা বলিলেন।

যুদ্ধব্যবসায়ী স্বাধীনচেতা সেনাপতির বারবার এরূপ বাধা ভাল লাগিল না, তিনি অবশেষে ভাবিলেন "নিগ্রন্থদের জিজ্ঞাসা করি আর না করি উহারা আমার কি করিতে পারে? আমি উহাদের জিজ্ঞাসা না করিয়াই বুদ্ধের কাছে যাইব।" তারপর একদা দিনের বেলায় প্রকাশ্যে বহু যান-বাহন সঙ্গে লইয়া সিংহ বুদ্ধের সহিত সাক্ষাতের জন্য বৈশালী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। এই উচ্চপদস্থ অভিজাত প্রভাবশালী এবং বিরোধী-সম্প্রদায়ভুক্ত সম্ভ্রান্তব্যক্তিকে বুদ্ধ যেরূপ সুকৌশলে বশ করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার লোকচরিত্র সম্বন্ধে জ্ঞান ও ব্যবহারদক্ষতা দেখিয়া মনে হয় বৃথা তাঁহার রাজবংশে জন্ম হয় নাই। বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইয়া অভিবাদনাদির পর সিংহ বলিলেন "ভদন্ত, শুনিয়াছি লোকে বলে শ্রমণ গৌতম অক্রিয়াবাদী, শিষ্যদিগকে অক্রিয়াবাদ শিক্ষা দিয়া থাকেন; যাহারা ভগবান সম্বন্ধে এরূপ বলে তাহারা কি ঠিক বলে, না মিথ্যা বলে? ধর্ম সম্বন্ধে এরূপ বাদানুবাদে কোনও দোষ নাই, আমাদের ইচ্ছা যে ভগবান সম্বন্ধে মিথ্যা অপবাদ প্রচার না হয়।"

বুদ্ধ বলিলেন "সিংহ, এক অর্থে আমার সম্বন্ধে সত্যই বলা যায় শ্রমণ গৌতম অক্রিয়াবাদী, শিষ্যদিগকে অক্রিয়াবাদ শিক্ষা দিয়া থাকেন, আবার এক অর্থে আমার সম্বন্ধে সত্যই বলা যায় আমি ক্রিয়াবাদী; এক অর্থে আমার সম্বন্ধে সত্যই বলা যায় আমি উচ্ছেদবাদী; এক অর্থে সত্যই বলা যায় আমি জুগুপ্সু, জুগুপ্সিত বিষয়ে শিক্ষা দিয়া থাকি; এক অর্থে সত্যই বলা যায় আমি বৈনয়িক, বিনয় সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়া থাকি; এক অর্থে সত্যই বলা যায় আমি তপস্বী, তপস্যা শিক্ষা দিয়া থাকি; এক অর্থে সত্যই বলা যায় আমি 'অপগব্‌ভ'; এবং এক অর্থে সত্যই বলা যায় আমি আশ্বস্ত। কি ভাবে ও কি অর্থে আমার সম্বন্ধে সত্যই এরূপ বলা যায়? সিংহ, যে কর্ম অসাধু তাহা কার্যে চিন্তায় ও বাক্যে না করা আমি শিক্ষা দিই, এই অর্থে আমাকে অক্রিয়াবাদী বলা যায়; যে কাজ সাধু তাহা আমি কার্যে বাক্যে ও চিন্তায় করিতে শিক্ষা দিই, এই অর্থে আমাকে ক্রিয়াবাদী বলা যায়। আমি রাগ দ্বেষ ও মোহের উচ্ছেদ শিক্ষা দিই, এই অর্থে আমি উচ্ছেদবাদী; চিন্তায় বাক্যে ও

কার্যে অসাধু আচরণ আমি জুগুপ্সিত মনে করি, এই অর্থে আমি জুগুপ্সু; রাগ দ্বেষ ও মোহের আমি বিনয়ন শিক্ষা দিই, এই অর্থে আমি বৈনয়িক; মনের যে ভাবগুলি পুণ্য নহে অপুণ্য, চিন্তায় বাক্যে ও কার্যে যাহা অসাধু, এ সকল আমি তপনীয় মনে করি, এই অর্থে আমি তপস্বী; আমার আর ইহলোকে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে না, এই অর্থে আমি অপ্রগর্ভ; আমি শ্রেষ্ঠ আশ্বাস পাইয়াছি, এই অর্থে আমি আশ্বস্ত।"

"ভদন্ত, আপনি যাহা বলিলেন তাহাতে যাহা আমার নিকট অপ্রকাশ ছিল তাহা প্রকাশ হইল।"

বুদ্ধের উত্তর হইতে বুঝা যায় যে সাধারণতঃ ব্যবহৃত ধর্মদার্শনিক কতকগুলি পারিভাষিক শব্দ তিনি অন্য অর্থে ব্যবহার করিয়াছিলেন—জুগুপ্সু শব্দের মূল গুপ্-ধাতুর অর্থ গোপন করাও হইতে পারে, ঘৃণা করাও হইতে পারে; 'অপগব্ভ' শব্দের অর্থ সাধারণে 'অপ্রগল্ভ' ধরিত, অর্থাৎ বুদ্ধ সকল বিষয়ে প্রকাশ করিয়া বলেন না, বুদ্ধ কিন্তু উহা 'অপ্রগর্ভ' অর্থে ব্যবহার করিয়াছিলেন।

সেনাপতি সিংহ শিক্ষিত বুদ্ধিমান ও চিন্তাশীল লোক ছিলেন। তাঁহার প্রথম কথা হইতেই বুঝা যায় তিনি স্ববংশীয়দের মুখে বুদ্ধের প্রশংসা এবং স্বীয় গুরু ও ধর্মসম্প্রদায়ের লোকের মুখে তাঁহার নিন্দা শুনিয়া কোন্‌টা সত্য তাহা নির্ণয়ের জন্য বুদ্ধের নিকট আসিয়াছিলেন। সত্যনির্ণয়ের জন্য তাঁহার আগ্রহও যে খুব প্রবল ছিল তাহা মহাবীরের নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া বুদ্ধের নিকট তাঁহার আগমনেই প্রকাশ পায়। ক্রিয়াবাদ জৈনমতবাদের মূল-ভিত্তি; যে অর্থে বুদ্ধ উহা প্রয়োগ করিলেন তাহাতে সিংহের মত চিন্তাশীল লোকের শ্রদ্ধা হইবে তাহা তিনি জানিতেন। অন্য অনেক লোককে করিলেও সিংহকে তিনি বুদ্ধি বা তর্ক দ্বারা জয় করিবার চেষ্টা করেন নাই, সিংহের শ্রদ্ধা উদ্রেক করিয়া তিনি তাঁহাকে জয় করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সিংহের সহিত বুদ্ধের আরও অনেক কথা হইল এবং সিংহ শ্রদ্ধালু হইয়াছেন দেখিয়া বুদ্ধ তাঁহাকে সম্পূর্ণ নিঃসংশয় করিবার জন্য ঔদার্যের পর ঔদার্য দেখাইয়া এইভাবে সিংহকে সম্পূর্ণ অভিভূত করিয়াছিলেন। সিংহ বলিলেন "আজ হইতে যতদিন জীবিত থাকিব ততদিন পর্যন্ত আমি ভগবানের শরণ লইলাম।"

"সিংহ, বিবেচনা করিয়া কাজ করিও, তোমার মত প্রসিদ্ধ লোকের বিশেষ বিবেচনা না করিয়া কাজ করা উচিত নহে।"

"ভদন্ত, ভগবানের এই কথায় আমার আনন্দ ও তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা বাড়িল; অন্য সম্প্রদায়ের লোকেরা আমাকে শিষ্য করিতে পারিলে 'সেনাপতি সিংহ আমাদের শিষ্য হইয়াছেন'—এই বলিয়া সমগ্র বৈশালীতে ঢাক পিটাইয়া বেড়াইত; আমি পুনরায় ভগবানের শরণ লইতেছি।"

"সিংহ, নির্গ্রন্থেরা বহুদিন হইতে তোমার গৃহে অন্নজল পাইয়া আসিতেছে, ভবিষ্যতেও তুমি উহাদের ভিক্ষাদান তোমার কর্তব্য মনে করিও।"

"ভদন্ত, শুনিয়াছিলাম শ্রমণ গৌতম বলেন শুধু তাঁহাকে ও তাঁহার শিষ্যদিগকেই ভিক্ষা দিতে হইবে, অন্য কাহাকেও যেন ভিক্ষা দেওয়া না হয়, শুধু তাঁহাকেই ভিক্ষা দিলে মহাফল লাভ হয়, অন্যকে দিলে হয় না। কিন্তু আজ ভগবান আমাকে নির্গ্রন্থদেরও ভিক্ষা দিতে আজ্ঞা দিতেছেন! সময়মত যথাকর্তব্য করা যাইবে।"

তারপর বুদ্ধ সিংহকে ধর্মোপদেশ দিলেন। সিংহ বিদায় লইবার সময়ে বুদ্ধকে স্বগৃহে আহারের নিমন্ত্রণ করিলেন। এই নিমন্ত্রণ লইয়া ক্রুদ্ধ নির্গ্রন্থেরা বৈশালীনগরে কি কাণ্ড ঘটাইয়াছিল তাহা পরে বলিব। অপর একটি বিষয় এই—জৈনশাস্ত্রে দেখা যায় "আজ হইতে আপনাদেরই ভিক্ষা দিব, আর কাহাকেও দিব না", একথা জৈনরা বহুপ্রশংসার সহিত স্বশিষ্যদের মুখে বলাইয়াছেন। সিংহ যখন বলিলেন "সময়মত যথাকর্তব্য করা যাইবে" তখন বোধহয় তাঁহার মনের ভাব এই ছিল—বুদ্ধ নির্গ্রন্থদের ভিক্ষা দিতে বলিতেছেন, তাহাতে তিনি প্রতিবাদ করিবেন না বটে কিন্তু নির্গ্রন্থেরা আবার তাঁহার নিকট ভিক্ষা লইতে আসিলে তিনি তাহাদের দূর করিয়া দিবেন! তেজস্বী লোক অসত্য বুঝিতে পারিলে তাহার সহিত রফা করে না।

বুদ্ধ একবার কুশীনগরে গেলে মল্লবংশীয়েরা পরামর্শ করিয়া স্থির করিল, যে বুদ্ধকে অভ্যর্থনা করিতে না যাইবে তাহার পাঁচশত কার্ষাপণ অর্থদণ্ড হইবে। মল্লেরা বুদ্ধকে সম্বর্ধনা করিতে আসিলে আনন্দ তাহাদের মধ্যে তাঁহার বন্ধু রোজ নামক একজন মল্লকে দেখিয়া বলিলেন "তুমি যে ভগবানকে অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছ ইহা বড় ভাল কথা।" রোজ বলিলেন "আনন্দ, আমি যে বুদ্ধকে বা তাঁহার ধর্মকে এমন বিশেষ ভক্তি করি তাহা নহে, আমাদের

জ্ঞাতিদের মধ্যে স্থির হয়, যে বুদ্ধকে অভ্যর্থনা করিতে না যাইবে তাহার পাঁচশত কার্ষাপণ দণ্ড হইবে। সেই দণ্ডের ভয়েই আমি আসিয়াছি।" রোজের মুখে এই কথা শুনিয়া আনন্দ দুঃখিত হইলেন। পরে আনন্দ বুদ্ধকে বলিলেন "ভদন্ত, এই রোজ একজন বিখ্যাত ও বিশিষ্ট ব্যক্তি, ইহার মত লোককে ধর্মের প্রতি অনুরাগী করিতে পারিলে খুব ভাল হইবে, ভগবান এরূপ করুন যাহাতে রোজ ধর্মের প্রতি অনুরাগী হয়।" বুদ্ধ বলিলেন "আনন্দ, রোজ যাহাতে ধর্মের প্রতি অনুরাগী হয়, এরূপ করা তথাগতের পক্ষে দুষ্কর নহে।" অর্থদণ্ডের কাহিনীটি সম্ভবতঃ কাল্পনিক, আনন্দই স্বয়ং বোধহয় রোজকে বুদ্ধের সমীপে আনিয়াছিলেন। যাহা হউক রোজ বুদ্ধদর্শনে আসিলে বুদ্ধ তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া এবং বিবিধ সৌজন্য দেখাইয়া তাঁহাকে মুগ্ধ করিলেন। যখন বুদ্ধ দেখিলেন ঔষধ ধরিতে আরম্ভ করিয়াছে তখন তিনি হঠাৎ আসন ছাড়িয়া উঠিয়া চলিয়া গেলেন, রোজ 'গাভীর পশ্চাতে তরুণ বৎসের মত' বিহারের এখানে ওখানে বুদ্ধকে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ভিক্ষুরা বুদ্ধের বাসকক্ষ দেখাইয়া রোজকে বলিল "এইখানে তিনি থাকেন, এখন দ্বার বন্ধ আছে, নিঃশব্দে যাইয়া অর্গল নাড়ুন, ভগবান দ্বার খুলিয়া দিবেন।"

রোজ সেইরূপ করিয়া বুদ্ধের দর্শন পাইলেন। বুদ্ধ তাঁহাকে ধর্মোপদেশদানে তুষ্ট করিলেন। রোজ এতদূর মুগ্ধ হইলেন যে তিনি বলিয়া বসিলেন শুধু তিনিই ভিক্ষুদের সকল প্রয়োজনীয় দ্রব্য দিবেন, ভিক্ষুরা যেন আর কাহারও কাছে ভিক্ষা না লয়। বুদ্ধ ধনীর ধনদর্পে প্রশ্রয় দিবার বা নিজের মর্যাদা কমাইবার পাত্র ছিলেন না, তিনি বলিলেন "রোজ, শিক্ষাধীন যে কেহ ধর্মে তোমার মত অন্তর্দৃষ্টি লাভ করে, সেই মনে করে ভিক্ষুদের শুধু সেই সব দিবে, ভিক্ষুরা যেন অন্যত্র ভিক্ষা না লয়; কিন্তু ভিক্ষুরা তোমার নিকটেও ভিক্ষা লইবে, অপরের নিকটেও ভিক্ষা লইবে।" রোজের সুখ্যাতিও করা হইল, তাঁহার আধিক্যও দমন করা হইল।

[মহাবগ্গ ; ধম্মপদট্ঠকথা।]

১৭

সন্ন্যাসনিয়মাবলী

সোন নামক এক ধনীপুত্র ভিক্ষু হইয়াছিল। সে এত যত্নে লালিতপালিত হইয়াছিল যে তাহার পদতলে নাকি রোম জন্মিয়াছিল। খালিপায়ে থাকা তাহার অভ্যাস ছিল না বলিয়া হাঁটিবার সময়ে তাহার পায়ে রক্ত বাহির হইত। বুদ্ধ তাহাকে পাদুকা ব্যবহার করিতে বলিলেন। সোন বলিল সব ভিক্ষুরা যদি পাদুকা ব্যবহারের অনুমতি পায় তবে সেও পাদুকা ব্যবহার করিবে, নচেৎ নহে। বুদ্ধ তখন সব ভিক্ষুদের সাদাসিধা পাদুকা ব্যবহার করিতে অনুমতি দিলেন। ষড়্‌বর্গীয় ভিক্ষুরা ও অন্য কেহ কেহ নানা রঙের নানা ঢঙের পাদুকা ব্যবহার করিতে লাগিল, লোকে দেখিয়া ভিক্ষুদের বিলাসী বলিয়া নিন্দা করিতে লাগিল। বুদ্ধ জানিতে পারিয়া এগুলির ব্যবহার নিষেধ করিলেন। একদিন বুদ্ধ ভিক্ষায় বাহির হইয়াছিলেন, এক ভিক্ষু তাঁহার পিছনে পিছনে আসিতেছিল, তাহার পায়ে ফোস্‌কা পড়িয়াছিল বলিয়া সে খোঁড়াইতেছিল। ভিক্ষুকে খোঁড়াইতে দেখিয়া একজন উপাসক তাহাকে নিজের দামি নরম জুতা পরিতে দিল কিন্তু নরম পাদুকা ব্যবহার নিষেধ আছে বলিয়া ভিক্ষু তাহা গ্রহণ করিল না। বুদ্ধ ভিক্ষুকে উপাসকের দান গ্রহণ করিতে অনুমতি দিলেন ও বলিলেন অন্যের পরিত্যক্ত জুতা দামি বা 'বাহারে' হইলেও ব্যবহার করা যাইতে পারিবে। বুদ্ধ খালিপায়ে পায়চারি করিতেন বলিয়া স্থবির ভিক্ষুরাও তাহাই করিতেন। ষড়্‌বর্গীয় ভিক্ষুরা জুতা পায়ে পায়চারি করিত। এই অশিষ্ট ব্যবহারের জন্য বুদ্ধ তাহাদের তিরস্কার করিয়া আরামের মধ্যে জুতা ব্যবহার নিষেধ করিলেন।

এক ভিক্ষুর পায়ে মাংসবৃদ্ধি রোগ হইয়াছিল, অন্য ভিক্ষুরা তাহাকে ধরাধরি করিয়া শৌচে লইয়া যাইত। ভিক্ষুদের শয়নস্থান দিয়া যাইবার সময়ে বুদ্ধ একদিন ইহা দেখিয়া বলিলেন রোগবেদনা নিবারণের জন্য আরামের মধ্যেও জুতা ব্যবহার করা যাইতে পারিবে। ভিক্ষুরা ধুলাকাদাময়

পায়ে শয্যায় উঠিয়া শয্যা ময়লা করিত, অন্ধকারে সভাগৃহ বা 'উপোসথ'-গৃহে যাইতে তাহাদের পায়ে কাঁটা ফুটিত বা হোঁচট্ লাগিত ; ইহাতে ব্যবস্থা হইল শয্যায় উঠিবার পূর্বে পরিধানের জন্য আরামের মধ্যে জুতা ব্যবহার করা যাইতে পারিবে এবং অন্ধকারে প্রদীপ ও লাঠি লওয়া যাইবে। ষড়্‌বর্গীয় ভিক্ষুরা প্রাতে উঠিয়া খড়ম পায়ে দিয়া সশব্দে পায়চারি করিতে করিতে রাজা মন্ত্রী যুদ্ধবিগ্রহ বিলাসদ্রব্য ভোজন প্রভৃতি বিষয় লইয়া উচ্চস্বরে বাদানুবাদ করিত, ইহাতে ভিক্ষুদের ধ্যানের ব্যাঘাত হইত, এজন্য খড়ম পায়ে দেওয়া নিষিদ্ধ হইল। খড়ম নিষিদ্ধ হইলে ষড়্‌বর্গীয়েরা ছোট তালগাছ ও অন্য গাছের পাতা ছিঁড়িয়া তাহাতে চটিজুতা বানাইল। ইহাতে অনেক গাছ মারা যাওয়ায় লোকে গাছের প্রাণনাশ করার জন্য ভিক্ষুদের নিন্দা করিতে লাগিল। লোকে গাছপালার প্রাণ আছে মনে করে বলিয়া বুদ্ধ গাছ নাশ ও পাতার চটি ব্যবহার নিষেধ করিলেন।

শ্রাবস্তীর অচিরবতী নদীতে অনেক গাভী পারাপার করিত, ভিক্ষুরা তাহাদের শিং কান প্রভৃতি টানাটানি করিয়া উত্যক্ত করিত। লোকে এবিষয়ে বুদ্ধের কাছে অভিযোগ করিলে তিনি ইহা নিষেধ করিয়াছিলেন। এক ভিক্ষু কোশল রাজ্যের মধ্য দিয়া বুদ্ধের সহিত দেখা করিতে আসিবার সময়ে পীড়িত হইয়া পথপার্শ্বের বৃক্ষতলে গিয়া বসিল। লোকে তাহাকে সেই অবস্থায় দেখিতে পাইয়া গাড়ীতে উঠাইয়া লইতে চাহিল কিন্তু বুদ্ধ গাড়ীচড়া নিষেধ করিয়াছেন বলিয়া ভিক্ষু সম্মত হইল না। পরে সে শ্রাবস্তীতে পৌছিলে একথা শুনিয়া বুদ্ধ পীড়িতাবস্থায় গাড়ী চড়ার অনুমতি দিলেন। ষড়্‌বর্গীয় ভিক্ষুরা অনেক প্রকারের বালিশ ও শয্যাদ্রব্যাদি ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। লোকে দেখিয়া বলিত "ভিক্ষুরা সংসারের বিলাসভোগ করিতেছে"। বুদ্ধ ইহা নিষেধ করিলেন। তখন তাহারা সিংহ ব্যাঘ্র চিতা প্রভৃতি পশুর চর্ম কাটিয়া ছাঁটিয়া শয্যায় ও আসনে ব্যবহার করিতে লাগিল। ইহা নিষিদ্ধ হইলে তাহারা গোচর্ম ব্যবহার আরম্ভ করিল। এক উপাসকের একটি রঙিন চামড়ার বাছুর দেখিয়া এক ভিক্ষুর বড় লোভ হইল, সে উপাসকের দ্বারা বাছুরটিকে বধ করাইয়া চাম্‌ড়াটা বগলে লুকাইয়া বিহারের দিকে রওনা হইলে সন্তানবৎসল গাভীও ভিক্ষুর পিছনে পিছনে চলিল। বিহারের অন্য ভিক্ষুরা

দেখিয়া ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিলে ভিক্ষু কিছু জানে না বলিল কিন্তু শেষে কাঁচা চাম্‌ড়ার রক্তে তাহার চীবর ভিজিয়া উঠিলে সে ধরা পড়িয়া নিগৃহীত হইল। তখন চামড়া ব্যবহার নিষিদ্ধ হওয়ায় ভিক্ষুরা লোকের বাড়ীতে গেলে লোকে বসিবার জন্য যে আসন দিত তাহা চামড়ামোড়া হইলে ভিক্ষুরা তাহাতে বসিতে চাহিত না। বুদ্ধ বলিলেন উপাসকদের এরূপ চামড়ামোড়া আসনে ভিক্ষুরা বসিতে পারিবে কিন্তু শয়ন করিতে পারিবে না।

অবন্তী হইতে ভিক্ষু কাত্যায়ন অন্য এক ভিক্ষুর মুখে বুদ্ধকে অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে বুদ্ধ যেন এই কয়টি বিষয়ে অনুমতি দান করেন— অবন্তী ও দক্ষিণাপথে ভিক্ষুদের সংখ্যা অল্পই, একবার তিন বৎসর চেষ্টা করিবার পর দশজন ভিক্ষু একত্র করিতে পারা গিয়াছিল; বুদ্ধ যেন এই অঞ্চলের জন্য দশজনের কম ভিক্ষু লইয়া সংঘ গঠন ও উপসম্পদা-দানের অনুমতি দেন। এই অঞ্চলের জমি কৃষ্ণবর্ণ অসমান ও কণ্টকময়, এখানে যেন বুদ্ধ মোটা চাম্‌ড়ার চটি ব্যবহারের অনুমতি দেন। দক্ষিণাপথের লোক স্নানপ্রিয়, জলদ্বারা শুদ্ধিসম্পাদন হয় মনে করে, বুদ্ধ যেন এখানকার জন্য বেশি স্নানের অনুমতি দেন। এই অঞ্চলের লোক শয্যায় পশুচর্ম ব্যবহার করে, বুদ্ধ যেন এখানকার জন্য এ বিষয়ে অনুমতি দেন, এবং কেহ কোনও ভিক্ষুকে অন্য ভিক্ষুর জন্য বস্ত্রদান করিলে তাহা গ্রহণ করিতে বুদ্ধ যেন অনুমতি দেন। বুদ্ধ কাত্যায়নের সকল প্রার্থনাতেই সম্মতি দিয়াছিলেন।

জীবক বুদ্ধকে বস্ত্রদান করিবার পর হইতে অনেকে ভিক্ষুদের নানারূপ বস্ত্র দান করিতে লাগিল। কাশীরাজ একবার জীবককে অর্ধসহস্রমুদ্রা মূল্যের একখানি কম্বল উপহার পাঠাইয়াছিলেন, জীবক তাহা বুদ্ধকে দান করেন। বস্ত্রদানের ফলে ভিক্ষুরা 'পংসুকূল' অর্থাৎ পথে কুড়ান কাপড়ে প্রস্তুত চীবর ছাড়িয়া দিল। বুদ্ধ শুনিয়া বলিলেন যাহার ইচ্ছা পংসুকূল-চীবর পরিতে পারিবে। শ্মশানে পংসুকূল সংগ্রহ করা লইয়া ভিক্ষুদের মধ্যে বিবাদ হইত; কেহ কাপড় কুড়াইতে গেল, অন্যেরা না গিয়া ভাগ চাহিল, ইত্যাদি। এই সকল বিষয়েও বুদ্ধকে ব্যবস্থা দিতে হইয়াছিল। লোকে ভিক্ষুদের দিবার জন্য আরামে বস্ত্র লইয়া আসিত কিন্তু ভিক্ষুদের না পাইয়া ফিরাইয়া লইয়া যাইত, ফলে ভিক্ষুরা একবার অল্পই বস্ত্রলাভ করিল।

বুদ্ধ শুনিয়া সংঘে জ্ঞপ্তি দ্বারা একজন উপযুক্ত ভিক্ষুকে দানবস্ত্র গ্রহণের জন্য নির্বাচন করিতে বলিলেন। এই উদ্দেশ্যে নির্বাচিত ভিক্ষুরা কখন কখনও দানবস্ত্র গ্রহণ করিয়া ফেলিয়া রাখিত, ফলে বস্ত্রগুলি নষ্ট হইত। এজন্য বস্ত্রগুলি উঠাইয়া ভালভাবে রাখার জন্য লোকনিয়োগের ব্যবস্থা হইল। বস্ত্র উঠাইবার জন্য নিযুক্ত ভিক্ষুরা কখন কখনও গাছের তলায় বা গাছের কোটরে বস্ত্র রাখিয়া নষ্ট করিত। ইহাতে বস্ত্ররক্ষার জন্য বিশেষ স্থানের ব্যবস্থা হইল। এই ভাণ্ডারেও ইঁদুরে কাটিয়া, বৃষ্টির জল পড়িয়া বস্ত্র নষ্ট হইল। তখন ভাণ্ডার রক্ষণাবেক্ষণ করিবার জন্য লোক নিযুক্ত হইল। ষড়্‌বর্গীয় ভিক্ষুরা একবার ভাণ্ডারক্ষক ভিক্ষুকে তাড়াইয়া দিল। তখন নিয়ম হইল ভাণ্ডাররক্ষীকে কেহ তাড়াইতে পারিবে না। বস্ত্রবিভাগ লইয়াও অনেক গণ্ডগোল হইত, এ বিষয়েও বুদ্ধ বিবিধ নিয়ম করিয়া দিয়াছিলেন। ভিক্ষুরা গোবর বা পাণ্ডুমৃত্তিকা দ্বারা কাপড়ে রং করিত, ইহাতে রং খারাপ হইত; বুদ্ধ জানিয়া গাছের মূল কাণ্ড ছাল পাতা ফুল ও ফল দ্বারা রং করিতে বলিলেন। কাঁচা রঙে কাপড়ে গন্ধ হইত, সেজন্য রং ফুটাইবার অনুমতি এবং সেজন্য প্রয়োজনীয় পাত্রেরও ব্যবস্থা হইল।

একবার রাজগৃহ হইতে দক্ষিণগিরি যাইবার পথে মগধের আলবাঁধা ছোট ছোট বহু অংশে বিভক্ত শস্যক্ষেত্রগুলি দেখিয়া বুদ্ধ আনন্দকে বলিলেন "আনন্দ, দেখিতেছ মগধের শস্যক্ষেত্রগুলি কেমন ছোট ছোট, সারিবদ্ধ ও আলবাঁধা অংশসমূহে বিভক্ত?"

"হাঁ ভদন্ত",

"আনন্দ, তুমি ভিক্ষুদের জন্য এরূপ চীবর প্রস্তুত করিতে পারিবে?"

"পারিব, ভগবন্।"

দক্ষিণগিরি হইতে বুদ্ধ রাজগৃহে ফিরিয়া আসিলে আনন্দ এই কথানুযায়ী অনেক ছোট ছোট কাপড়ের টুক্‌রা একত্র করিয়া চারিদিকে মধ্যে কোণে ভালরূপে সেলাই করিয়া চীবর বানাইয়া বুদ্ধকে দেখাইলেন। বুদ্ধ আনন্দের প্রশংসা করিয়া বলিলেন "ভিক্ষুগণ, আনন্দ পণ্ডিত, আনন্দ মহাপ্রাজ্ঞ। আমি যাহা সংক্ষেপে বলি আনন্দ সবিস্তারে তাহার অর্থ বুঝিতে পারে; আনন্দ নানারূপ সেলাইও জানে, চীবর এইরূপই হওয়া উচিত; ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড সংগ্রহ করিয়া মোটা সেলাই করিয়া শ্রমণদের এরূপ চীবর তৈয়ার

করা উচিত যাহাতে শত্রুরও লোভ হইবে না"। ভিক্ষুদের জন্য বুদ্ধ এইরূপ বেশের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন—সকলের নীচে একখানি লুঙ্গির মত কাপড় পরা হইত, ইহাকে 'অন্তরবাসক' বলা হইত। তাহার উপরে উর্দ্ধাঙ্গে একখানি চাদরের মত জড়ান হইত, ইহাকে 'উত্তরাসঙ্গ' বলা হইত। তারপর একখানি বড় মোটা কাপড় ভাঁজ করিয়া কাঁধের উপর রাখা হইত, ইহাকে 'সংঘাটি' বলা হইত, ইহা সতরঞ্চি আসন প্রভৃতিরও কাজ করিত। বুদ্ধ বলিয়াছিলেন এই তিনটিই 'পংস্কুল' হইতে প্রস্তুত হওয়া উচিত।

রাজগৃহ হইতে বৈশালী যাইবার পথে একবার বুদ্ধ দেখিলেন একদল ভিক্ষু চীবরের পুঁটুলি পাকাইয়া কেহ মাথায়, কেহ পিঠে, কেহ বা কোমরে জড়াইয়া চীবরে বোঝাই হইয়া চলিয়াছে। "অচিরেই এই অপদার্থেরা চীবর বিষয়ে বাহুল্য আরম্ভ করিয়াছে!"—এইরূপ চিন্তা করিয়া বুদ্ধ স্থির করিলেন তিনি চীবরের সীমাসম্বন্ধে বিধিপ্রণয়ন করিয়া দিবেন। তখন শীতকাল, খুব হিমপাত হইতেছিল; বুদ্ধ বৈশালীতে পৌঁছিয়া এক রাত্রে একটি মাত্র চীবর পরিধান করিয়া মুক্তস্থানে বসিয়া রহিলেন, তাঁহার শীতবোধ হইল না। রাত্রির দ্বিতীয় যাম অতীত হইলে তাঁহার শীতবোধ হইল, তখন তিনি দ্বিতীয় একটি চীবর পরিলে আর শীত লাগিল না। রাত্রির তৃতীয় যাম অতীত হইলে তাঁহার আবার শীতবোধ হইল, তখন তিনি তৃতীয় একটি চীবর পরিলেন, আর শীত লাগিল না। রাত্রির শেষ যাম অতীত হইয়া যখন অরুণোদয় হইতেছিল তখন তাঁহাব আবার শীতবোধ হইল, তিনি চতুর্থ একটি চীবর পরিলেন, আর শীত লাগিল না। ইহাতে তিনি স্থির করিলেন, যে ভদ্রসন্তানেরা ভিক্ষু হইয়াছে তাহাদের শীত লাগিলে বা শীতভয় হইলে তিনখানি চীববেই চলিবে, ইহাব অতিরিক্ত কাহারও প্রয়োজন হইবে না কারণ দরিদ্রসন্তান যাহারা ভিক্ষু হইয়াছে তাহাদের শীত সহ্য করার অভ্যাস থাকায় ইহার কমেও শীতনিবারণ হইবে। পরে বুদ্ধ ভিক্ষুদের ডাকিয়া উপদেশদানের পব পথে ভিক্ষুদের চীবরবাহুল্য দেখিয়া তাঁহার চিন্তা, তাঁহার সারারাত্রি বসিয়া থাকা প্রভৃতির কথা বলিয়া তাহাদিগকে জানাইলেন যে তিনি ত্রি-চীবরের অনুমতি দিতেছেন। বুদ্ধ ত্রিচীবরের অনুমতি দিয়াছেন শুনিয়া ষড়্‌বর্গীয় ভিক্ষুরা গ্রামে ভিক্ষায় যাইবার জন্য একপ্রস্থ ত্রিচীবর, বিহারে থাকিবার জন্য আর একপ্রস্থ ত্রিচীবর এবং

স্নান করিবার জন্য তৃতীয় একপ্রস্থ ত্রিচীবর ব্যবহার করিতে লাগিল। ইহাতে সংযত ভিক্ষুরা বিরক্ত হইয়া বুদ্ধকে জানাইলে তিনি ইহা নিষেধ করিলেন।

আনন্দের একখানি চীবর বেশি ছিল, তিনি স্থির করিলেন উহা সারিপুত্রকে দিবেন। কিন্তু সারিপুত্র তখন সাকেত নগরে ছিলেন, আনন্দের সংশয় হইল ঐ চীবরখানি লইয়া তিনি কি করিবেন কারণ বুদ্ধ ত্রি-অতিরিক্ত চীবর নিষেধ করিয়াছেন। আনন্দ বুদ্ধকে তাঁহার সমস্যার কথা জানাইলে বুদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন "আনন্দ, সারিপুত্র অনুমান কতদিনে এখানে আসিবেন ?" আনন্দ বলিলেন "ভগবন্, নয় দিনেও হইতে পারে, দশ দিনেও হইতে পারে।" বুদ্ধ তখন ত্রি-অতিরিক্ত চীবর দশদিন পর্যন্ত রাখিবার অনুমতি দিলেন। ভিক্ষুরা ভিক্ষায় ত্রি-অতিরিক্ত চীবর পাইলে সমস্যায় পড়িত ; বুদ্ধ বলিলেন, যে ভিক্ষুদের চীবর নাই, তাহাদিগকে উহা দিয়া দিলে চলিবে। ঋষিপত্তনে বুদ্ধ এক ভিক্ষুকে তাহার 'অন্তরবাসকে' পট্টি লাগাইয়া সেলাই করিতে দেখিয়া ভিক্ষুর অনেক সাধুবাদ করিলেন এবং নূতন বা নূতনের মত বস্ত্রে প্রস্তুত ত্রি-চীবর ব্যতীত পুরাতন জীর্ণবস্ত্রে প্রস্তুত ত্রি-অতিরিক্ত চীবর ব্যবহারেরও অনুমতি দিলেন। আনন্দের উপাধ্যায় স্থবির বেলট্‌ঠসীসের চর্মরোগ হইয়াছিল ও ঘাএর রসে কাপড় গায়ে আঁটিয়া যাইত ; এজন্য বুদ্ধ ঘা ঢাকিবার জন্য অতিরিক্ত বস্ত্র ব্যবহারের অনুমতি দিয়াছিলেন। বিশাখা একখানি মুখ মুছিবার গামছা আনিয়া বুদ্ধকে দিয়া বলিলেন বুদ্ধ উহা গ্রহণ করিলে তিনি আনন্দিত হইবেন। বুদ্ধ গ্রহণ করিয়া ভিক্ষুদের মুখ মুছিবার গামছা ব্যবহারের অনুমতি দিলেন। আনন্দের বন্ধু মল্লবংশীয় রোজ-নামক সেই ভদ্রলোকটি আনন্দের কাছে একখানি বস্ত্র রাখিতে দিয়াছিলেন। আনন্দের একখানি বস্ত্রের প্রয়োজন হওয়ায় তিনি বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলেন তিনি ঐ গচ্ছিত বস্ত্র লইতে পারেন কিনা ; বুদ্ধ বলিলেন, যে গচ্ছিত রাখিতে দিয়াছে সে যদি ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়, জীবিত থাকে বা যাহার কাছে গচ্ছিত আছে সে যদি জানে উহা লইলে দাতা তুষ্টই হইবে, তবে উহা লইতে পারা যাইবে। ভিক্ষুদের জলছাঁক্‌নি ও ঝুলির প্রয়োজন হইলে বুদ্ধ এগুলি ব্যবহারের অনুমতি দিয়াছিলেন।

এক ভিক্ষু অনেকগুলি চীবর পাইয়া উহা তাহার মাতাপিতাকে দিতে ইচ্ছা করিল। ভিক্ষুরা বুদ্ধকে একথা জানাইলে তিনি বলিলেন "মাতা-

পিতাকে যখন দিতেছে তখন আর কি বলা যাইতে পারে ? কিন্তু শ্রদ্ধায় দত্ত দ্রব্যের কখনও যেন অপব্যবহার না হয়।" এক ভিক্ষু অসম্পূর্ণ বস্ত্রে গ্রামে ভিক্ষায় গিয়াছিল বলিয়া বুদ্ধ তাহাকে তিরস্কার করিয়াছিলেন, আনন্দও একবার অনবধানতাপ্রযুক্ত এরূপ করিয়াছিলেন। এক ভিক্ষু একস্থানে একাকী বর্ষাবাস করিয়াছিল, বর্ষান্তে গ্রামিকেরা তাহাকে বস্ত্রদান করিয়া বলিল "সংঘকে ইহা দান করিলাম।" ভিক্ষু ভাবিল বুদ্ধ বলিয়াছেন চারজনের কমে সংঘগঠন হইবে না, সে একা, অথচ ইহারা "সংঘকে দিলাম" বলিয়া দান করিয়াছে, সেহেতু সংঘের সম্পত্তি এই বস্ত্রগুলি সে শ্রাবস্তীতে লইয়া গিয়া বুদ্ধকে জানাইলে। বুদ্ধ বলিলেন 'কঠিন' (মিলিত সংঘের বস্ত্রাদি দানের ভাগগ্রহণ) না হইয়া যাওয়া পর্যন্ত এবস্ত্র তাহারই হইবে। এক ভিক্ষু বর্ষা ছাড়া অন্য মাসগুলিও একস্থানেই কাটাইল। তাহাকেও লোকে "সংঘকে দিলাম" বলিয়া বস্ত্রদান করিলে তাহারও সেই সংশয় উপস্থিত হইল। বুদ্ধ বলিলেন সেই স্থানের ভিক্ষুদের মধ্যে বস্ত্রগুলি ভাগ করিয়া দিতে হইবে। শাক্যবংশীয় ভিক্ষু উপানন্দ শ্রাবস্তীতে বর্ষাবাস করিয়া আর একস্থানে গেল ; সেখানে ভিক্ষুরা বস্ত্রভাগ করিয়া লইতেছিল এবং উপানন্দকে জিজ্ঞাসা করিল সে ভাগ চাহে কিনা। উপানন্দ ভাগ লইয়া অন্যত্র, সেখান হইতে আবার আর এক স্থানে, এইরূপে অনেক স্থানে গিয়া বস্ত্রের ভাগ লইল এবং অবশেষে প্রকাণ্ড এক বোঝা চীবর লইয়া শ্রাবস্তীতে ফিরিয়া আসিল। অন্য ভিক্ষুরা উপানন্দের এরূপ লোভে বিরক্ত হইয়া বুদ্ধকে জানাইলে তিনি তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন কেহ একস্থানে বর্ষাবাস করিয়া অন্যত্র বস্ত্রভাগ লইতে পারিবে না। লোভী উপানন্দ তখন দুইস্থানে একবর্ষা কাটাইয়া দুই স্থানেরই বস্ত্রভাগের অংশ চাহিল। ভিক্ষুরা বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন "এই অপদার্থটিকে মাত্র একস্থানের ভাগ দিবে।"

এক ভিক্ষু নগ্ন হইয়া বুদ্ধের সমীপে আসিয়া বলিল "ভদন্ত, ভগবান অনেক প্রকারে যে ব্যক্তি সংযত সন্তুষ্ট পাপমুক্ত জিতেন্দ্রিয় প্রসন্নচিত্ত শ্রদ্ধাবান ও বীর্যবান, তাহার প্রশংসা করিয়াছেন ; ভদন্ত, নগ্নতা হইতে অনেক প্রকার সংযম সন্তোষ পাপমুক্তি ইন্দ্রিয়জয় চিত্তপ্রসাদ শ্রদ্ধা ও বীর্য জাত হয়, ভগবান যদি ভিক্ষুদের নগ্ন থাকিবার অনুমতি দেন তবে ভাল হয়।" বুদ্ধ ভিক্ষুকে

হওয়ায় নাক দিয়া ঔষধ টানিয়া লইবার অনুমতি হইল ও ক্রমে নাক উঁচু করিয়া ধরিবার যন্ত্র, যন্ত্রনলের মুখঢাকনি প্রভৃতিও ব্যবহারের অনুমতি হইল। পিলিন্দবচ্ছের আর একবার উদরে বায়ু হইয়াছিল, বৈদ্যেরা বলিলেন তৈল পান করিতে হইবে; তারপর তৈলের সহিত মদ্য মিশাইবার প্রয়োজন হইল, বুদ্ধ ইহাতে অনুমতি দিলেন। যড়্‌বর্গীয় ভিক্ষুরা তৈলপানের সময়ে বেশি করিয়া মদ্যসংযোগ করিয়া পান করার ফলে মাতাল হইল, তাহাতে নিয়ম হইল মদ্যমিশ্রিত তৈল মাত্র এই পরিমাণ পান করিতে পারা যাইবে যাহাতে মদ্যের বর্ণ গন্ধ বা স্বাদ থাকিবে না। খানিকটা তৈলে মদ্য বেশি পরিমাণে মিশ্রিত হইয়া যাওয়ায় ভিক্ষুরা কি করিবে ভাবনায় পড়িল, বুদ্ধ বলিলেন ঐ তৈল মলমরূপে ব্যবহার করা যাইবে। ক্রমে তৈলের জন্য পাত্রাদি যাহা প্রয়োজন তাহাও ব্যবহারের অনুমতি হইল। একবার ভিক্ষু পিলিন্দবচ্ছের বাত হইয়াছিল—লোকটি বোধহয় চিররুগ্ন ও বহুরোগী ছিল—এবং তাহার স্বেদনির্গম করাইবার প্রয়োজন হইলে ধূমপ্রয়োগ, স্বেদকারী ঔষধ সেবন, তৈল মাখিয়া ভেষজমিশ্রিত উত্তপ্ত বালুকা ও ছাইএর তাপ লাগান, উষ্ণ ভেষজজলে স্নান প্রভৃতির অনুমতি হইল। এইরূপে পীড়া উপশমের জন্য রক্তমোক্ষণ, সেজন্য শৃঙ্গ ব্যবহার ও শল্য চিকিৎসা, তৈল ঔষধ ভেষজ পট্টি পুল্‌টিশ, মাংসের যূষ, যূষ যাহাতে মুখরোচক হয় সেজন্য তাহাতে মশলাযোগ এবং রোগের সময়ে গাত্রগ্লানি দূর করিবার জন্য গন্ধবিলেপন প্রভৃতিতেও বুদ্ধ অনুমতি দিয়াছিলেন।

এক ভিক্ষুকে সাপে কামড়াইয়াছিল; সেকালের চিকিৎসাপ্রণালী অনুযায়ী বুদ্ধ তাহাকে বিষ্ঠা মূত্র ছাই ও মাটি খাওয়াইবার অনুমতি দিলেন। ভিক্ষুদের মনে সমস্যা হইল এগুলি কেহ দান না করিলে লওয়া যাইতে পারে কিনা; বুদ্ধ বলিলেন দান করিবার কেহ উপস্থিত থাকিলে এগুলি দানরূপে গ্রহণ, নতুবা অদত্তগ্রহণও করা যাইতে পারিবে। এক ভিক্ষু বিষ খাইয়াছিল, তাহাকে বমন করাইবার জন্য বিষ্ঠা খাওয়াইবার প্রয়োজন হইলে ভিক্ষুদের মনে সমস্যা হইল কেহ না দিলে উহা লওয়া যাইতে পারে কিনা; বুদ্ধ বলিলেন যাহা স্বকৃত তাহা অন্যে না দিলেও লওয়া যাইতে পারিবে। ভিক্ষুদের কেহ কেহ ঘৃত গুড় মধু প্রভৃতি ভিক্ষা পাইলে ঔষধার্থে ব্যবহারের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখিত। রাজা বিম্বিসার একবার ভিক্ষুদের অনেক ঘৃত মধু ইত্যাদি

দান করিলেন, ভিক্ষুরা আনিয়া হাঁড়ি ভবিয়া বিহারে রাখিয়া দিল। কিন্তু ইঁদুরে এইসব জিনিষ বিহারময় ছড়াইত, লোকে দেখিয়া বলিল "শাক্য-পুত্রীয় শ্রমণরা মগধরাজ বিম্বিসারের মত সব দ্রব্যসামগ্রীতে ঘর বোঝাই করিতেছে।" বুদ্ধ জানিতে পারিয়া বলিয়া দিলেন এই সকল দ্রব্য ভিক্ষায় পাইলে ঔষধার্থে ব্যবহারের জন্য সাত দিনেব অধিক রাখা যাইতে পারিবে না। ভিক্ষু কন্‌খারেবত একটি গুড়ের কারখানার পাশ দিয়া যাইবার সময়ে দেখিল গুড়ের সহিত ময়দা ও আমের ছিবড়া মিশান হইতেছে। সে ভাবিল যখন খাইবার জিনিষ গুডের সহিত মিশান হইতেছে তখন আহারের সময় ব্যতীত গুড খাওয়া যাইবে না, তাই সে ও তাহার সঙ্গীরা কেহই গুড় খাইল না। বুদ্ধ ইহা শুনিয়া বলিলেন ময়দা প্রভৃতি গুড় দৃঢ় করিবার জন্য মিশান হয় কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বস্তুটিকে গুড়ই বলা হয়, অতএব আহারের সময় ব্যতীতও গুড় খাওয়া যাইতে পাবিবে।

রাজগৃহে একবার বুদ্ধের উদরে বায়ুশূল হইয়াছিল। পূর্বে কয়েকবার উদরশূলে কষ্ট পাইলে তিনি ত্রিকটু-যাগু খাইয়া নিবাময হইয়াছিলেন বলিয়া আনন্দ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তিল তণ্ডুল ও মুগ সংগ্রহ কবিযা রাখিয়াছিলেন, এখন নিজেই ইহাতে ত্রিকটু-যাগু পাক করিয়া বুদ্ধকে খাইতে দিলেন। কোনও কারণে বোধহয় বুদ্ধের সন্দেহ হইয়া থাকিবে, তিনি যাগু কোথা হইতে আসিল জিজ্ঞাসা করিয়া আনন্দের সঞ্চযের কথা জানিতে পারিয়া আনন্দকে অত্যন্ত তিরস্কার করিয়া বলিলেন কোনও দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া রাখিলে বা ঘরে পাক করিলে বা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পাক করিলে ভিক্ষুদের পক্ষে তাহা অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে। এই সম্পর্কে শ্রীচৈতন্য কর্তৃক সামান্য হরিতকী সঞ্চযী শিষ্যকে বহিস্কাব-কাহিনী স্মর্তব্য। রাজগৃহে একবার দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। লোকে লবণ তৈল তণ্ডুলাদি আবামে দিয়া যাইত, ভিক্ষুরা ইহা ঘবে তুলিত না এবং বাহিরে পড়িযা থাকার ফলে পশুপক্ষীতে খাইত বা চোরে লইয়া যাইত। ইহাতে নিয়ম হইল আহার্য দ্রব্য ঘরে রাখা যাইবে। ঘরে রাখা হইলেও রান্না বাহিবেই হইতে লাগিল; রান্নার সময়ে উচ্ছিষ্টভোজী সন্ন্যাসীরা ভীড কবিযা ঘিবিয়া থাকিত, তখন নিয়ম হইল রান্নাও ঘরে হইতে পারিবে। দুর্ভিক্ষেব সময়ে গৃহস্থেরা ভিক্ষুদের আহারে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজেরা বেশি খাইত, ভিক্ষুদের কম দিত,

তাহাতেও নিয়ম হইল রান্না ঘরে হইতে পারিবে। কয়েকজন ভিক্ষু কাশীরাজ্যে বর্ষাবাস করিবার পর রাজগৃহে বুদ্ধের সহিত দেখা করিতে আসিতেছিল, পথে তাহাদের ভাল ভিক্ষা মিলিল না; গাছে গাছে অনেক ফল ছিল কিন্তু দান করিবার লোক কেহ না থাকায় ভিক্ষুরা ফল না খাইয়া ক্লিষ্ট শরীরে রাজগৃহে উপস্থিত হইল। তাহাদের ক্লেশের কথা শুনিয়া বুদ্ধ বলিলেন দান করিবার লোক না থাকিলেও গাছের ফল লওয়া যাইবে, দান করিবার কেহ যদি উপস্থিত হয় তবে ফল মাটিতে রাখিয়া দিতে হইবে ও ভিক্ষারূপে দত্ত হইলে তবে খাওয়া যাইবে, কিন্তু কুড়াইয়া পাওয়া ফল সকল সময়েই খাওয়া যাইবে। রাজা বিম্বিসার একবার ভিক্ষুদের তাঁহার বাগানের আম খাইতে অনুমতি দিয়াছিলেন। ভিক্ষুরা আমবাগানে যাইয়া আম খাইল ও নানা উৎপাত করিয়া কাঁচা আম ও অনেক গাছ পাতা নষ্ট করিল। পরে একদিন আম প্রয়োজন হওয়ায় রাজা বাগানে লোক পাঠাইলে মালী বলিল একটিও আম নাই, লোকে ইহাতে ভিক্ষুদের নিন্দা করিল। বুদ্ধ ভিক্ষুদের তিরস্কার করিয়া আম খাওয়া নিষেধ করিয়া দিলেন। একবার এক গৃহে ভিক্ষুদের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল, খাইতে খাইতে হঠাৎ একটা তরকারিতে আম আছে দেখিয়া ভিক্ষুরা হাত গুটাইয়া বসিয়া রহিল, তাহাতে বুদ্ধ বলিলেন তরকারিতে আম খাওয়া যাইতে পারিবে।

বারাণসীতে সুপ্রিয় নামক গৃহস্থ ও তাহার স্ত্রী সুপ্রিয়া বুদ্ধের ভক্ত ছিল। এক ভিক্ষু জোলাপ লইয়াছিল, সুপ্রিয়া একদিন ভিক্ষুদের কাহার কি প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিতে গেলে সে বলিল “ভগিনি, আমার একটু মাংসের যূষ চাই”। “বেশ আর্য, আনিয়া দিব” এই বলিয়া সুপ্রিয়া নিজগৃহে গিয়া তাহার স্বামীর এক ছাত্রকে বাজারে মাংস আনিতে পাঠাইল কিন্তু কোথাও মাংস পাওয়া গেল না। যূষ না পাইলে হয়তো ভিক্ষুর রোগবৃদ্ধি হইবে এবং দিব বলিয়া না দিতে পারিলে তাহারও অন্যায় হইবে, এই ভাবিয়া সুপ্রিয়া ছুরিকাদ্বারা নিজের উরুদেশ হইতে মাংস কাটিয়া দাসীকে ডাকিয়া বলিল “এই মাংসের যূষ বানাইয়া অমুক ভিক্ষুকে দিয়া আয়, আমার কথা কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বলিস্ আমার অসুখ করিয়াছে”। সুপ্রিয়া আঁচলে উরু ঢাকিয়া নিজের ঘরে গিয়া শয্যাগ্রহণ করিল। তাহার স্বামী বাড়ী ফিরিয়া ঘটনা শুনিয়া স্ত্রীর প্রশংসা করিল ও আহ্লাদিত হইয়া

বুদ্ধের সমীপে গিয়া তাঁহাকে সশিষ্য নিজগৃহে আহারের নিমন্ত্রণ করিয়া আসিল। বুদ্ধ আহার করিতে আসিয়া সুপ্রিয়ার দানের কথা শুনিলেন এবং আহারান্তে ফিরিয়া ভিক্ষুদের ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন কে সুপ্রিয়ার কাছে মাংস চাহিয়াছিল। সেই ভিক্ষু উপস্থিত হইলে বুদ্ধ বলিলেন "ভিক্ষু, উহা কি আসিয়াছে ?"

"হাঁ ভগবন্, আসিয়াছে,"

"উহা কি তুমি খাইয়াছ ?"

"হাঁ ভগবন্, খাইয়াছি",

"উহা কিসের মাংস জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে কি ?"

"না ভগবন্, জিজ্ঞাসা করি নাই",

"ওহে অপদার্থ, কিসের মাংস জিজ্ঞাসা না করিয়া তুমি কি করিয়া খাইলে ? ওহে অপদার্থ, তুমি মানুষের মাংস খাইয়াছ !"

তখন নিয়ম হইল মানুষের মাংস খাওয়া নিষেধ এবং কোনও মাংস খাইবার সময়ে তাহা কিসের মাংস জিজ্ঞাসা করিয়া খাইতে হইবে। একবার দুর্ভিক্ষের সময়ে রাজার অনেক হাতিঘোড়া মারা গেল। লোকে মৃত পশুদেব মাংস খাইতে ও ভিক্ষুদের দিতে লাগিল। লোকে বলিল "শাক্যপুত্রীয় শ্রমণরা হাতিঘোডার মাংস কি করিয়া খায় ? হাতিঘোড়া বাজার অঙ্গস্বরূপ, রাজা জানিলে ইহাদের প্রতি প্রসন্ন রহিবেন না।" বুদ্ধ জানিতে পারিয়া হাতিঘোড়ার মাংস খাওয়া নিষেধ করিলেন। দুর্ভিক্ষের অবস্থা আরও ঘোরতর হইলে লোকে কুকুর ও সাপের মাংস খাইতে ও ভিক্ষুদের দিতে লাগিল। লোকে বলিল "কুকুর ও সাপের মত ঘৃণ্য জন্তুর মাংস ভিক্ষুরা কি করিয়া খায় ?" ইহাতে এ মাংসও নিষিদ্ধ হইল। ভিক্ষুরা একবার বনের মধ্য দিয়া যাইবার সময়ে এক ব্যাধের বাড়ীতে ভিক্ষা করিতে গেল। ব্যাধ সিংহ মারিয়াছিল, সেই মাংস ভিক্ষা দিল। ইহা খাইয়া বনের মধ্য দিয়া যাইবার সময়ে সিংহমাংসের গন্ধ পাইয়া ভিক্ষুদের সিংহে আক্রমণ করিল। ভিক্ষুদের বাঘ চিতা ভালুক ও তরক্ষ মাংস খাওয়া সম্বন্ধেও এইরূপ গল্প আছে।

বুদ্ধ একবার সশিষ্য বারাণসী হইতে অন্ধকবিন্দ নামক স্থানে যাইতেছিলেন। পিছনে কোন কোনও যাত্রী গাড়ীতে আহার্য লইয়া আসিতেছিল,

তাহাদের মধ্যে এক ব্রাহ্মণ আনন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন তিনি ভিক্ষুদের যাগু ও মধুগোলক খাইতে দিতে পারেন কিনা; আনন্দ বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলে বুদ্ধ অনুমতি দিলেন। ব্রাহ্মণ বুদ্ধকে যাগু দিতে আসিলে তিনি উহা ভিক্ষুদের দিতে বলিলেন। বুদ্ধ যাগু ও মধুগোলক খাইবার অনুমতি দিয়াছেন শুনিয়া উপাসকেরা ঘন যাগু ও মধুগোলক আনিয়া প্রাতে ভিক্ষুদের খাইতে দিতে লাগিল। একজন মহামাত্র সম্প্রতি বুদ্ধের উপাসক হইয়াছিলেন, তিনি সশিষ্য বুদ্ধকে স্বগৃহে আহারের নিমন্ত্রণ করিয়া প্রচুর ভোজ্য ও প্রত্যেক ভিক্ষুর জন্য এক থালা মাংসের আয়োজন করিলেন। ভিক্ষুরা খাইতে বসিয়া "অল্প দিবেন, অল্প দিবেন" বলিতে লাগিল; মহামাত্র বলিলেন "আমি নূতন উপাসক হইয়াছি বলিয়া আপনারা অল্প খাইবেন না, আমি অনেক আয়োজন করিয়াছি, প্রত্যেক ভিক্ষুর জন্য এক থালা মাংস আছে, যত ইচ্ছা খান।" ভিক্ষুরা মহামাত্রকে বলিল তাহাদের অল্প খাইবার কারণ মহামাত্রের নবীনোপাসকত্ব নহে, প্রাতে যাগু ও মধুগোলক খাইয়া ক্ষুধা না থাকাই ইহার কারণ। মহামাত্র ইহাতে মহাক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন তিনি তাহাদের যখন নিমন্ত্রণ করিয়াছেন তখন তাহারা পূর্বেই অন্যত্র খাইয়া আসে কেন? তিনি কি তাহারা যত চাহে তত দিতে পারেন না? মহামাত্র ক্রোধে ভিক্ষুদের পাত্রে আহার্য ঢালিয়া দিতে দিতে বলিলেন "হয় খাও, না হয় লইয়া যাও।" আহারান্তে উপদেশ দিয়া বুদ্ধ চলিয়া আসিলেন। বুদ্ধ চলিয়া যাইবামাত্র নিজ ব্যবহারের জন্য মহামাত্রের অনুশোচনা উপস্থিত হইল এবং তিনি বুদ্ধের নিকটে গিয়া ক্ষমাপ্রার্থনা করিলেন। বুদ্ধ বলিলেন মহামাত্র যে ভিক্ষুদের আহারে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন ইহাতেই তাঁহার পুণ্য হইয়াছে, এবং নিমন্ত্রণ থাকিলে পূর্বে অন্যত্র খাইয়া যাইতে তিনি ভিক্ষুদের নিষেধ করিলেন।

পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে লিচ্ছবিসেনাপতি সিংহ বুদ্ধকে আহারের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। গৃহে ফিরিয়া তিনি অধীনস্থ একজন সৈনিককে ডাকিয়া বলিলেন "দেখ তো মাংস পাওয়া যায় কিনা" এবং বুদ্ধ ও ভিক্ষুদিগকে মাংস ও অন্যান্য বহুভোজ্য আহার করাইলেন। তাহাদের দল ত্যাগ করার জন্য নির্গ্রন্থেরা সিংহের প্রতি ক্রুদ্ধ ছিল এবং তাঁহাকে ও বুদ্ধকে অপদস্থ করিবার সুযোগ খুঁজিতেছিল। সিংহের বাড়ীতে বুদ্ধ ও ভিক্ষুরা মাংস খাইতেছেন

শুনিয়া নিগ্রন্থশ্রমণরা বৈশালীর পথে পথে তেমাথায় চৌমাথায় দৌড়াদৌড়ি করিয়া দুইহাত ছড়াইয়া চীৎকার করিয়া বেড়াইতে লাগিল—"আজ সেনাপতি সিংহ একটা স্থূলকায় পশু হত্যা করিয়া শ্রমণ গৌতমকে আহার করাইয়াছেন, অতএব শ্রমণ গৌতম জ্ঞাতসারে তাঁহার জন্য নিহত পশুর মাংস ভোজন করেন"। একজন সৈনিক ইহা শুনিয়া সিংহকে জানাইলে সিংহ বলিলেন "ইহাতে বিরক্ত হইবার কিছু নাই, উহারা অনেকদিন ধরিয়া বুদ্ধের অপবাদ ঘোষণা করিয়া আসিতেছে, ভগবান সম্বন্ধে বৃথা তুচ্ছ মিথ্যা রটাইতে উহাদের মোটেই বাধে না; প্রাণ গেলেও আমি জ্ঞাতসারে জীবহত্যা করি না।" আহারের পর উপদেশদানান্তর আরামে ফিরিয়া বুদ্ধ ভিক্ষুদের বলিলেন "তোমরা জ্ঞাতসারে তোমাদের জন্য নিহত পশুর মাংস খাইও না, তোমরা মারিতে দেখ নাই, শুন নাই ও তোমাদের জন্য মারা হইয়াছে এরূপ সন্দেহ কর নাই—এই তিনটি সর্ত্ত পূর্ণ হইলে তবেই তোমরা মৎস্য ও মাংস খাইতে পার।" বস্তুতঃপক্ষে সিংহ বাজার হইতে মাংস আনাইয়াছিলেন। এরূপ মাংসকে "পবত্ত-মংস" বলা হইত, টীকাকার বুদ্ধঘোষ ইহার অর্থ বলিয়াছেন 'মৃতের মাংস'। দূষণীয় মাংসকে "উদ্দিস্‌সকত- মংস" বলা হইত অর্থাৎ যাহা ভোক্তার উদ্দেশ্যে বধ করা হইয়াছে। বৈদিক ও প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে দেখা যায় যে প্রাচীন ভারতে মাংসভোজন অতি সাধারণ প্রথা ছিল। ভাষায় দেশের রীতিনীতি প্রকাশ পায়, বৈদিক সংস্কৃতে "অমিস্‌" শব্দে কাঁচা মাংস বুঝাইত, পরবর্ত্তীকালের সংস্কৃতে "অমিষ" শব্দে মাংস ও সাধাবণ খাদ্য বুঝাইত, অতএব মাংস সাধারণ খাদ্যের মধ্যে গণ্য হইত বুঝিতে হইবে। পালিভাষায় "আমিস" শব্দের মুখ্য অর্থ ই খাদ্য, গৌণ অর্থ মাংস। বুদ্ধ প্রভৃতি অহিংসাবাদীদের প্রাণিহত্যায় আপত্তি ছিল বটে কিন্তু মাংস নামক দ্রব্যটি ভোজন সম্বন্ধে কোনই আপত্তি ছিল না। মহাবীরও একবার বিড়ালে-মারা পায়রার মাংস খাইয়াছিলেন এবং বেশি হাড়কাঁটাসংযুক্ত না হইলে ভিক্ষায় মৎস্যমাংস গ্রহণে জৈন শ্রমণদের অনুমতি ছিল। মাংসাহারের বিরুদ্ধে আমাদের দেশের অভিমত পরবর্ত্তীকালে কতকটা স্বাস্থ্যনীতির প্রয়োজনে ও কতকটা অহিংসানীতির প্রসার হইয়া প্রাণিবধের সম্পূর্ণ নিবারণ উদ্দেশ্যে গঠিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। বৈদ্য জীবক একবাব বুদ্ধকে তিনি তাঁহার জন্য নিহত পশুর মাংস

আহার করেন একথা সত্য কিনা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তাহাতে বুদ্ধ বলেন একথা সত্য নহে, ব্রহ্মবিহারী ভিক্ষু নিমন্ত্রিত হইলে এরূপ ভাবে না যে গৃহস্থ বোধহয় আমাকে খুব ভাল খাইতে দিবে বা ভবিষ্যতেও সে যেন আমাকে এরূপ ভাল খাইতে দেয়; ভিক্ষু যাহা পায় তাহা খায় এবং ইহাতে কোনও দোষ হয় না।

সারিপুত্রের একবার জ্বর হইলে মৌদ্‌গল্যায়ন জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন পূর্বে পদ্মের মৃণাল খাইয়া তাঁহার জ্বর সারিয়াছিল, তাই মৌদ্‌গল্যায়ন মৃণাল আনিয়া দিলেন এবং তাহা খাইয়া সারিপুত্র সুস্থ হইলেন। ইহাতে বুদ্ধ বনে বা পুষ্করিণীতে জাত দ্রব্য অন্যের ভুক্তাবশিষ্ট না হইলে খাইবার অনুমতি দিলেন। আর একবার উদরে বায়ু হওয়ায় সারিপুত্রকে পেঁয়াজ খাইতে দেওয়া হইয়াছিল।

বৈশালীতে একবার খুব সুভিক্ষ হইল, প্রচুর শস্য জন্মিল এবং অনেক খাদ্য পাওয়া গেল, উঞ্ছ বা ভিক্ষাদ্বারা জীবনধারণ সহজ হইল। ধ্যানে বসিয়া বুদ্ধের মনে এই কথা উদয় হইল যে, গৃহে খাদ্য রাখা, রন্ধন করা প্রভৃতিতে তিনি দুর্ভিক্ষের সময়ে অনুমতি দিয়াছিলেন কিন্তু ভিক্ষুরা এখনও এগুলি করিতেছে। পরে আনন্দকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার অনুমান সত্য জানিয়া তিনি এগুলি অতঃপর নিষেধ করিয়া দিলেন। কিছুদিন পরে একগ্রামের লোক আসিয়া আনন্দকে বলিল তাহাদের আনীত দ্রব্যাদি বাহিরেই পড়িয়া আছে, ওদিকে ঝড় আসিতেছে, এখন তাহারা কি করিবে? আনন্দ বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলে বুদ্ধ বলিলেন এ অবস্থায় সংঘে বিধিমত জ্ঞপ্তি উপস্থাপিত করিয়া ভিক্ষুরা কোনও স্থানবিশেষকে 'কপ্পিয়ভূমি' (অর্থাৎ আরামের বাহিরে খাদ্যদ্রব্য রাখা বা রান্না করিবার স্থান) রূপে নির্ধারণ করিতে পারিবে। কপ্পিয়ভূমি নির্ধারণের কিছুদিন পরে বুদ্ধ একদিন রাত্রি-শেষে উঠিয়া কাক ডাকার মত মহাশব্দ শুনিয়া আনন্দকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে উহা কপ্পিয়ভূমিতে যাগু ভাত সূপ প্রভৃতি রন্ধন করিবার, মাংস কুটিবার ও কাঠ কাটিবার শব্দ; ইহাতে তিনি বলিলেন জ্ঞপ্তিদ্বারা যেখানে সেখানে কপ্পিয়ভূমি নির্ধারিত হইতে পারিবে না; গৃহস্থগৃহ বা যেখানে গরুবলদ থাকে বা বিশেষভাবে প্রস্তুত স্বতন্ত্র স্থান ব্যতীত অন্যত্র কপ্পিয়ভূমি হইতে পারিবে না। ভিক্ষু যসোজের পীড়ার সময়ে আনীত ভেষজাদি

বাহিরে থাকায় পোকায় খাইল, ইহাতে ঔষধ রাখিবার জন্য ভিক্ষুদ্বারা ঘরের মধ্যে কপ্পিয়ভূমি নির্ধারণের অনুমতি হইল।

ভদ্দিয় নগরে মেণ্ডক নামক এক ব্যক্তির অনেক গরু ছিল, সে ভিক্ষুদের দুধ খাইতে দিতে চাহিল কিন্তু দোষ হইবে ভয়ে ভিক্ষুরা খাইল না। তখন বুদ্ধ দুধ দধি মাখন ঘোল প্রভৃতি খাইবার এবং জনহীন স্থান দিয়া যাইবার সময়ে সঙ্গে আহার্য লইবারও অনুমতি দিলেন। আপন-গ্রামের কেনিয় নামক এক জটিলতপস্বী বুদ্ধ ও ভিক্ষুদের সরবৎ খাইতে দিয়াছিল, তাহাতে বুদ্ধ আম জাম কলা নারিকেল মধু আঙুর মৃণাল প্রভৃতির সরবৎ খাইবার অনুমতি দিলেন। জটিল তাঁহাকে সশিষ্যে আহারের নিমন্ত্রণ করায় বুদ্ধ বলিলেন "কেনিয়, আমার সঙ্গে অনেক ভিক্ষু আছে, তুমি ব্রাহ্মণদের অনুরাগী", কিন্তু কেনিয় না ছাড়ায় বুদ্ধ সম্মতি দিলেন। বুদ্ধ তাহাদের গ্রামে আসিতেছেন শুনিয়া এক ভিক্ষু শিষ্যদিগকে বাড়ী বাড়ী পাঠাইয়া দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া যাগু প্রস্তুত করিয়া বুদ্ধ আসিলে তাঁহাকে খাইতে দিল। বুদ্ধ জিজ্ঞাসা করিয়া ইহা জানিলে তাহাকে অত্যন্ত ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন। এক ভিক্ষু জাবর কাটিত, ভিক্ষুরা নিন্দা করিলে বুদ্ধ বলিলেন ঐ ভিক্ষু অতিসম্প্রতি গোজন্ম হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে, সে জাবর কাটে কাটুক কিন্তু যেন মুখ হইতে সম্পূর্ণ বাহির করা খাদ্য আবার মুখে গ্রহণ না করে! বুদ্ধ বোধহয় ইহাতে বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন যে মানুষ প্রকৃতির দাস, অপরের বা নিজের কোনও ক্ষতি না হইলে অশোভন অভ্যাস অপরাধ নহে কিন্তু সেরূপ অভ্যাস যতটা সম্ভব শাসনে রাখা উচিত।

এটি খাওয়া উচিত কিনা, ইহা করা উচিত কিনা, ইহাতে ভগবানের অনুমতি আছে কিনা প্রভৃতি প্রশ্ন ভিক্ষুদের মনে উদয় হইত। এ বিষয়ে তাঁহাকে জানান হইলে বুদ্ধ বলিয়াছিলেন "যে বিষয়ে আমি 'ইহা উচিত নহে' বলিয়া নিষেধ করি নাই তাহা অধর্মসঙ্গত ও ধর্মবিরুদ্ধ হইলে তোমরা করিও না; আর যদি তাহা ধর্মসঙ্গত ও অধর্মবিরুদ্ধ হয় তবে তাহা করিও।"

[মহাবগ্‌গ ; চুল্লবগ্‌গ ; মজ্‌ঝিমনিকায়, জীবকসুত্ত।]

১২

রাজা ও ধর্মগুরুগণ

মগধরাজ বিম্বিসারের সহিত বুদ্ধের সৌহৃদ্যের অনেক কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। সে যুগের রাজারা সব ধর্মগুরুদেরই সম্মান করিতেন; বৌদ্ধ শাস্ত্রে যে রাজাদের বুদ্ধকে সম্মান করিতে দেখা যায়, জৈনশাস্ত্রে সেই রাজাদেরই মহাবীরকে সম্মান দেখাইবার কথা বর্ণিত আছে। দানাদি কর্মও সম্প্রদায়নির্বিশেষে করা হইত। সম্রাট অশোক অতবড় বুদ্ধভক্ত হইলেও ব্রাহ্মণ জৈন আজীবিক প্রভৃতি সম্প্রদায়কে বহুদান করিতেন। বিম্বিসাব সম্বন্ধে মনে হয় তিনি বুদ্ধেরই অধিক পক্ষপাতী ছিলেন। 'বিম্বিসার' নামটি অ-সংস্কৃত হইলেও শুদ্ধভাষায় চলিয়া গিয়াছে; বস্তুতঃ নামটির প্রকৃত সংস্কৃতরূপ 'বিম্বসার' অর্থাৎ রূপশ্রেষ্ঠ, তিব্বতী অনুবাদ হইতে এইরূপ মনে হয়। বিম্বিসার শ্রেণ্য বা শ্রেণিক নামেও পরিচিত ছিলেন। এই নামের অর্থ অনিশ্চিত, কেহ বলেন ইহার অর্থ যাহার বহু সৈন্য আছে, কেহ বলেন যাহার বহু ধন আছে।

বিম্বিসারের পুত্রের নাম অজাতশত্রু। এই নামের কারণ টীকাকার বুদ্ধঘোষ এইরূপ বলিয়াছেন যে, অজাতশত্রু মাতৃগর্ভে থাকার সময়ে তাঁহার মাতার এই দোহদ হইয়াছিল যে তিনি বিম্বিসারের রক্তপান করিবেন। মন্ত্রীদের পরামর্শে রাজা এমন একটি জামা প্রস্তুত করাইলেন যাহার বাহিরে কাপড় কিন্তু ভিতরে কাঁচা পশুমাংসের আস্তর ছিল। এই জামা পরিয়া রাজা রানীর কাছে গেলে রানী রাজার পৃষ্ঠদেশে দংশন করিয়া জামার নীচের পশুমাংসকে রাজার শরীরের মাংস মনে করিয়া তাহার রক্তপান করিয়া দোহদ তৃপ্তি করিলেন, রাজাও অক্ষতশরীর রহিলেন। না জন্মিতেই পিতৃরক্তপানে যাহার ইচ্ছা হইয়াছিল, সে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে তাহার 'অজাতশত্রু' নাম রাখা হয়। গর্ভাবস্থায় জননীর দোহদ অনুসারে জাতকের নাম রাখার অনেক গল্প জৈনশাস্ত্রে পাওয়া যায়, সে যুগে বোধহয় ইহা অন্যতম নামকরণবিধি ছিল। কিন্তু অজাতশত্রু নাম এমন অন্য রাজাদেরও

দেখা যায় যাঁহাদের জননীর স্বামীরক্তপানাকাংক্ষার কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না, অতএব ইহার স্বাভাবিক অর্থ "অপ্রতিদ্বন্দ্বী"। পরবর্তীকালে পিতৃহত্যা করায় 'অজাতশত্রু' নামের পিতৃঘাতী অর্থ কল্পনা করা হয়। অজাতশত্রু 'কূনিক' নামেও অভিহিত হইয়াছেন। ইহার অর্থ যাহার (একটি) হাত ভাঙা বা বাঁকা। অজাতশত্রু বুদ্ধদ্বেষী ছিলেন কিনা ঠিক বলা যায় না, বৌদ্ধশাস্ত্রে তাঁহাকে বুদ্ধদ্বেষী বলিবার কারণ এই মনে হয় যে তিনি প্রথমে বৌদ্ধেতর সম্প্রদায়ের অনুরক্ত ছিলেন। জৈনশাস্ত্রে অজাতশত্রুকে খুব বড় মহাবীর-ভক্তরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। দেবদত্ত বুদ্ধের সংঘ ছাড়িয়া অন্যদল স্থাপনায় অজাতশত্রুর পোষকতা পাইয়াছিলেন, একথা বৌদ্ধেরা বলিয়াছেন। ধর্মগুরু, তাহাতে আবার ক্ষত্রিয়বংশীয় বলিয়াও বুদ্ধ ও মহাবীরকে ক্ষত্রিয় রাজারা সমাদর করিতেন।

কোশলরাজ প্রসেনজিৎ কয়েকদিন ধরিয়া বুদ্ধ ও ভিক্ষুদের ভিক্ষা দিয়া শেষে বুদ্ধকে প্রত্যহ তাঁহার ভবনে আহারের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। বুদ্ধ ইহাতে স্বীকৃত হইলেন না কারণ অন্য অনেকেও ইচ্ছা করে যে বুদ্ধ তাহাদের গৃহে আসেন। বুদ্ধ আনন্দকে এই নিমন্ত্রণরক্ষা করিতে বলিলেন। প্রসেনজিৎ কয়েকদিন আনন্দ ও তাঁহার সঙ্গী ভিক্ষুদের আহার করাইবার পর এবিষয়ে এত ঔদাসীন্য প্রকাশ করিলেন যে অন্য ভিক্ষুরা এক এক করিয়া ছাড়িয়া গেল, শুধু আনন্দই বাকি রহিলেন। ইহাতে অপমানিত বোধ করিয়া প্রসেনজিৎ বুদ্ধের নিকট অনুযোগ করিলে বুদ্ধ বলিলেন ভিক্ষুদের কোনও দোষ হয় নাই, তিনি স্পষ্টভাষায় প্রসেনজিৎকে জানাইলেন যে তাঁহার প্রতি ভিক্ষুরা শ্রদ্ধা হারাইয়াছে কারণ নিমন্ত্রণকারী যদি বিনীত শ্রদ্ধাবান ও ধর্মজিজ্ঞাসু না হয় তবে ভিক্ষুরা সে গৃহে যায় না। বর্ণিত আছে ভিক্ষুদের শ্রদ্ধা ফিরাইয়া পাইবার জন্য প্রসেনজিৎ স্থির করিলেন তিনি শাক্যবংশ হইতে একটী পত্নী গ্রহণ করিবেন এবং এই প্রস্তাব করিয়া তিনি শাক্যদের নিকটে দূত পাঠাইলেন। শাক্যরা স্ববংশগর্বিত ছিল, প্রসেনজিৎকে অপমান করিবার জন্য তাহারা মহানাম নামক একজন শাক্যের দাসীগর্ভজাতা বাসবক্ষত্রিয়া নাম্নী কন্যাকে পাঠাইয়া দিল। প্রসেনজিৎ বাসবক্ষত্রিয়ার জন্মদোষ জানিতেন না, তিনি তাহাকে বিবাহ করিলেন ও কালক্রমে বাসব-ক্ষত্রিয়ার একটি পুত্র জন্মিল। নবজাত পুত্রের নামকরণের জন্য প্রসেনজিৎ

মাতামহীর নিকট দূত পাঠাইলেন, মাতামহী 'বল্লভ' এই নাম নির্বাচন করিলেন কিন্তু দূত বধিরতাপ্রযুক্ত ঠিক শুনিতে না পাইয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল মাতামহী বালকের নাম 'বিড়ূডভ' রাখিয়াছেন। বিড়ূডভ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে শাক্যমাতুলদের দেখিবার জন্য কপিলবাস্তুতে গেল কিন্তু কেহই তাহাকে সমাদর করিল না। তাহার বসিবার পিঁড়ি ধুইবার সময়ে এক দাসী তাহার হীনজন্মের ইঙ্গিতসূচক মন্তব্য করিলে এক সৈনিক তাহা শুনিতে পাইয়া সঙ্গীদের নিকটে গল্প করিল। ক্রমে মুখে মুখে একথা ছড়াইয়া পড়িয়া বিড়ূডভের কানে পৌঁছিলে বিড়ূডভ প্রতিজ্ঞা করিল সে শাক্যদের রক্তে ঐ পিঁড়ি ধুইবে। বিড়ূডভ শ্রাবস্তীতে ফিরিয়া আসিলে তাহার মাতার হীনজন্মের কথা শুনিয়া প্রসেনজিৎ বাসবক্ষত্রিয়া ও বিড়ূডভকে দাসশ্রেণীভুক্ত করিলেন কিন্তু বুদ্ধ শুনিয়া বলিলেন পিতার বংশানুসারেই পুত্রের সামাজিক পদমর্যাদা হওয়া উচিত। তাহাতে প্রসেনজিৎ আবার তাহাদিগকে পূর্বমর্যাদা দান করিলেন।

একবার প্রসেনজিৎ বুদ্ধদর্শনে আসিয়াছিলেন। ছত্রপাণি নামক একজন উপাসক তখন বুদ্ধের নিকটে বসিয়াছিলেন, তিনি রাজাকে দেখিয়া গাত্রোত্থান না করায় প্রসেনজিৎ অসন্তুষ্ট হইলেন। বুদ্ধ কথায় কথায় প্রসেনজিতের কাছে ছত্রপাণির গুণের সুখ্যাতি করিলেন—প্রসেনজিতের অসন্তোষ রহস্যপটু বুদ্ধের তীক্ষ্ণদৃষ্টি এড়ায় নাই। কিছুদিন পরে ছত্রপাণিকে পথে যাইতে দেখিয়া প্রসেনজিৎ তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং ছত্রপাণি ছত্রপাদুকা ত্যাগ করিয়া রাজসন্নিকটে উপস্থিত হইলে প্রসেনজিৎ বলিলেন তিনি যে রাজা একথা ছত্রপাণির এতদিন পরে স্মরণ হইল মনে হইতেছে। ছত্রপাণি বলিলেন ইহা তাঁহার সর্বদাই স্মরণ ছিল। তবে তিনি কেন রাজাকে দেখিয়া গাত্রোত্থান করেন নাই, প্রসেনজিৎ একথা জিজ্ঞাসা করিলে ছত্রপাণি বলিলেন তিনি তখন রাজার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বুদ্ধের সমীপে উপবিষ্ট ছিলেন বলিয়া রাজাকে দেখিয়া গাত্রোত্থান করেন নাই। প্রসেনজিতের রাজোচিত ঔদার্য ছিল, তিনি এই উত্তরে প্রীত হইয়া ছত্রপাণিকে রাজান্তঃপুরিকাদের নিকটে ধর্মব্যাখ্যা করিতে অনুরোধ করিলেন কিন্তু ভিক্ষু নহেন বলিয়া ছত্রপাণি ইহাতে অসম্মত হইলেন।

বিম্বিসার প্রসেনজিতের কোশলাদেবী নাম্নী ভগিনীকে বিবাহ করিয়া-

ছিলেন। কাশীগ্রামেব রাজস্ব এই বিবাহে কন্যার স্নানকালীন গন্ধদ্রব্যাদিব ব্যয়নির্বাহের জন্য যৌতুকস্বরূপে প্রদত্ত হইয়াছিল। অজাতশত্রু বিম্বিসারকে হত্যা করিবার পর প্রসেনজিতের ভগিনী পতিশোকে প্রাণত্যাগ করেন এবং তখন প্রসেনজিৎ কাশীগ্রামের রাজস্ব মগধকে দান করা বন্ধ কবিয়া দিলেন। ইহা লইয়া মগধ ও কোশলরাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ বাধিল। প্রসেনজিৎ কয়েকবাব অজাতশত্রুর হাতে পরাজিত হইয়া পানাহার ত্যাগ করিলেন। বুদ্ধ ইহা শুনিয়া বলিয়াছিলেন জয়লাভ করিলে অহংকাব জন্মে, পবাজয়ে দুঃখ জন্মে, কিন্তু যে এই দুইই ত্যাগ করিয়াছে সেই সুখী। কথিত আছে অবশেষে কয়েকজন স্থবির ভিক্ষুর পরামর্শমত সমরকৌশল অবলম্বন করিয়া প্রসেনজিৎ অজাতশত্রুকে পরাজিত ও বন্দী কবিয়াছিলেন, শেষে প্রসেনজিতের কন্যা বজ্রার সহিত অজাতশত্রুর বিবাহ হয়। এই বিবাহে কাশীগ্রামেব রাজস্ব পুনরায় যৌতুকস্বরূপে কন্যার স্নানগন্ধলেপনাদির ব্যয়নির্বাহের জন্য প্রদত্ত হইয়া এই যুদ্ধেব অবসান হয়।

প্রসেনজিতের সেনাপতি বন্ধুলের প্রভাববৃদ্ধিতে শঙ্কিত হইয়া প্রসেনজিৎ বন্ধুলকে সবংশে হত্যা করিয়া বন্ধুলের ভ্রাতুষ্পুত্র দীঘকারায়ণকে সেনাপতিত্ব দান করেন। দীঘকারায়ণ মনে মনে প্রসেনজিতের প্রতি বিরূপ ছিলেন। একবার প্রসেনজিৎ দীঘকারায়ণকে লইয়া শাক্যগ্রামে গিযাছিলেন। প্রসেনজিৎ বুদ্ধেব সহিত বাক্যালাপ করিতেছিলেন, সেই অবসরে দীঘকারায়ণ প্রসেনজিতের অধিকাংশ অনুচব ও ছত্রদণ্ডাদি রাজচিহ্ন লইয়া সত্বর শ্রাবস্তীতে উপস্থিত হইয়া বিড়ূডভকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। প্রসেনজিৎ অজাতশত্রুর সাহায্য প্রার্থনার জন্য রাজগৃহের দিকে চলিলেন কিন্তু পথে তাঁহার মৃত্যু হইল। বিড়ূডভ রাজা হইয়াই শাক্যদের রক্তে পিঁড়ি ধুইবাব প্রতিজ্ঞারক্ষাব জন্য শাক্যরাজ্যের দিকে ধাবিত হইল। বুদ্ধ মধ্যস্থ হইয়া তিনবাব পথের মাঝখানে দাঁডাইয়া বিড়ূডভের পথরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু চতুর্থ বার বিড়ূডভ শাক্যদের আক্রমণ করিয়া দুগ্ধপোষ্য শিশু পর্যন্ত সকলকে হত্যা করিল। বুদ্ধ বলিয়াছিলেন শাক্যরা একবার রোহিণী নদীর জল বিষাক্ত করিয়া বহুলোকের প্রাণনাশ করিয়াছিল, সেই পাপের ফল আর রোধ করা গেল না।

বুদ্ধ রাজাদের স্পষ্ট কথা শুনাইতে দ্বিধা করিতেন না এবং তাঁহাদের

সহিত রঙ্গরহস্যও করিতেন। প্রসেনজিৎ বহুভোজী ছিলেন, বহু অন্ন, বহু ব্যঞ্জন, বহু অম্ল খাইতেন। একদিন মধ্যাহ্নে গুরুভোজনের পর অস্বস্তিবোধ করিয়া তিনি জেতবনে গিয়া ক্লান্তনয়নে বুদ্ধের সমীপে পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার বড়ই নিদ্রাবেগ হইতেছিল কিন্তু বুদ্ধের সম্মুখে শয়নের সাহস না হওয়ায় তিনি একপার্শ্বে গিয়া বসিলেন। বুদ্ধ রাজার অবস্থা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "মহারাজ, আপনি কি উপযুক্ত বিশ্রামগ্রহণ না করিয়াই আসিয়াছেন ?"

"না ভদন্ত, তাহা নহে, তবে ভোজনের পর আমার সর্বদাই অস্বস্তি বোধ হয়",

"মহারাজ, অতিভোজনে ঐরূপ কুফলই হয়; যে অলস ও বহুভোজী, সে সর্বদা ঘুমায় ও বিশালদেহ সুপুষ্ট শূকরের মত গড়াইয়া বেড়ায়, তাহার দুঃখের আর অন্ত নাই। মহারাজ, ভোজনে মিতাচারী হওয়া উচিত, কারণ তাহাতে আরাম হয়, অল্প ক্লেশ হয়, বিলম্বে জরা উপস্থিত হয় এবং প্রাণরক্ষা হয়।" প্রসেনজিতের ভাগিনেয় সেখানে উপস্থিত ছিল। বুদ্ধ তাহাকে বলিলেন সে যেন প্রত্যহ প্রসেনজিৎকে আহারের পূর্বে এই কথাগুলি স্মরণ করাইয়া দেয় এবং প্রসেনজিৎ প্রত্যহ আহারের সময়ে শেষ গ্রাসটি না খাইয়া ফেলিয়া দিয়া তাহাতে যতগুলি অন্ন থাকে তাহা গণিয়া ততগুলি মাত্র চাউলের অন্ন যেন পরদিনের ভোজনের সময়ে আহার করেন। এই উপদেশ পালনের ফলে প্রসেনজিতের মনে প্রফুল্লতা আসিল ও মেদহ্রাস হইল। প্রসেনজিৎ বুদ্ধের নিকট গিয়া বলিলেন "ভদন্ত, এখন আমি সুখে আছি, আবার মৃগয়ায় যাইতে পারি, ভাগিনেয়ের (অজাতশত্রু) সহিত আর কলহ করি না এবং তাহার সহিত আমার কন্যা বজ্রার বিবাহ দিয়াছি।" বুদ্ধ বলিলেন "মহারাজ, স্বাস্থ্যই শ্রেষ্ঠ সুখ।"

প্রতি পক্ষান্তে মিলিত হইয়া 'উপোসথ' পালন ও ধর্মচর্চার রীতি প্রথমে বুদ্ধশিষ্যেরা পালন করিত না, অন্য সম্প্রদায়ের লোকে করিত। বিম্বিসারের অনুরোধে বুদ্ধ এই রীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। বিম্বিসারের অনুরোধে বুদ্ধ ভিক্ষুদের বর্ষাবাসের সময় একবার পিছাইয়া দিয়াছিলেন, কারণ "রাজার আদেশ পালন করা উচিত।" অনুগত ব্যক্তির অনুরোধ বুদ্ধ প্রায়ই প্রত্যাখ্যান করিতেন না ও সেজন্য অনেক নিয়মেরও ব্যতিক্রম করিতেন।

দেবদত্ত

এক শ্রেণীর বর্ণনা অনুসারে দেবদত্ত সুপ্রবুদ্ধের পুত্র ছিলেন এবং বুদ্ধের পিতৃব্যপুত্র ও শ্যালক হইতেন কারণ এই বিবরণে রাহুলমাতা দেবদত্তের সহোদরা ভগিনী; আর এক শ্রেণীর বর্ণনায় দেবদত্ত অমৃতোদন নামক বুদ্ধের আর এক পিতৃব্যের পুত্র। বাল্যকালে বুদ্ধের সহিত দেবদত্তের বিরোধের কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। ইহাও কথিত আছে যে সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগের পর দেবদত্ত রাহুলমাতাকে (এ বিবরণে রাহুলমাতার নাম যশোধরা এবং তিনি দেবদত্তের পিতৃব্যকন্যা) বিবাহপ্রস্তাব করিয়াছিলেন।

বুদ্ধের মৃত্যুর প্রায় আট বৎসর পূর্বে দেবদত্ত যশোলিপ্সু হইয়া অজাতশত্রুকে প্ররোচনা করিয়া নিজদলে টানিয়াছিলেন। বুদ্ধ একথা জানিয়া বলিয়াছিলেন, যে মুর্খ তাহাকে লোকে চিনিয়া ফেলিবেই এবং তিনি দেবদত্তের ক্রিয়াকলাপ উপেক্ষা করিয়াছিলেন। একবার বুদ্ধ যখন রাজগৃহে ছিলেন তখন দেবদত্ত আসিয়া বুদ্ধকে বলিলেন বুদ্ধ বৃদ্ধ হইয়াছেন, এখন দেবদত্তের উপর সংঘের কর্তৃত্ব অর্পণ করুন। উত্তরে বুদ্ধ কিছু রুক্ষ ভাষায় বলিয়াছিলেন দেবদত্তের মত নরাধমের কথা দূরে থাক, সারিপুত্র বা মৌদ্‌গল্যায়নের হাতেও তিনি সংঘের কর্তৃত্ব অর্পণ করিবেন না। দেবদত্ত ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া চলিয়া গেলেন। বুদ্ধ সংঘকর্তৃক ঘোষণা করাইলেন যে দেবদত্তের কার্য যেন শুধু দেবদত্তেরই বলিয়া গৃহীত হয়, ইহার সহিত বুদ্ধের বা সংঘের কোনও সংস্রব নাই। তারপর দেবদত্ত অজাতশত্রুর সহিত যুক্তি করিলেন যে দেবদত্ত বুদ্ধকে এবং অজাতশত্রু বিম্বিসারকে হত্যা করিবেন এবং উভয়ে সংঘ ও দেশ শাসন করিবেন। চক্রান্ত কার্যে পরিণত করিতে গিয়া মন্ত্রীদের হাতে ধরা পড়িয়া অজাতশত্রু সব কথা স্বীকার করিলেন। মন্ত্রীরা রাজাকে পরামর্শ দিলেন দেবদত্ত ও অন্য ষড়যন্ত্রকারীদের হত্যা করা হউক কিন্তু বিম্বিসার অজাতশত্রুকে ক্ষমা করিলেন। তখন দেবদত্ত বুদ্ধকে হত্যা করিবার জন্য অজাতশত্রুর কয়েকজন সৈন্যকে ভিন্ন ভিন্ন পথে দাঁড় করাইয়া রাখিলেন কিন্তু উহারা তাঁহাকে বধ করিতে পারিল না। একবার বুদ্ধ গৃধ্রকূটের ছায়ায় পায়চারি করিতেছিলেন এমন সময়ে দেবদত্ত পাহাড়ের উপর হইতে প্রকাণ্ড একখণ্ড পাথর গড়াইয়া বুদ্ধের উপর ফেলিলেন। সৌভাগ্যক্রমে পাথরখানা অপর পাথরে আট্‌কাইয়া ভাঙিয়া

গেল কিন্তু কয়েকটি খণ্ড পায়ে লাগিয়া বুদ্ধ আহত হইলেন ও এজন্য জীবকের চিকিৎসা প্রয়োজন হইয়াছিল। বুদ্ধ উপরে তাকাইয়া দেবদত্তকে দেখিয়া এই পাপকার্যের জন্য তাঁহাকে নিরয়গামী হইতে হইবে বলিয়াছিলেন। ভিক্ষুরা বুদ্ধের রক্ষার জন্য লোক নিযুক্ত করিবার কথা বলিলে বুদ্ধ তাহাতে সম্মত হইলেন না, কারণ "সময় না হইলে কেহই তথাগতের প্রাণহানি করিতে পারিবে না।"

আর একবার দেবদত্ত রাজহস্তিশালার লোকদের দ্বারা (সম্ভবতঃ ইহাতে অজাতশত্রুরও সহায়তা ছিল) বুদ্ধ রাজগৃহের যে পথে যাইতেন সেই পথে একটি মাতাল হস্তীকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। বুদ্ধকে ভিক্ষুরা সে পথে যাইতে নিষেধ করিলে বুদ্ধ শুনিলেন না। মত্তহস্তী আক্রমণ করিলে আনন্দ "হস্তী আমাকে বধ করুক" বলিয়া তাহার সম্মুখীন হইলেন কিন্তু বুদ্ধ আনন্দকে—বর্ণনায় আছে ইদ্ধিবলে—সরাইয়া একাকী অগ্রসর হইয়া মৈত্রী-শক্তিতে হস্তীকে বশীভূত করিলেন। এই ঘটনার পর দেবদত্তের যশোনাশ হইল।

তারপর দেবদত্ত আরও কয়েকজনকে লইয়া ভিন্ন দল স্থাপন করিবেন স্থির করিলেন। তাঁহারা বুদ্ধের নিকটে গিয়া প্রস্তাব করিলেন যে, সংঘের নিয়মে এই পরিবর্তনগুলি সাধিত হউক, যথা—ভিক্ষুদের চিরজীবন বনে বাস করিতে হইবে নিমন্ত্রণাদি গ্রহণ না করিয়া তাহাদের চিরজীবন ভিক্ষান্নভোজন করিতে হইবে, দানবস্ত্র গ্রহণ না করিয়া তাহাদের শুধু 'পংসুকুল' পরিধান করিতে হইবে, গৃহে বাস না করিয়া চিরজীবন বৃক্ষতলে বাস করিতে হইবে এবং তাহারা জীবনে মৎস্যমাংস ভোজন করিতে পারিবে না। বুদ্ধ বলিলেন বর্ষাকালে বৃক্ষতলে বাস ব্যতীত অন্যগুলিতে তাঁহার আপত্তি নাই, কিন্তু এগুলি পালনের বাধ্যতামূলক নিয়ম তিনি কিছুতেই করিবেন না, অর্থাৎ নিমন্ত্রণগ্রহণ করা না করা প্রভৃতি ভিক্ষুদের ইচ্ছাধীন রহিবে। দেবদত্ত ইহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না। বুদ্ধ তাঁহাকে সংঘভঙ্গ সম্বন্ধে সাবধান করিলেন বটে কিন্তু দেবদত্ত সঙ্গীদের লইয়া বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন বুদ্ধ বাহুল্যভোগী এবং আনন্দকে জানাইলেন যে তিনি বুদ্ধকে বাদ দিয়া 'উপোসথ' পালন করিবেন। বৈশালীর কয়েকজন নবদীক্ষিত ভিক্ষুকে প্ররোচিত করিয়া দলে লইয়া

দেবদত্ত গয়াশীর্ষ পাহাড়ে চলিয়া গেলেন। আনন্দের মুখে এই সংবাদ শুনিয়া ভ্রান্ত ভিক্ষুদের ফিরাইয়া আনিবার জন্য বুদ্ধ সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়নকে পাঠাইলেন। বর্ণিত আছে তাঁহার বন্ধু কোকালিক সাবধান করিয়া দেওয়া সত্ত্বেও দেবদত্ত মনে করিয়াছিলেন সারিপুত্রেরা তাঁহার দলে যোগ দিতে আসিয়াছেন, বোধহয় সারিপুত্রেরা এরূপ ভাবকৌশল অবলম্বন করিয়া থাকিবেন যাহাতে দেবদত্তের ঐরূপ মনে করিবার কারণ ঘটিয়াছিল। ইহারা দেবদত্তের শ্রোতাদের মধ্যে বসিয়া অনেক রাত্রি পর্যন্ত দেবদত্তের ধর্মোপদেশ শুনিলেন। তারপর দেবদত্ত ক্লান্ত হইয়া সারিপুত্রকে উপদেশ দান করিতে বলিয়া নিজে শয়ন করিতে গেলে সারিপুত্রের উপদেশের ফলে ভ্রান্ত ভিক্ষুরা ফিরিয়া গেল এবং কোকালিক দেবদত্তকে জাগাইলে দেবদত্ত উঠিয়া গালাগালি করিতে লাগিলেন—শাস্ত্রে এইরূপ বর্ণিত আছে। কিন্তু বাস্তব ঘটনা সম্ভবতঃ এইরূপ ঘটিয়াছিল বলিয়া মনে হয়—সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন যেন জিজ্ঞাসু হইয়া আসিয়াছেন এরূপ ভাণ করিয়া দেবদত্তের কথা মন দিয়া শুনিলেন ও অনেকরাত্রি পর্যন্ত তাঁহার সহিত আলাপ-আলোচনা ও কিছু কিছু মতৈক্য প্রকাশ করিয়া শেষে দেবদত্ত শয়ন করিতে গেলে তাঁহারা বৈশালীভিক্ষুদের বুঝাইয়া ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন। প্রত্যাবৃত্ত ভিক্ষুদের পুনরায় প্রব্রজ্যাদানের প্রয়োজন নাই, দোষস্বীকারই তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট, এই কথা বলিয়া বুদ্ধ তাহাদের সংঘে পুনর্গ্রহণ করিলেন—তিনি বোধহয় ভাবিয়াছিলেন 'বেশি নিংড়াইলে লেবু তিত' হইয়া যাইবে। এই ঘটনাগুলি ঘটিতে অবশ্য কিছুকাল লাগিয়াছিল এবং বুদ্ধের সংঘ ছাড়িয়া দেবদত্ত অন্য যে সংঘ স্থাপনা করিয়াছিলেন তাহাও যে কিছুদিন চলিয়াছিল তাহা সেই গর্ভিণী ভিক্ষুণীর কাহিনী হইতে বুঝা যায়।

সুপ্রবুদ্ধ—এই মতে ইনি দেবদত্ত ও রাহুলমাতার পিতা—বুদ্ধের উপর মর্মান্তিক ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, কারণ বুদ্ধ তাঁহার কন্যাকে ত্যাগ ও পুত্রের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন। ইনি একবার সুরামত্ত অবস্থায় কপিলবাস্তুর রাজপথে বুদ্ধের পথ আটকাইয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাকে অনেক কটূক্তি করিয়াছিলেন।

বুদ্ধের সহিত দেবদত্তের বিরোধের কারণ বোধহয় প্রথমতঃ তাঁহাদের

কোন কোনও বিষয়ে মতভেদ। বৌদ্ধশাস্ত্রে দেবদত্তকে ও জৈনশাস্ত্রে গোশালকে মহাপাপী বলা হয়। গোশালের সহিত মহাবীরের অতি উগ্র ভাষায় কটূক্তি হইয়াছিল এবং এই বিরোধের মূলে ছিল উভয়ের ঘোর মতভেদ। মহাবীরের ভাগিনেয় ও জামাতা জমালিও মহাবীরের শিষ্যত্ব ত্যাগ করিয়া ভিন্নদল স্থাপন করিয়াছিলেন। দেবদত্ত সংঘের নিয়মে যে পাঁচটি পরিবর্তন চাহিয়াছিলেন, তাহাতে মনে হয় তিনি কৃচ্ছ্রপ্রিয় ছিলেন এবং বুদ্ধের উদারনীতিতে তাঁহার আপত্তি ছিল। আহার বাসস্থান পরিচ্ছদ প্রভৃতি সম্বন্ধে ত্যাগী হইলেও বুদ্ধ কঠিন কৃচ্ছ্রবাদের প্রয়োজন মানিতেন না বলিয়া ধর্মচক্র-প্রবর্তনের পূর্বে "পঞ্চভিক্ষু" এবং পরে দেবদত্ত তাঁহাকে বাহুল্যভোগী মনে করিয়াছিলেন। এই ভ্রান্ত ধারণা অন্য অনেকেও পোষণ করিত।

মহাবীর

বুদ্ধ ও মহাবীর সমসাময়িক ছিলেন। মহাবীর বয়সে বুদ্ধ অপেক্ষা কিছু বড় ছিলেন ও বুদ্ধের প্রচারারম্ভের পূর্বেই প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুও হইয়াছিল সম্ভবতঃ বুদ্ধনির্বাণের কয়েক বৎসর পূর্বে। রাজগৃহ নালন্দা বৈশালী শ্রাবস্তী প্রভৃতি যে সকল স্থানে বুদ্ধ প্রচার করিতেন, সে সকল স্থান জৈনশাস্ত্রে মহাবীরেরও প্রচারক্ষেত্ররূপে প্রসিদ্ধ। খ্রীষ্টপূর্ব ৬ শতকে ভারতে যত ধর্মপ্রচারকের অভ্যুদয় হইয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে মহাবীর ও বুদ্ধই জনসাধারণ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। মহাবীরশিষ্যদের সহিত বুদ্ধের ও বুদ্ধশিষ্যদের সহিত মহাবীরের সাক্ষাৎ হইত কিন্তু গুরুদ্বয়ের কখনও পরস্পরসাক্ষাৎ হয় নাই। একবার তাঁহারা উভয়ে একই সময়ে নালন্দাগ্রামে আসিয়াছিলেন এবং উপালিনামক মহাবীরের এক শিষ্য শাক্যপুত্রীয়দের দলে যোগ দেওয়ায় মহাবীর সদলবলে উপালির বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া উপালিকে তীব্র ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন।

সেই যুগে সকল গুরুরাই শিষ্যসংগ্রহে কৌশল অবলম্বন করিতেন। মহাবীরও এবিষয়ে সিদ্ধহস্ত ছিলেন এবং বৌদ্ধবর্ণনায় বলা হয় যে কেবল নির্দোষ কৌশলেই ক্ষান্ত না হইয়া মহাবীর অন্যরূপ পন্থাও অবলম্বন করিতেন। জৈনশাস্ত্রে উল্লিখিত আছে গোশালের সহিত বিবাদের সময়ে

মহাবীর ও গোশালের মধ্যে ঘোর শাপবিনিময় ও অগ্নিবর্ষণ হইয়াছিল। ইহার অর্থ বোধহয় উভয়ের মধ্যে বচসা ও ক্রুদ্ধ কটুভাষাপ্রয়োগ। বৌদ্ধেরা বলিয়াছেন উপালির বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া তাহাকে কটূক্তি করিবার সময়ে মহাবীর এত উত্তেজিত হইয়াছিলেন যে তাঁহার মুখ দিয়া উষ্ণরক্ত বাহির হইয়াছিল, ইহারও অর্থ বোধহয় ক্রোধ ও রুক্ষভাষা-ব্যবহার। রূপক বা বিরোধী দলের বিবরণ ছাড়িয়া দিলেও জৈনদের নিজেদের শাস্ত্রেই বর্ণিত আছে গোশাল একবার যখন জ্বরবিকারে আক্রান্ত হইয়া প্রলাপ বকিতেছিলেন তখন মহাবীর স্বশিষ্যদিগকে শিখাইয়া দিয়াছিলেন যে তাহারা যেন গোশালের কাছে গিয়া গোশালকে বিবিধ প্রশ্ন করে। মহাবীরের উদ্দেশ্যে বোধহয় এই ছিল যে প্রলাপের ঘোরে গোশাল ভুল উত্তর দিয়া লোকের কাছে অপদস্থ হইবেন।

বুদ্ধের সহিত দেবদত্তের বিরোধের কথা এবং বুদ্ধ যে বলিয়াছিলেন "দেবদত্তের অপায়প্রাপ্তি ঘটিবে, দেবদত্ত নিরয়গামী হইবে", তাহা জৈনরা জানিত। বিম্বিসারপুত্র রাজকুমার অভয় রাজগৃহে জৈনদের নিকটে যাতায়াত কবিতেন। বৌদ্ধবিবরণে আছে মহাবীর একবার রাজকুমার অভয়কে শিখাইয়া দিলেন যে অভয় যদি যশ অর্জন করিতে চাহেন তবে তিনি বুদ্ধকে প্রশ্ন করিয়া ঠকাইবার চেষ্টা করুন। মহাবীর অভয়কে বলিলেন "শ্রমণ গোতমের সমীপে গিয়া তুমি জিজ্ঞাসা কর তিনি অন্যকে অপ্রিয় কথা বলেন কিনা; যদি তিনি 'হাঁ' বলেন তবে জিজ্ঞাসা করিবে তবে তিনি সাধারণ লোক অপেক্ষা কিসে বিভিন্ন, কারণ সাধারণ লোকেও অন্যকে অপ্রিয় কথা বলে; কিন্তু যদি শ্রমণ গৌতম 'না' বলেন তবে জিজ্ঞাসা করিবে তিনি তবে দেবদত্ত সম্বন্ধে "আপায়িকো দেবদত্তো, নেরয়িকো দেবদত্তো" একথা কেন বলিয়াছিলেন, কারণ তাহাতে দেবদত্ত ক্রুদ্ধ ও অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে শ্রমণ গৌতম গিলিতেও পারিবেন না, উগ্‌লাইতেও পারিবেন না।" মহাবীরের কথামত অভয় বুদ্ধের কাছে গিয়া বুদ্ধকে পরদিন তাঁহার গৃহে আহারের নিমন্ত্রণ করিলেন। পরদিন বুদ্ধ উপস্থিত হইলে আহারান্তে অভয় প্রশ্ন উত্থাপন করিলেন। বুদ্ধ উত্তর দিলেন তিনি যে অপ্রিয় কথা একেবারেই বলেন না এরূপ নহে। অভয় বলিলেন "নিগ্রন্থরা এরূপ

শুনিয়াছে।" বুদ্ধ অভয়ের এরূপ প্রশ্নের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে অভয় মহাবীরের পরামর্শের কথা খুলিয়া বলিলেন। সেই সময়ে একটি শিশু অভয়ের ক্রোড়ে বসিয়া ছিল। বুদ্ধ বলিলেন "রাজকুমার, তোমার কি মনে হয়? তোমার বা রক্ষকের অসাবধানতাবশতঃ যদি এই শিশুর গলায় একটা পাথর বা কাঠি প্রবেশ করে, তবে তুমি কি করিবে?"

"ভদন্ত, আমি তাহা বাহির করিয়া ফেলিব এবং তৎক্ষণাৎ বাহির করিতে না পারিলে বাঁ হাতে শিশুর মাথা ধরিয়া ডান হাতের আঙুল বাঁকাইয়া রক্তপাত হইলেও তাহা বাহির করিব। কেন? কারণ এই শিশুর প্রতি আমার মমতা আছে।"

"রাজকুমার, সেইরূপ যে কথা অসত্য মিথ্যা নিরর্থক ও অপরের নিকট অপ্রিয় বলিয়া তথাগত জানেন তাহা তিনি বলেন না; যে কথা সত্য যথার্থ কিন্তু নিরর্থক ও অপরের নিকট অপ্রিয় বলিয়া তথাগত জানেন তাহাও তিনি বলেন না; যে কথা সত্য যথার্থ সার্থক কিন্তু অপরের নিকট অপ্রিয় তাহা বলিবার উপযুক্ত সময় তথাগত জানেন; যে কথা অসত্য মিথ্যা নিরর্থক অথচ অন্যের নিকট প্রিয় বলিয়া তথাগত জানেন তাহা তিনি বলেন না; যে কথা সত্য যথার্থ কিন্তু নিরর্থক, অন্যের নিকট প্রিয় হইলেও তথাগত তাহা বলেন না; কিন্তু যে কথা সত্য যথার্থ সার্থক এবং অপরের নিকট প্রিয় তাহা বলিবার উপযুক্ত সময় তথাগত জানেন।"

শ্রীগুপ্ত নামক এক বুদ্ধভক্তের সহিত গ্রহদত্ত নামক এক নিগ্রন্থভক্তের বন্ধুতা ছিল। গ্রহদত্ত বুদ্ধের নিকট যাওয়ার জন্য শ্রীগুপ্তের নিন্দা করিয়া তাহাকে নিগ্রন্থদের ভক্ত হইতে বলিল কারণ নির্গ্রন্থরা সকলের মনের কথা ও ভবিষ্যৎ বলিতে পারে। একথা লইয়া বন্ধুদ্বয়ের তর্ক হইল এবং ইহা পরীক্ষা করিবার জন্য শ্রীগুপ্ত নগ্নশ্রমণদিগকে নিজগৃহে নিমন্ত্রণ করিল ও একটা গর্ত খুঁড়িয়া তাহার ভিতরে বিষ্ঠা ঢালিয়া গর্তের উপর লম্বালম্বি দড়ি বাঁধিয়া আসনগুলির সামনের পায়া মাটিতে ও পিছনের পায়া এই দড়ির উপর বসাইয়া এমনভাবে সাজাইয়া রাখিল যে নগ্নশ্রমণরা আসিয়া আসনে বসিবামাত্র উল্‌টিয়া বিষ্ঠাপূর্ণ গর্তের ভিতর পড়িয়া গেল। ইহাতে প্রমাণ হইল যে তাহারা লোকের মনের কথা বা ভবিষ্যৎ জানিতে পারে না!

১৩

মহাপরিনির্বাণ

একবার বুদ্ধ গৃধ্রকূটে বাসকালে রাজা অজাতশত্রুর একজন মন্ত্রী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জানাইলেন যে অজাতশত্রু বৃজিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যোগ করিতেছেন। বুদ্ধ বলিলেন যতদিন বৃজিরা একতাবদ্ধ থাকিবে ততদিন কেহ তাহাদের জয় কবিতে পারিবে না।

শেষজীবনে বুদ্ধ অনেক শোক পাইয়াছিলেন অর্থাৎ এরূপ বহু ঘটনা ঘটিয়াছিল যাহাকে সংসারের লোকে শোচনীয় মনে করে। তাঁহার ভক্ত-বন্ধু রাজা বিম্বিসাবেব মৃত্যু হইয়াছিল; অজাতশত্রু রাজা হইয়া বুদ্ধের বিরুদ্ধাচবণ করিয়াছিলেন; দেবদত্তও সংঘভেদ ও বুদ্ধকে লাঞ্ছনা করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। সংঘের প্রধান পৃষ্ঠপোষক অনাথপিণ্ডদের কিছুদিন পূর্বে মৃত্যু হইয়াছিল, মৃত্যুশয্যায় সারিপুত্র অনাথপিণ্ডদকে ধর্মোপদেশ দিয়াছিলেন। মহাপ্রজাবতীর অবশ্যই এবং সম্ভবতঃ রাহুলমাতা এবং রাহুলেরও মৃত্যু হইয়াছিল। সংঘের মধ্যে অনেকে নামে বুদ্ধের আনুগত্য স্বীকার করিলেও বুদ্ধ যাহাকে তাঁহার ধর্ম ও জীবনের ব্রত মনে করিতেন, কার্যতঃ তাহা ছাড়িয়া সংঘবদ্ধ সন্ন্যাসজীবনকেই প্রধান মনে করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। এই সকল কারণে বুদ্ধ শেষজীবনে সংঘ হইতে কিছু বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। সংঘের প্রধান প্রধান অনেকে তাঁহাকে বাদ দিয়া নিজেদের মত ও রুচি অনুসারেই চলিতে ও সংঘকে চালাইতে চেষ্টা করিতেছিলেন। সংঘের তরুণ ভিক্ষুরা কোন কোনও সংঘনায়কের নেতৃত্বে কোন কোনও বিষয়ে স্বাধীনতাবাদী হইলেও স্থবিরদের অনেকে বুদ্ধের প্রাধান্য অস্বীকার করেন নাই এবং তাঁহার উপদেশ ও নির্দেশকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানিতেন। কিন্তু এই শেষোক্তদের মধ্যে প্রধান যে দুইজন বুদ্ধের প্রচারকার্যে আজীবন সহচর ছিলেন, সেই সারিপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়নেরও বুদ্ধের পূর্বেই মৃত্যু হইয়াছিল। মৌদ্‌গল্যায়নের মৃত্যুই প্রথমে ঘটে অতি শোচনীয়ভাবে। নগ্নশ্রমণরা দেখিল বুদ্ধের খ্যাতি মৌদ্‌গল্যায়নের জন্যই,

তাই বুদ্ধের প্রভাব খর্ব করিবার জন্য তাহারা মৌদ্‌গল্যায়নকে হত্যা করাইবে স্থির করিয়া অর্থসংগ্রহ করিয়া গুণ্ডাদের হাত করিল। মৌদ্‌গল্যায়ন সেই সময়ে একাকী রাজগৃহের ঋষিগিরি পাহাড়ের গুহায় বাস করিতেছিলেন; গুণ্ডারা তাঁহার গুহা ঘেরাও করিয়া তাঁহার উপর পড়িয়া তাঁহাকে ঠেঙাইয়া মারিল এবং মৃতদেহ খণ্ডখণ্ড করিয়া কাটিয়া থেঁৎলাইয়া অস্থিমাংস চূর্ণ করিয়া একটা ঝোপের মধ্যে ফেলিয়া পলায়ন করিল। এ সংবাদ রাষ্ট্র হইলে রাজা অজাতশত্রু হত্যাকারীদের ধরিবার জন্য সর্বত্র গুপ্তচর পাঠাইলেন। গুণ্ডারা এক শৌণ্ডিকালয়ে মদ্যপান করিতেছিল, তাহাদের একজন মত্ত অবস্থায় অপর একজনকে আঘাত করিয়া ভূতলশায়ী করিল। দ্বিতীয় গুণ্ডা ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে প্রথম গুণ্ডা বলিল "তুইই প্রথমে মৌদ্‌গল্যায়নকে লাঠি মারিয়াছিলি"। দ্বিতীয় গুণ্ডা বলিল "আমি মারিয়াছিলাম কিনা তুই কি করিয়া জানিলি?" ইহাতে অন্য গুণ্ডারা মত্ত অবস্থায় চীৎকার করিতে লাগিল "আমি মারিয়াছিলাম, আমি মারিয়াছিলাম।" গুপ্তচরেরা ইহাদের ধরিয়া রাজার নিকটে লইয়া আসিলে রাজার প্রশ্নের উত্তরে গুণ্ডারা মৌদ্‌গল্যায়নকে হত্যা করার কথা স্বীকার করিল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন "কে তোমাদের এ কাজে লাগাইয়াছিল?"

"নগ্নশ্রমণরা।"

রাজা আদেশ দিলেন গুণ্ডাদের কোমর পর্যন্ত মাটিতে পুঁতিয়া খড় চাপা দিয়া আগুন লাগাইয়া দেওয়া হউক।

মৌদ্‌গল্যায়নের মৃত্যু সম্বন্ধে ভিক্ষুদের আলোচনা করিতে শুনিয়া বুদ্ধ বলিয়াছিলেন মৌদ্‌গল্যায়নের মৃত্যু পূর্বজন্মের কর্মফলেই হইয়াছে, ইহাতে অন্যায় কিছু নাই। বহুলোকের বহুঘটনায় বুদ্ধ পূর্বজন্মের বৃত্তান্তরূপে বলিতেন বলিয়া শাস্ত্রে বহুকাহিনীর উল্লেখ আছে; সেই বিবরণগুলি সত্যই যে বুদ্ধ বলিয়াছিলেন তাহা যদিও নিশ্চয় বলা যায় না। মৌদ্‌গল্যায়নের মৃত্যু সম্পর্কে বিবৃত কাহিনীটি এইরূপ—পূর্বজন্মে মৌদ্‌গল্যায়ন বৃদ্ধ অন্ধ মাতাপিতার সেবা করিতেন। মাতাপিতা একটি তরুণীর সহিত পুত্রের বিবাহ দিলেন কিন্তু এই তরুণী অন্ধ শ্বশুরশাশুড়ীকে দেখিতে পারিত না এবং স্বামী যে তাঁহাদের জন্য অত সেবাপরিশ্রম করেন তাহাও তাহার ভাল

লাগিত না। স্ত্রীর প্ররোচনায় মৌদ্গল্যায়ন বৃদ্ধ মাতাপিতাকে সরাইবার অভিপ্রায়ে তাঁহাদিগকে কোনও আত্মীয়গৃহে লইয়া যাইবার ছলে এক বনে লইয়া গিয়া একটু কাজ সাবিবার অছিলায় তাঁহাদের ছাড়িয়া গেলেন এবং কিছুক্ষণ পরে যেন তিনি ডাকাত, বিকৃতস্বরে সেইরূপ চীৎকার করিতে করিতে আসিয়া মাতাপিতাকে ঠেঙাইয়া মারিয়া ফেলিলেন। সেই পাপে এ জন্মে তাঁহার ঐরূপ শোচনীয় ভাবে মৃত্যু হইল।

বুদ্ধ বুঝিতে পারিয়াছিলেন তাঁহার আয়ু শেষ হইয়া আসিতেছে, তাই তিনি শেষবারের মত নানাস্থানে ঘুরিয়া ভিক্ষুমণ্ডলীকে তাঁহার শেষ শিক্ষা দিবার জন্য ভ্রমণে বাহির হইলেন। গৃধ্রকূট হইতে তিনি নালন্দা গ্রামে গেলেন। এখানে সারিপুত্রের সহিত তাঁহার শেষ সাক্ষাৎ হয় কারণ সারিপুত্রও নিজমৃত্যু আসন্ন বুঝিয়া জন্মস্থানে আসিয়া মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। নালন্দা হইতে বুদ্ধ পাটলিগ্রামে গেলেন। বৃজিদের বিরুদ্ধে অজাতশত্রু যে যুদ্ধসজ্জা কবিতেছিলেন, সেই সূত্রে সুনিধ ও বর্ষকার নামক মগধেব দুইজন রাজমন্ত্রী পাটলিগ্রামে সুরক্ষিত দুর্গ স্থাপনা করিতেছিলেন। দুর্গস্থাপনাব আয়োজনাদি দেখিয়া বুদ্ধ আনন্দকে প্রশ্ন করিলেন এবং (শাস্ত্রে আছে দেবতাদের এস্থানের উপরে উড়িতে দেখিয়া) দুই নদীর সঙ্গমস্থলে বণিকদেব বাণিজ্যপথে অবস্থিত এইস্থানের উপযোগিতা বুঝিয়া তিনি নাকি বলিয়াছিলেন ভবিষ্যতে এখানে মহানগর স্থাপনা হইবে। এই পাটলিগ্রামই পরবর্তীকালে সুপ্রসিদ্ধ পাটলিপুত্র নগরে পরিণত হইয়াছিল এবং সম্ভবতঃ আখ্যায়িকার এই ভবিষ্যদ্বাণী পাটলিপুত্র নগর স্থাপনার পর রচিত হইয়াছিল।

রাজমন্ত্রীদ্বয় বুদ্ধকে আহারে নিমন্ত্রণ কবিয়াছিলেন এবং বুদ্ধ পাটলিগ্রাম ছাড়িয়া যাইবার সময়ে মন্ত্রীদ্বয় তাঁহার অনুগমন করিয়া গঙ্গাতীব পর্যন্ত আসিয়া বলিয়াছিলেন "শ্রমণ গৌতম আজ যে দ্বার দিয়া বাহির হইলেন তাহার নাম 'গৌতমদ্বার' এবং যে ঘাটে তিনি গঙ্গা পার হইবেন তাহার নাম 'গৌতমঘাট' রাখা হইবে।" পাটলিপুত্র নগবে পরে এই নামে একটি দ্বার ও ঘাট ছিল। গঙ্গা পার হইয়া বুদ্ধ কোটিগ্রামে গিয়া সেখানকার ভিক্ষুদের 'আর্য সত্যচতুষ্টয়' সম্বন্ধে পুনরায় উপদেশ দিলেন।

ইতিমধ্যে সারিপুত্রের মৃত্যু হয়। সারিপুত্র শিষ্যদের সঙ্গে লইয়া

নালন্দায় গিয়া প্রথমে এক গাছতলায় ছিলেন। এখানে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁহাকে দেখিতে পায়। ভ্রাতুষ্পুত্রের মুখে সারিপুত্র মাতা রূপসারিকে বলিয়া পাঠান যে সারিপুত্রের জন্য যেন একটি ঘর ঠিক করিয়া রাখা হয়। রূপসারি ভাবিলেন এতদিনে বুঝি পুত্রের সুবুদ্ধি হইয়াছে, এইবার সে ভিক্ষুদের ছাড়িয়া সংসারে ফিরিয়া আসিতেছে। তারপর অনেক লোকজন আসিয়া সারিপুত্রকে সম্মান দেখাইলে পুত্রের গৌরবে মাতার মন পুত্রের প্রতি কিঞ্চিৎ প্রসন্ন হইয়াছিল। অচিরে সারিপুত্রের মৃত্যুরোগ প্রকাশ পাইল, তিনি রক্তবমন করিতে লাগিলেন। মৃত্যুর পূর্বে সারিপুত্র মাতাকে ধর্মশিক্ষা দিয়া বলিয়াছিলেন ইহাদ্বারা তিনি মাতার তাঁহাকে জন্মদান লালনপালন ও শিক্ষাদান প্রভৃতি উপকারের প্রতিদান করিলেন। তারপর সারিপুত্র তাঁহার শিষ্যদের নিকট যদি কোনও দোষ করিয়া থাকেন সেজন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করিলেন। সারিপুত্রের মৃত্যুতে মাতা অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন এবং বাঁচিয়া থাকিতে পুত্রের উপযুক্ত সমাদর করেন নাই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। সারিপুত্রের ভ্রাতা সারিপুত্রের ভিক্ষাপাত্র ও চীবর বুদ্ধের কাছে লইয়া গেলে—কোনও ভিক্ষুর মৃত্যু হইলে তাহার ভিক্ষাপাত্র ও চীবর গুরুর নিকটে লইয়া আসা সন্ন্যাসীসম্প্রদায়গণের নিয়ম ছিল—তাহা দেখাইয়া বুদ্ধ শিষ্যগণকে বলিলেন "ভিক্ষুগণ, যিনি এই সেদিন পর্যন্ত তোমাদের সম্মুখেই এত কাজ করিতেছিলেন, দেখ, তাঁহার এইমাত্র অবশেষ আছে!" বুদ্ধ সারিপুত্রের প্রশংসা করিয়া বলিয়াছিলেন "সারিপুত্র লোকের সহিত বন্ধুত্ব করিতে জানিতেন, তিনি মহাজ্ঞানী ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি ছিলেন, তিনি আত্মসংযমী ও অল্পে সন্তুষ্ট ছিলেন, তিনি দীর্ঘ কথা বলিতেন না, নির্জনে থাকিতে ভালবাসিতেন এবং বাদবিসম্বাদপ্রিয় ছিলেন না; ধর্মের জন্য তিনি বহু ত্যাগস্বীকার করিয়াছিলেন; আমার ধর্মপ্রচারে সারিপুত্র পৃথিবীর মত ধৈর্য ও শৃঙ্গহীন (অর্থাৎ হিংসাদ্বেষবিরহিত) বৃষের মত শক্তি দেখাইয়াছেন; তাঁহার মত লোক পৃথিবীতে অল্পই জন্মগ্রহণ করে।" সারিপুত্রের গুণে বুদ্ধ যে কত মুগ্ধ ছিলেন তাহা এইকথায় বুঝা যায়; সারিপুত্রের প্রতি তাঁহার অগাধ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা ছিল। সারিপুত্রের মৃত্যুতে ও বুদ্ধের মুখে তাঁহার প্রশংসা শুনিয়া কোমলপ্রাণ আনন্দ অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন, তিনিও সারিপুত্রকে বহুশ্রদ্ধা করিতেন। বুদ্ধ সকল বস্তুর নশ্বরতা বুঝাইয়া আনন্দকে সান্ত্বনা দিলেন।

কোটিগ্রাম হইতে বুদ্ধ নাদিকগ্রের গ্রামে গেলেন। এই স্থানে মৃত কয়েকজন ভিক্ষুর অবস্থা কি হইয়াছে, সে সম্বন্ধে আনন্দ প্রশ্ন করিলে বুদ্ধ বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন মৃত্যু সকলেরই হইবে এবং এই তুচ্ছ বিষয় লইয়া তথাগতকে প্রশ্ন করা অনুচিত। অতঃপর তিনি বৈশালীতে গিয়া গণিকা আম্রপালীর আমবাগানে রহিলেন। ভিক্ষুরা বৈশালীতেই রহিল কিন্তু বুদ্ধ অনতিদূরস্থ বেলুবগ্রামে গিয়া বর্ষাযাপন করিলেন।

এই সময়েই তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন কিন্তু শিষ্যদের সহিত শেষসাক্ষাৎ করিয়া তাহাদের নিকট বিদায় লইবার অভিপ্রায়ে অসুস্থতা প্রকাশ করেন নাই। তাঁহাব অসুস্থতায় শঙ্কিত হইয়া আনন্দ বলিলেন সংঘসম্বন্ধে ব্যবস্থা না করিয়া তথাগতেব নির্বাণলাভ করা উচিত নহে। বুদ্ধ বলিলেন "সংঘ আমার নিকট কি প্রত্যাশা করে? আমি তো ধর্মসম্বন্ধে কিছুই গোপন রাখিয়া বলি নাই; এবিষয়ে তথাগত তাঁহার শিক্ষাসম্বন্ধে কৃপণ গুরুর মত হন নাই। 'আমি সংঘ পরিচালনা করিব', 'সংঘ আমার অপেক্ষায় থাকে' এরূপ যাঁহারা বলেন তাঁহারাই সংঘসম্বন্ধে ব্যবস্থা করিবেন; কিন্তু তথাগত এরূপ মনে করেন না যে 'আমি সংঘ পবিচালনা করিব,' 'সংঘ আমার অপেক্ষায় থাকে'; তবে কেন তথাগত সংঘসম্বন্ধে ব্যবস্থা করিবেন? আনন্দ, আমি এখন বৃদ্ধ হইযাছি, আমাব বয়োবৃদ্ধি হইয়াছে, এখন আমার আশী বৎসব বয়স হইয়াছে; পুরাতন জীর্ণ শকটের মত অনেক জোড়াতালি দিয়া এখন তথাগতের শরীররক্ষা করিতে হয়; এখন মাত্র অনন্যচিত্ত ধ্যানের অবস্থাতে তথাগতের শবীর সুস্থবোধ করে। অতএব আনন্দ, এখন তোমরা নিজেরাই নিজেদের দ্বীপ (অর্থাৎ আশ্রয়স্থল, কেহ বলেন 'দীপ') হইয়া, নিজেদের শরণ হইয়া বিহার কর, অন্য কিছুব বা কাহারও শরণ লইও না; আনন্দ, এখন বা আমার মৃত্যুর পর যে জিজ্ঞাসু আত্মদ্বীপ আত্মশরণ অনন্যশবণ হইযা, ধর্মদ্বীপ ধর্মশরণ ও অনন্যশরণ হইয়া বিহার করিবে, সেই ভিক্ষুই অন্ধকারের পরপ্রান্তে পৌঁছিবে।"

পরদিন বুদ্ধ বৈশালীতে ভিক্ষা করিলেন। ভিক্ষান্তে ফিরিয়া তিনি আনন্দের সহিত অনেক কথা বলিলেন। বর্ণিত আছে এই সময়ে তিনি কয়েকবার আনন্দকে বলিয়াছিলেন ইচ্ছা করিলে তিনি অনেকদিন বাঁচিয়া থাকিতে পারেন কিন্তু আনন্দ ইহার উত্তরে কিছু না বলায় বুদ্ধ তাঁহাকে

বিদায় দিলেন এবং আনন্দ গিয়া এক বৃক্ষতলে বসিলেন ; তারপর ভূমিকম্পাদি হইল ; বুদ্ধ পুনরায় অনেক উপদেশ দিলেন এবং আনন্দ বুদ্ধকে এককল্প বাঁচিয়া থাকিতে অনুরোধ করিলে পূর্বে এই অনুরোধ না করার জন্য বুদ্ধ আনন্দকে ভৎর্সনা করিলেন। বোধহয় সাধারণ লোকের মত বুদ্ধেরও যে মৃত্যু হইয়াছিল, ইহাতে লজ্জিত বোধ করিয়া শাস্ত্রকাররা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে বুদ্ধের মৃত্যু হইয়াছিল বটে তবে তিনি ইচ্ছা করিলে নাও মরিতে পারিতেন। আনন্দের মুখে বৈশালীর ভিক্ষুদিগকে ডাকাইয়া তাঁহার উপদিষ্ট ধর্মসম্বন্ধে শিক্ষা দিয়া বুদ্ধ বলিলেন "এস ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদিগকে উপদেশ দিতেছি ; সকল বস্তুই বিনাশশীল, প্রমাদহীন হইয়া সচেষ্ট থাক ; অচিরেই তথাগত নির্বাণলাভ করিবেন।"

পরদিন আবার বৈশালীতে ভিক্ষায় বাহির হইয়া ফিরিবার সময়ে তিনি শেষবারের মত বৈশালীনগরীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। সংসারকে তিনি উপেক্ষা করেন নাই, বৈশালীর মত জনাকীর্ণ স্থানকেই তিনি তাঁহার কর্মস্থল মনে করিতেন। বেলুবগ্রাম হইতে তিনি কয়েকস্থান হইয়া পাবাগ্রামে আসিয়া চুন্দ নামক কর্মকারের আমবাগানে রহিলেন।

চুন্দ তাঁহাকে আহারে নিমন্ত্রণ করিল। আহার্য দ্রব্যের মধ্যে অনেক ভাল জিনিষ এবং বহুপরিমাণ 'সূকরমদ্দব' ছিল। সূকরমদ্দবের অর্থ বৌদ্ধগণ কেহ শূকরমাংস, কেহ শূকরপদপিষ্ট কন্দবিশেষ, কেহ 'ব্যাঙের ছাতা' প্রভৃতি বুঝিয়াছেন। মনে হয় ইহা একপ্রকার কন্দজাতীয় 'মাটি-আলু' বিশেষ, দেখিতে শূকরদেহের মত অথবা শূকরের প্রিয়খাদ্য বলিয়া ঐ নাম হয়। অশীতিবর্ষীয় অসুস্থব্যক্তিকে নিমন্ত্রণকর্তা শূকরমাংস খাইতে দিবে ইহা সম্ভবপর মনে হয় না। বুদ্ধ এই আহার্যের দুষ্পাচ্যতা সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছিলেন এবং ইহা খাইবার পর তিনি রক্ত-আমাশয় রোগে আক্রান্ত হইয়া অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িলেন, তাঁহার রক্তপাত ও তীক্ষ্ণযন্ত্রণাবোধ হইল। ইহা সহ্য করিয়া তিনি পাবা হইতে কুশীনগর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে বেদনায় কাতর হইয়া তিনি আনন্দকে চীবর চারভাঁজ করিয়া গাছের তলায় বসিবার জন্য বিছাইয়া দিতে বলিলেন। তৃষ্ণার্ত হইয়া তিনি পানীয় জল চাহিলেন। আনন্দ জল আনিতে গিয়া দেখিলেন সেখানে গাড়ী পার

হওয়ার জল কর্দমাক্ত হইয়াছে। বুদ্ধ আবার পিপাসায় কাতর হইয়া জল চাহিলে আনন্দ অনেক দূর হইতে জল আনিয়া দিলেন।

আলার কালামের শিষ্য পুক্কুস নামে একজন মল্লবংশীয় লোক আসিয়া বলিল একবার আলার মুক্তস্থানে ধ্যানে বসিয়াছিলেন এবং তাঁহার নিকট দিয়া অনেক গাড়ী গিয়াছিল কিন্তু জাগ্রত ও সচেতন থাকিলেও ধ্যানের গভীরতায় তিনি তাহা মোটেই টের পান নাই। বুদ্ধ বলিলেন তিনি যখন আতুমা নামক স্থানে ছিলেন তখন একবার মুক্তস্থানে ধ্যানে বসিয়াছিলেন, ধ্যানান্তে দেখিলেন নিকটে অনেক লোক জড হইয়াছে এবং কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে প্রবল মেঘগর্জন ও বৃষ্টিপাত হইয়া গিয়াছে এবং বজ্রাঘাতে দুইজন কৃষক ও চারটি বলদ মারা পডিয়াছে কিন্তু তিনি কিছুই টের পান নাই। পুক্কুস বুদ্ধকে বস্ত্রদান করিলে আনন্দ তাহা বুদ্ধকে পরাইয়া দিলেন। তাবপর বুদ্ধ উঠিয়া আবার চলিতে আরম্ভ করিলেন। পথে ককুত্থা নদীতে পৌছিয়া তিনি স্নান ও জলপান করিলেন এবং এক আমবাগানে গিয়া শয়ন করিলেন। চুন্দের প্রদত্ত ভোজ্য আহার করিয়া তাঁহার ব্যাধিবৃদ্ধি হইল বলিয়া কেহ যেন চুন্দকে দোষ না দেয়, আনন্দকে তিনি এই কথা জানাইলেন। তারপর হিরণ্যবতী নদী পার হইয়া কুশীনগরের বহিঃস্থ শালবনে পৌছিয়া বেদনায় কাতর হইয়া তিনি আনন্দকে শয্যা প্রস্তুত করিতে বলিয়া শয়ন করিলেন। ইহাই তাঁহার শেষ শয়ন। বর্ণিত আছে এই সময়ে বুদ্ধ স্থবির উপবাণকে তাঁহার সম্মুখ হইতে সরিয়া যাইতে বলিয়াছিলেন কারণ দেবতারা বুদ্ধকে দেখিতে আসিয়াছিলেন ও উপবাণ বুদ্ধকে আডাল করিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। বোধহয় বুদ্ধকে বেদনাকাতর দেখিয়া উপবাণ তাঁহার উপর সস্নেহে ঝুঁকিয়া পড়ায় বুদ্ধ উপবাণকে সরিয়া যাইতে বলিয়াছিলেন।

স্ত্রীলোকদের প্রতি ব্যবহাব সম্বন্ধে আনন্দের যে প্রশ্নের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা শাস্ত্রে এইস্থানে বিবৃত আছে। মৃত্যু সন্নিকট দেখিয়া আনন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন "ভদন্ত, তথাগতের দেহাবশেষের আমরা কি ব্যবস্থা করিব ?"

"আনন্দ, তথাগতের দেহাবশেষের প্রতি সম্মানাদি দেখাইবার কথা তোমাদের ভাবিবার প্রয়োজন নাই। আনন্দ, আমি তোমাদিগকে অনুরোধ

করিতেছি, তোমরা নিজেদের যত্ন কর, নিজেদের উন্নতির জন্য চেষ্টা কর, নিজেদের জন্য উদ্যম কর, নিজেদের মঙ্গলের প্রতি যত্নশীল হও ; যে উপাসকেরা এবং ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় গৃহপতিরা তথাগতকে শ্রদ্ধা করেন, তাঁহারা তথাগতের দেহাবশেষের যথোচিত ব্যবস্থা করিবেন।”

বুদ্ধ আরও বলিয়াছিলেন “যে ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী ধর্মশরণ হইয়া বিহার করে, যে সম্যক্ আচরণে যত্নবান হয়, যে ধর্মানুযায়ী কর্ম করে, সেই তথাগতের সর্বশ্রেষ্ঠ পূজা করে।”

তারপর একটি করুণ দৃশ্য অভিনীত হইল। যে গুরুকে তিনি এত ভালবাসিতেন, এত ভক্তি ও সেবা করিতেন, তাঁহার অন্তিমসময়ের অবস্থা আর সহিতে না পারিয়া আনন্দ দূরে সরিয়া রোদন করিতে লাগিলেন— “হায়, আমি এখনও শিক্ষাধীন আছি, আমার এখনও অনেক বাকি রহিল এবং যে ভগবান আমাকে এত স্নেহ করিতেন তিনি নির্বাণলাভ করিতেছেন !”

বুদ্ধ আনন্দকে ডাকাইয়া বলিলেন “না আনন্দ, অধীর হইও না, কাঁদিও না। আমি কি তোমাকে পূর্বে বহুবার বলি নাই যে, যে সকল বস্তু আমাদের অতিপ্রিয় তাহাদের স্বভাবই এই যে আমাদিগকে তাহা ছাড়িতে হইবে, ত্যাগ করিতে হইবে ? আনন্দ, যে সকল বস্তুর জন্ম আছে, উৎপত্তি আছে এবং যাহা অবশ্যই নাশ হইবে, তাহার যে বিনাশ হইবে না ইহা কি করিয়া সম্ভব হয় ? এরূপ হইতেই পারে না। আনন্দ, তুমি বহুকাল চিন্তা বাক্য ও কার্যে আমার প্রতি প্রীতি দেখাইয়াছ ও আমার অন্তরঙ্গ ছিলে, তুমি আমার অনেক সেবা করিয়াছ, অনেক যত্ন লইয়াছ, ইহার কখনও ব্যতিক্রম হয় নাই ও ইহা অতুলনীয়। আনন্দ, তুমি ভালই করিয়াছ ; সযত্নে প্রয়াস কর, তুমিও অচিরে পাপ হইতে মুক্ত হইবে।” শিষ্যদিগকে সম্বোধন করিয়া বুদ্ধ বলিলেন “ভিক্ষুগণ, আনন্দ পণ্ডিত ; কখন্ তথাগতের সহিত দেখা করিতে হয় তাহা আনন্দ জানিত, কখন্ ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী, উপাসক বা উপাসিকা, গুরুগণ বা শিষ্যগণ, রাজা বা মহামাত্রগণের তথাগতের সহিত দেখা করিবার উপযুক্ত সময়, আনন্দ তাহাও জানিত ; আনন্দকে দেখিয়া ভিক্ষু ভিক্ষুণীরা পুলকিত হইত, আনন্দ ধর্মব্যাখ্যা করিলে তাহারা তুষ্ট হইত, আনন্দ নীরব থাকিলে তাহারা ক্ষুব্ধ হইত। তিনি আনন্দকে আবার বলিলেন “আনন্দ, তোমাদের মধ্যে কাহারও হয়তো এরূপ মনে হইতে পারে, ‘ভগবানের কথা

শেষ হইয়া গিয়াছে, আমাদের গুরু আর কেহ নাই।' কিন্তু আনন্দ, এরূপ মনে করা তোমাদের উচিত হইবে না। আমি যে ধর্ম প্রচার করিয়াছি ও সংঘের জন্য যে সকল নিয়ম প্রণয়ন করিয়াছি, আমার অভাবে তাহাই যেন তোমাদের উপদেষ্টা হয়।"

ভিক্ষুরা তাঁহার অভাবে পরস্পরের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবে, বয়োজ্যেষ্ঠ ও বয়ঃকনিষ্ঠ পরস্পরকে কি বলিয়া সম্বোধন করিবে, তাহারও বিধান তিনি এই সময়ে দিয়াছিলেন বলিয়া বর্ণিত আছে কিন্তু নারীগণের সহিত ব্যবহার সম্বন্ধীয় বাণীর মত ইহাও সম্ভবতঃ অনেক পূর্বের উক্তি। যাঁহার সহিত বহুদিন একত্র কাটিয়াছে, এরূপ ভক্তিভাজন ব্যক্তির অন্তিমসময়ে এই সকল প্রশ্ন বড়ই অসাময়িক মনে হয়। আনন্দ নাকি বুদ্ধকে অপেক্ষাকৃত বিখ্যাত কোনও স্থানে দেহত্যাগ করিতে অনুরোধও করিয়াছিলেন।

মল্লবংশীয়রা সংবাদ পাইয়া সপরিবারে বুদ্ধদর্শনে উপস্থিত হইলে একজন একজন করিয়া তাহাদিগকে বুদ্ধসমীপে লইয়া যাওয়ার সুবিধা না হওয়ায় আনন্দ এক এক পরিবারকে এক এক বারে লইয়া গিয়া বুদ্ধদর্শন করাইলেন। সেই স্থানের সুভদ্র নামক এক সন্ন্যাসী সংবাদ শুনিয়া বুদ্ধদর্শনে আসিয়াছিল, আনন্দ তাহাকে বুদ্ধের নিকটে যাইতে নিষেধ করিতেছিলেন কিন্তু বুদ্ধ শুনিতে পাইয়া সুভদ্রকে আসিতে দিতে বলিলেন। অবশেষে বুদ্ধ ভিক্ষুদের জিজ্ঞাসা করিলেন কাহারও কিছু জিজ্ঞাস্য আছে কিনা। ভিক্ষুরা কেহই কিছু বলিল না এবং কাহারও যে কোনও বিষয়ে কোনও সংশয় নাই ইহাতে আনন্দের সবিস্ময় হর্ষ হইল। তখন বুদ্ধ বলিলেন 'ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদিগকে এই উপদেশ দিতেছি—সকল বস্তুই বিনাশশীল, অপ্রমাদের সহিত প্রয়াস কর।" অতঃপর তিনি ধ্যানের বিভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। আনন্দ স্থবির অনুরুদ্ধকে বলিলেন "ভদন্ত অনুরুদ্ধ, ভগবান নির্বাণলাভ করিয়াছেন ;"

"না আনন্দ, ভগবান নির্বাণলাভ করেন নাই। যে অবস্থায় চেতনা ও বেদনার অন্ত হয়, তিনি সেই অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন।"

আরও কয়েকবার উচ্চ হইতে নীচ ও নীচ হইতে উচ্চ ধ্যানের বিভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া (অর্থাৎ বোধহয় অল্পে অল্পে চৈতন্যলোপ হইয়া) রাত্রির তৃতীয় যামে বুদ্ধ নির্বাণলাভ করিলেন। ভিক্ষুদের মধ্যে যাঁহারা সম্পূর্ণ

মায়ানির্মুক্ত হইয়াছিলেন তাঁহারা ব্যতীত অন্য সকলে বিলাপ করিতে লাগিল। সকল প্রিয়বস্তুরই পরিবর্তন ও বিয়োগ আছে এবং উৎপন্ন বস্তুমাত্রই নাশধর্মী, তথাগতের এই শিক্ষা স্মরণ করাইয়া স্থবির অনুরুদ্ধ সকলকে সান্ত্বনা দিলেন।

পরদিন অনুরুদ্ধ আনন্দের মুখে কুশীনগরের মল্লদিগকে সংবাদ পাঠাইলে মল্লেরা গন্ধমাল্য বাদ্য ও বস্ত্রাদি লইয়া আসিল এবং কয়েকদিন ধরিয়া নৃত্যগীত চলিল। মৃতদেহ নগরের মধ্যে লইয়া যাওয়া হইল। স্থবির কাশ্যপ সে সময়ে পাবাগ্রামে ছিলেন, এক আজীবিক শ্রমণের মুখে সংবাদ শুনিয়া তিনি পাবা হইতে যাত্রা করিলেন। স্থবির কাশ্যপ না পৌঁছা পর্যন্ত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া স্থগিত রাখা হইয়াছিল। সুভদ্র নামক তাঁহার এক শিষ্য বৃদ্ধবয়সে সংঘে প্রবেশ করিয়াছিল, সে সকলকে বলিল "তোমরা শোক বা বিলাপ করিও না, মহাশ্রমণের হাত হইতে আমরা নিস্তার পাইয়াছি ভালই হইয়াছে; 'ইহা তোমাদের উচিত,' 'ইহা তোমাদের অনুচিত' বলিয়া প্রায়ই আমাদের ত্যক্ত করা হইত, এখন আমরা যাহা ইচ্ছা করিতে পারিব, যাহা ইচ্ছা নহে তাহা করিব না।" স্থবির কাশ্যপ সুভদ্রকে নিরস্ত করিয়া ভিক্ষুদিগকে সান্ত্বনা দিলেন।

রাজা অজাতশত্রু বলিয়া পাঠাইলেন "ভগবানও ক্ষত্রিয় ছিলেন, আমিও ক্ষত্রিয়; আমিও তাঁহার দেহাবশেষের অংশ পাইবার যোগ্য।" বৈশালীর লিচ্ছবিগণ, কপিলবাস্তুর শাক্যগণ, অল্লকপ্পের বুলিগণ, রামগ্রামের কোলিয়গণ, বেঠদীপের একজন ব্রাহ্মণ এবং পাবাগ্রামের মল্লগণও অংশ চাহিল। কিন্তু কুশীনগরের মল্লেরা ঘোষণা করিল যে, বুদ্ধ যখন তাহাদের রাজ্যে দেহত্যাগ করিয়াছেন তখন তাহারা কাহাকেও তাঁহার দেহাবশেষের অংশ দিবে না। ইহাতে বিবাদের সূত্রপাত হওয়ায় (বর্ণিত আছে এক ব্রাহ্মণের মধ্যস্থতায়) দেহাবশেষ "আট" ভাগে ভাগ করিয়া সকলকে এক এক ভাগ দেওয়া হইল। পিপ্‌ফলিবনের মোরিয়গণ বিলম্বে উপস্থিত হওয়ায় অংশ না পাইয়া শুধু চিতাভস্ম গ্রহণ করিল।

বুদ্ধের অন্তিমসময়ে তাঁহাকে যে সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয় বলিয়া বর্ণিত আছে, তাহার মধ্যে ছন্ন নামক ভিক্ষুকে কৃতাপরাধের জন্য দণ্ডদান-বিষয় উল্লিখিত আছে। এই ছন্ন বোধহয় সিদ্ধার্থের মহানিক্রমণের সঙ্গী সেই

ছন্দক, সে সংঘে প্রবেশ করিয়াছিল এবং বাল্যকাল হইতে বুদ্ধকে জানিত বলিয়া পুরাতন ভৃত্যের মনোবৃত্তিতে সংঘের কাহাকেও মানিত না এবং অপরাধ করিয়া দণ্ডপালন করিতেও অস্বীকৃত হয়। বুদ্ধ যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন তাহার আত্মাভিমানে আঘাত করেন নাই কিন্তু তিনি—অবশ্যই অনেকদিন পূর্বে—বলিয়া গিয়াছিলেন সে যদি দণ্ডগ্রহণ না করে তবে যেন তাঁহার মৃত্যুর পর তাহাকে সংঘ হইতে বহিষ্কার করা হয়।

বৌদ্ধগণের মধ্যে প্রসিদ্ধি আছে বৈশাখীপূর্ণিমায় বুদ্ধের দেহত্যাগ ঘটে, কিন্তু ইহা সম্ভবতঃ ঠিক নহে কারণ বৈশালীর নিকটস্থ বেলুবগ্রামে শেষবর্ষা যাপনের পর হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাঁহার যে সকল স্থানে ভ্রমণ ও অবস্থিতি শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, তাহাতে দীর্ঘতমপক্ষে দুই মাসের অধিক সময় লাগা সম্ভব নহে। কার্তিক মাসে বর্ষাবাস শেষ হয়, তাহার মাস দুই পরে অর্থাৎ পৌষ-মাঘ মাসে সম্ভবতঃ বুদ্ধের মৃত্যু হয়। বর্ণনায় আছে বুদ্ধের মৃত্যুসময়ে শালবনে "অকালে" পুষ্পবৃষ্টি হয়। শালফুল বসন্ত-গ্রীষ্মে ফুটে, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাস হইলে অবশ্যই তাহাকে "অকাল" বলা হইত না।

[ধম্মপদট্‌ঠকথা ; মহাপরিনিব্বানসুত্ত।]



অগ্নিময়স্তম্ভগাত্রে বৌদ্ধত্রিরত্নপ্রতীক—অমরাবতীস্তূপ-ভাস্কর্য হইতে

১৪

বৌদ্ধধর্মের পরিণতি

অনুমান খ্রী. পূ. ৪৮৩ বুদ্ধ নির্বাণলাভ করিয়াছিলেন। তাহার কয়েক মাস পরে ভিক্ষুরা মিলিত হইয়া তাঁহার বাণীসংগ্রহের ব্যবস্থা করিলেন। বুদ্ধবাণীসংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে স্থবির কাশ্যপ (ইঁহাকে পরে মহাকাশ্যপ বলা হইত) যাহা বলিয়াছিলেন তাহাতে মনে হয় ধর্ম ও বিনয় সম্বন্ধে তখনই সংঘে মতভেদ আরম্ভ হইয়াছিল—যাহা ধর্ম ও বিনয় তাহা গৃহীত না হইয়া যাহা ধর্ম ও বিনয় নহে তাহা গ্রহণ ও পালনের সম্ভাবনা আছে, এরূপ ভয়ের কারণ ছিল।

মহাকাশ্যপের নেতৃত্বে এইজন্য যথারীতি জ্ঞপ্তিদ্বারা "পাঁচশত" স্থবির ভিক্ষু নির্বাচিত হইলেন। আনন্দকে প্রথমে নির্বাচন করা হয় নাই কারণ বোধহয় বয়সে তিনি বিশেষ প্রবীণ ছিলেন না এবং স্থবিররা সম্ভবতঃ কোনও কারণে তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি সর্বদা বুদ্ধের সান্নিধ্যে থাকিতেন বলিয়া সকল বিষয়ে যথাযথ বিবরণ দিতে পারিবেন, এইজন্য শেষে তাঁহাকেও লওয়া হয়। স্থবিররা রাজগৃহে বর্ষাবাস করিয়া ধর্ম ও বিনয় সংগ্রহ করিবেন স্থির হইল। এইজন্য অন্য ভিক্ষুদের সেই বর্ষা রাজগৃহে যাপন নিষিদ্ধ হইল কারণ অত্যধিক লোক হইলে গৃহীদের ভিক্ষাদানে অসুবিধা হইবে। রাজগৃহের সপ্তপর্ণীগুহায় এই সভার কার্য অনুষ্ঠিত হয়। স্থবিররা বর্ষার প্রথম মাস সংস্কারকার্যে কাটাইয়া দ্বিতীয় মাস হইতে সভার কার্য আরম্ভ করিলেন। সংসদের অনুমতিক্রমে মহাকাশ্যপ ভিক্ষু উপালিকে এক এক করিয়া বিনয়ের নিয়মগুলি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। কোথায় কি উপলক্ষ্যে বুদ্ধ কোন্ নিয়ম প্রবর্তন করিয়াছিলেন, উপালি তাহা সংসদকে জানাইলেন। তারপর সেইভাবেই মহাকাশ্যপ আনন্দকে বুদ্ধের ধর্মোপদেশগুলির কথা এক এক করিয়া জিজ্ঞাসা করিলে কোথায় কি উপলক্ষ্যে বুদ্ধ কোন্ উপদেশ দিয়াছিলেন, আনন্দ তাহা সংসদকে জানাইলেন। আনন্দ আরও জানাইলেন যে বুদ্ধ বলিয়াছিলেন সংঘ ইচ্ছা করিলে তাঁহার মৃত্যুর পর কয়েকটি নিয়ম প্রত্যাহার করা যাইতে পারিবে।

এই নিয়মগুলি কি কি, সে সম্বন্ধে আনন্দ কি ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ?—মহাকাশ্যপের এই প্রশ্নের উত্তরে আনন্দ বলিলেন তিনি তাহা করেন নাই ; তখন কোন্ কোন্ নিয়ম সম্বন্ধে বুদ্ধ সম্ভবতঃ এরূপ বলিয়াছিলেন তাহা লইয়া স্থবিরদের মধ্যে তর্ক ও মতভেদ হইল। অবশেষে মহাকাশ্যপ বলিলেন ভিক্ষুদের অনেক বিনয়নিয়মে গৃহীরাও সম্পৃক্ত, ভিক্ষুরা যদি বিনয়নিয়মের এমন কোনও পরিবর্তন করেন যাহা গৃহীদের অনভিপ্রেত, তবে গৃহীরা ভিক্ষুদের নিয়মশৈথিল্যের নিন্দা করিবে, অতএব যে নিয়মগুলি প্রবর্তিত হইয়াছে তাহার কোনও পরিবর্তন বাঞ্ছনীয় নহে। ইহাতে বিবাদের নিষ্পত্তি হইল বটে কিন্তু স্থবিররা নিরীহ আনন্দের উপর ঝাল ঝাড়িলেন—"আয়ুষ্মন্ আনন্দ, এবিষয়ে ভগবানকে জিজ্ঞাসা না করিয়া তুমি ভাল কর নাই ; তোমার দোষ স্বীকার কর।"

"ভদন্তগণ আমি অনবধানতাবশতঃ ভগবানকে একথা জিজ্ঞাসা করি নাই, ইহাতে আমি কোনও দোষ দেখিতেছি না, তথাপি আপনাদের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ আমি দোষস্বীকার করিতেছি।"

"আয়ুষ্মন্ আনন্দ, তুমি যে ভগবানের বর্ষাচীবর সেলাই করিবার সময়ে তাহা পায়ে মাড়াইয়াছিলে, তাহাও তোমার করা ভাল হয় নাই ; তোমার দোষ স্বীকার কর।"

"ভদন্তগণ, ভগবানের প্রতি ভক্তির কোনও অভাববশতঃ যে আমি তাহা করিয়াছিলাম তাহা নহে, ইহাতে আমি কোনও দোষ দেখিতেছি না, তথাপি আপনাদের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ আমি সে দোষ স্বীকার করিতেছি।"

"আয়ুষ্মন্ আনন্দ, তুমি যে তথাগতের দেহত্যাগের পর প্রথমে স্ত্রীলোকদিগকে ভগবানের দেহবন্দনা করিতে দিয়াছিলে (এই ঘটনা কিন্তু মহাপরিনিব্বানসুত্তে বর্ণিত নাই) তাহাও তোমার করা ভাল হয় নাই, নারীগণের অশ্রুপাতে ভগবানের দেহ কলুষিত হইয়াছিল। তোমার দোষ স্বীকার কর।"

"ভদন্তগণ, স্ত্রীলোকদের যাহাতে বিলম্ব হইয়া না যায়, এই উদ্দেশ্যে আমি তাহা করিয়াছিলাম, ইহাতে আমি কোনও দোষ দেখিতেছি না, তথাপি আপনাদের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ আমি সে দোষ স্বীকার করিতেছি।"

তারপর বুদ্ধ ইচ্ছা করিলে বহুকাল বাঁচিতে পারেন, বহুবার এরূপ ইঙ্গিত করা সত্ত্বেও আনন্দ যে বুদ্ধকে আরও দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকিতে অনুরোধ

করেন নাই, এজন্যও আনন্দকে অপরাধী করা হইল। আনন্দ দোষস্বীকার করিয়া বলিলেন মারকর্তৃক বিভ্রান্তচিত্ত হওয়ায় তাঁহার এই ত্রুটি হইয়াছিল। স্থবিররা পুনরায় বলিলেন "আয়ুষ্মন্ আনন্দ, তথাগতপ্রবেদিত ধর্মবিনয়ে স্ত্রীলোকদিগের প্রব্রজ্যাগ্রহণে তুমি যে আগ্রহ দেখাইয়াছিলে তাহাও তোমার ভাল হয় নাই, তোমার দোষ স্বীকার কর।"

"ভদন্তগণ, আমি তাহা করিয়াছিলাম ভগবানের মাতৃষ্বসা মহাপ্রজাবতী গৌতমীর কথা ভাবিয়া—যিনি ভগবানকে লালনপালন ও দুগ্ধদান করিয়াছিলেন, যিনি ভগবানের জনয়িত্রীর মৃত্যুর পর ভগবানকে স্বয়ং মাতার ন্যায় স্তন্যদান করিয়াছিলেন। ইহাতে আমি কোনও দোষ দেখিতেছি না, তথাপি আপনাদের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ আমি দোষ স্বীকার করিতেছি।"

অবশেষে ছন্নকে শাস্তিদান সম্বন্ধে বুদ্ধ যাহা বলিয়াছিলেন আনন্দ তাহা সংসদকে জানাইলে সংসদ তাঁহাকে সেই নির্দেশপালনের অনুমতি দিলেন। এই সংসদের ব্যবস্থিত ধর্মবিনয় বোধহয় সংঘের সকলে স্বীকার করিয়া লন নাই কারণ দক্ষিণগিরি হইতে আগত ভিক্ষু পুরাণকে স্থবিররা ইহা গ্রহণ করিতে বলিলে তিনি বলিয়াছিলেন স্থবিররা যাহা করিয়াছেন ভালই করিয়াছেন কিন্তু তিনি স্বয়ং বুদ্ধের নিকট হইতে যেরূপ জানিয়াছেন ও শুনিয়াছেন সেইরূপই পালন করিবেন।

দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ সংঘসম্মেলন

মহানির্বাণের প্রায় একশত বৎসর পরে রাজা কাকবর্ণ বা কালাশোকের রাজত্বকালে বিনয়ের নিয়ম পর্যালোচনার জন্য অনুমান খ্রী. পূ. ৩৮৩ বৈশালীতে দ্বিতীয় সংঘসম্মেলন হয়। ইহার কারণ এইরূপ ঘটিয়াছিল—বৈশালীর বৃজিবংশীয় ভিক্ষুরা কয়েকটি অশাস্ত্রীয় নিয়মের প্রচলন করিয়াছিল যথা, শৃঙ্গনির্মিত পাত্রে লবণ রাখা যাইতে পারিবে, মধ্যাহ্নভোজনের পরও দধিসেবন করা যাইতে পারিবে, স্বর্ণরৌপ্যদান গ্রহণ করা যাইতে পারিবে ইত্যাদি। ভিক্ষু কাকণ্ডকপুত্র যশ বৃজিদেশে ভ্রমণ করিতে করিতে বৈশালীতে আসিয়া মহাবনে কূটাগারশালায় উঠিয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন এখানে ভিক্ষুরা গৃহী-উপাসকদিগকে অর্থদান করিতে বলিতেছে এবং তাঁহার নিষেধ সত্ত্বেও গৃহীরা অর্থদান করিতেছে। ভিক্ষুরা তাঁহাকে অর্থের ভাগ দিতে

চাহিলে তিনি অস্বীকৃত হইলেন। ভিক্ষুরা ইহাতে তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিল যে তাঁহার জন্য গৃহীরা ভিক্ষুদের প্রতি শ্রদ্ধা হারাইবে এবং ভিক্ষুরা স্থির করিল যশকে ক্ষমাপ্রার্থনা করিতে হইবে। যশ নগরে গিয়া গৃহীদের নিকটে সব কথা বলিলেন এবং বুদ্ধের বচন ও নানা ঘটনাবলী উল্লেখ করিয়া দেখাইলেন যে অর্থদানগ্রহণ ভিক্ষুদের পক্ষে অনুচিত। ইহাতে গৃহীরা ঘোষণা করিল একমাত্র যশই প্রকৃত শাক্যপুত্রীয় শ্রমণ, অন্য ভিক্ষুরা নহে, সুতরাং তাহারা যশকেই ভিক্ষা দিবে, অন্যদের দিবে না। বৃজিভিক্ষুরা ইহাতে অপ্রসন্ন হইয়া যশকে সংঘ হইতে বহিষ্কার করিল কিন্তু যশ প্রধান প্রধান স্থবিরদের নিকটে গিয়া এই বিষয়ের বিচার করিতে বলিলেন। স্থবিররা যশকে রেবত নামক প্রসিদ্ধ জ্ঞানী ও শীলবান ভিক্ষুর নিকট পাঠাইলেন এবং রেবত যশের সহিত একমত হইলেন। এই সংবাদ পাইয়া বৃজিভিক্ষুরাও রেবতের নিকটে আসিল। বহু গোলযোগের পর সংঘের অধিবেশন হইল এবং তাহাতে সর্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষু সর্বকামী (ইনি আনন্দের শিষ্য ছিলেন) বৃজিভিক্ষুদের আচরণ বিনয়বিরুদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে অনুমান খ্রী. পূ. ২৪৭ পাটলিপুত্র নগরে তৃতীয় সম্মেলন হইয়াছিল। ইহাতে ধর্ম ও বিনয় সম্বন্ধে ব্যবস্থাদান করা হয়। সম্রাট কণিষ্কের রাজত্বকালে অনুমান খ্রী. ১ শতকে পঞ্জাব বা কাশ্মীরে চতুর্থ সম্মেলন হয়।

কণিষ্কের প্রায় সমসাময়িক যুগে মহাযান মতের প্রথম উদ্ভব হয়। প্রথম হইতেই সংঘে কোন কোনও বিষয়ে মতভেদ ছিল। কালক্রমে ছোট হইতে বড় বিষয়ে মতদ্বৈধ প্রকাশ পাইতে লাগিল ও অবশেষে সংঘ হীনযান ও মহাযান এই দুই দলে ভাগ হইয়া পড়িল। মহাযানের উদ্ভব ও প্রসার অতি বিস্তৃত প্রসঙ্গ, তাহার সারফল সম্বন্ধে সংক্ষেপে এই বলা যাইতে পারে যে মহাযানিকেরা প্রাচীন নির্বাণের আদর্শ খর্ব করেন নাই, সেই আদর্শের প্রসার ও পরিবর্ধন করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিতেন প্রত্যেক ব্যক্তিই বুদ্ধত্ব লাভ করিতে পারে ; শুধু নিজের জন্য নির্বাণ লাভ করিলেই হইবে না, অপরের মঙ্গলের জন্য ও বহু লোকের নিকট প্রচারের জন্য প্রত্যেককে বুদ্ধত্ব লাভ করিতে হইবে। এই আদর্শ যিনি অনুসরণ করেন তাঁহাকে মহা-

যানিকেরা বোধিসত্ত্ব বলিলেন। সংসার হইতে পরিত্রাণের জন্য বা স্বর্গলাভের জন্য পূর্ববর্তী বোধিসত্ত্বগণের আশ্রয়গ্রহণ করিতে হইবে, একথাও প্রচলিত হইল। বোধিসত্ত্ববাদের সহিত মহাযানে পূজা ও ভক্তিবাদ প্রবেশ করিল। ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রভাবের ফলে বহু দেবদেবীও মহাযানে গৃহীত ও পূজিত হইতে লাগিলেন; সাধারণ লোকের নিকটে নির্বাণবাদ যেরূপ শুষ্ক বোধ হইত, তাহার তুলনায় বোধিসত্ত্ববাদ অনেক হৃদয়গ্রাহী ও সহজবোধ্য মনে হইল।

মহাযানবাদের দার্শনিক চিন্তায়ও বহু পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল। খ্রী. ২ শতকে প্রসিদ্ধ দার্শনিক নাগার্জুন মহাযানবাদের বহু উন্নতিসাধন করেন এবং শূন্যবাদ বা মাধ্যমিক মতের প্রবর্তন করেন। খ্রী. ৫ শতকে পণ্ডিত বসুবন্ধু যোগাচারবাদ বা বিজ্ঞানবাদের প্রবর্তন করেন, বিজ্ঞানবাদে চৈতন্য (বিজ্ঞান) ব্যতীত অপর কোনও পদার্থের অস্তিত্ব অস্বীকৃত হয়।

উপসংহার

যে ধর্মের দেশবিদেশে এত প্রসার ও প্রতিপত্তি হইয়াছিল এবং যাহার প্রভাবে ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাধনা দূর দূর দেশে বিস্তৃত হইয়া অসভ্য বর্বর জাতিদিগকে সভ্যতার আলোক দান এবং সভ্যজাতিগণের সমাজে নবপ্রাণ সঞ্চার করিয়াছিল, সে ধর্ম স্বকীয় জন্মভূমি ভারত হইতে বিলুপ্ত হইল কেন, ঐতিহাসিকগণ তাহার আলোচনা করিয়াছেন। বৌদ্ধবিদ্বেষী হিন্দুরাজাদের অত্যাচারে বা শক্তিশালী ব্রাহ্মণদের নির্যাতনে বৌদ্ধধর্ম দেশত্যাগী বা সমূলে উৎপাটিত হইয়াছিল, এইমত অধিকাংশ ঐতিহাসিক ভ্রান্ত মনে করেন। বস্তুতঃপক্ষে বৌদ্ধধর্ম ভারত হইতে সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় নাই, কাল ও স্বভাববশে রূপান্তরিত হইয়াছিল।

এই পরিণতিও কয়েকটি কারণ দেখাইতে পারা যায়। "বয়ধম্মা সংখারা" অর্থাৎ সকল উৎপন্নবস্তুই বিনাশশীল, এই যে তত্ত্ব বুদ্ধ তাঁহার শিষ্যদিগকে নিয়ত বুঝাইতেন, তাহা ধর্ম সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। বুদ্ধ যত বড়ই হউন, তিনিও বিনাশশীল মানুষ ছিলেন। সকল মহাপুরুষবাণীরই দুইটি দিক থাকে—একটি কতকগুলি অক্ষয়সত্য উচ্চারণের দিক, আর একটি স্বীয় দেশকালের কতকগুলি প্রয়োজনসাধনের দিক। দুইটি দিকই পরিবর্তনশীল। পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বত্র দেখিতে পাওয়া যায় এক যুগে যাহা অক্ষয়সত্য বলিয়া

পরিগণিত হয়, আর এক যুগে হয়তো মহাসত্য বলিয়া মানা হইলেও অক্ষয়সত্য বলিয়া আর তাহা গ্রাহ্য হয় না। দ্বিতীয় দিকটি আরও অধিক চঞ্চলস্বভাব, দেশকালের প্রয়োজন নিষ্পন্ন হইয়া গেলে তাহা ত্বরায় পরিবর্তিত বা পরিত্যক্ত হয়। সহস্রাধিক বৎসর দেশকালের প্রয়োজন নিষ্পন্ন করিয়া বুদ্ধ ও তাঁহার শিষ্যদের প্রভাবও স্বভাববশে পরিবর্তিত মন্দীভূত ও বিলুপ্ত হইয়াছিল।

কয়েকটি বিশিষ্ট কারণে এই পরিবর্তনের আনুকূল্য হইয়াছিল। বুদ্ধ বৈদিক ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন, তিনি বেদ মানেন নাই, ব্রাহ্মণপুরোহিত-সমাজের যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকাণ্ডের নিন্দা করিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণেতর জাতিকে ব্রাহ্মণের মর্যাদা দান করিয়াছিলেন এবং জাতিব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব নরদেবত্ব প্রভৃতিকে বিদ্রূপ করিয়াছিলেন। যে দেশে একটি সুপ্রতিষ্ঠিত ও শক্তিশালী পুরাতন ধর্ম সমাজের মজ্জা পর্যন্ত প্রবেশ করিয়া থাকে, তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিলে অধিকাংশ স্থলেই বিরুদ্ধাচারীকে পরাজিত হইতে হয়। যীশুখ্রীষ্ট গোঁড়া ইহুদি ধর্মের সহিত দ্বন্দ্ব বাধাইয়া ধর্মযাজকদের চক্রান্তে প্রাণ হারাইয়াছিলেন এবং খ্রীষ্টধর্ম সমগ্র পৃথিবীতে গৃহীত হইলেও ইহুদিদের কাছে ত্যাজ্যই রহিয়া গেল। 'সনাতন' ধর্মকে ভিত্তি করিয়া ভারতে যাহা ইচ্ছা তাহা করা গিয়াছে কিন্তু ইহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া কেহ রক্ষা পায় নাই—এমন কি যে আবর্জনা ত্যাগ করিয়া শুধু কেবলমাত্র সারকেই স্বীকার করিবার চেষ্টা করিয়াছে তাহাকেও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছে। জৈনগুরু মহাবীর প্রচারিত ধর্মও এখন জন্মক্ষেত্র মগধ ছাড়িয়া সরিতে সরিতে ভারতেব পশ্চিম ও দক্ষিণপ্রান্তে হিন্দুধর্মের সহিত আপোষ করিয়া আশ্রয় পাইয়াছে। সনাতন গোঁড়ামির বিরুদ্ধাচরণ করায় বৌদ্ধধর্মেরও তিরোভাবের সহায়তা হইয়াছিল।

ব্রাহ্মণেরা বুদ্ধকে মানেন নাই বটে কিন্তু বুদ্ধের ধর্মে যাহা কিছু সুন্দর ও মহান ছিল তাহা গ্রহণ করিতে তাঁহারা কিছুমাত্র ত্রুটি করেন নাই। নির্বাণের আদর্শ আমাদের ব্রহ্মধারণায় আমরা গ্রহণ করিয়াছি। বুদ্ধের লোকসেবা লোকহিত সুকর্মচর্যা প্রভৃতি শিক্ষা হিন্দু আদর্শের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছে। কর্মবাদ ও সর্বজীবে অহিংসা, এই যে দুইটি বিষয় ভারতের দার্শনিক ও ধার্মিক চিন্তার প্রধান ভিত্তি, তাহারও জন্য আমরা বৌদ্ধ ও জৈনদের নিকট ঋণী।

বুদ্ধ বা তাঁহার শিষ্যদের প্রচারিত ধর্মে ধ্বংসের কয়েকটি বীজও লুক্কায়িত ছিল। বুদ্ধপর কালের সমৃদ্ধ বৌদ্ধধর্মে এমন কতকগুলি ভাব গড়িয়া উঠিয়াছিল যাহা বুদ্ধ নিজে বলিয়া থাকুন বা না, বৌদ্ধধর্মকে বিনাশের পথে লইয়া গিয়াছিল। কালক্রমে বৌদ্ধধর্ম সংসারত্যাগী সংসার-বিদ্বেষী সংঘারামবাসী সন্ন্যাসীদের ধর্ম হইয়া উঠিয়াছিল। বুদ্ধ-মহাবীরের সময়েও সমাজে বিভিন্ন সন্ন্যাসীসম্প্রদায় ছিল বটে কিন্তু বৌদ্ধ ও জৈনেরা বলিলেন শুধু বৃদ্ধ নহে, সকলেরই সন্ন্যাস কর্তব্য। বয়স ও শক্তিসামর্থ নিরপেক্ষ হইয়া যে সে প্রব্রজ্যাগ্রহণ করিয়া সন্ন্যাসী হইল। গৃহাশ্রমের এই অবমাননায় সন্ন্যাসীদের নিজেদের অস্বাভাবিক জীবনের শক্তি কমিয়া গিয়াছিল।

আবার বৌদ্ধধর্মে অনিত্যবাদ দুঃখবাদ ও অনাত্মবাদ অতি প্রধান ও মৌলিক বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। জগতে সবই অনিত্য, সবই দুঃখময়, আত্মা ও ঈশ্বর বলিয়া কিছুই নাই, নির্বাণের অর্থ দেহমনের নিরবশেষ বিনাশ ও বিলোপ, এই শিক্ষায় মানুষের তৃপ্তি হয় না। অভিধর্মের গুরুভারপ্রপীড়িত সংঘারামবাসী বৌদ্ধেরা দুঃখময় অনিত্য সংসার হইতে নিষ্কৃতির উপায়স্বরূপে যে নির্বাণের নির্দেশ করিলেন তাহাতে সংসার-তাপক্লিষ্ট মানুষের প্রাণ আরও দমিয়া গেল। চিকিৎসক যদি রোগীকে দূষিত জলবায়ু ছাড়িয়া স্বাস্থ্যকর স্থানে যাইবার পরামর্শ না দিয়া, বীর্যবান ঔষধ ও বলকর পথ্যের ব্যবস্থা না করিয়া, আরোগ্যলাভের ভরসা না দিয়া কেবল বলেন 'যেখানেই যাও, যাহাই খাও, এ রোগ সারিবার নহে, যতক্ষণ প্রাণ আছে ততক্ষণ ভুগিতেই হইবে, যদি বাস্তবিক ভাল থাকিতে চাও তবে প্রাণের মায়া ছাড়', তবে রোগী যে সে চিকিৎসককে ত্যাগ করিবে তাহা আর বিচিত্র কি? জীর্ণ বৌদ্ধধর্মে ক্রমে মন্ত্রতন্ত্রাদি এবং সংঘজীবনে বিবিধ দুরাচার প্রবেশ করিয়াও ধর্মের শক্তিহানি করিয়াছিল।

পাশ্চাত্য সমালোচকরা আমাদের দেশের ধর্ম ও দর্শনচিন্তাকে দুঃখবাদী আখ্যা দিয়াছেন। আমরা সংসারের সুখের দিক দেখি না, দুঃখের দিকই বড় করিয়া দেখিয়া সংসার ও মানবজীবনকে দুঃখময় ভাবি, এ কথা আংশিক সত্য হইলেও পূর্ণসত্য নহে। ধর্মমাত্রই কিছু পরিমাণে দুঃখবাদী হইতে বাধ্য। ধর্মের লক্ষ্যই হইতেছে জীবনকে পূর্ণতর,

সত্যতর ও বৃহত্তর আদর্শের দিকে লইয়া যাওয়া। পূর্ণতা সত্য ও বৃহতের প্রতি যাহার দৃষ্টি, অপূর্ণতা মিথ্যা ও ক্ষুদ্রতা যে তাহাকে বেদনা দিবে ইহা স্বাভাবিক। আদর্শের পূর্ণতা যে চাহে, বাস্তব তো তাহার নিকটে অপূর্ণ মনে হইবেই। পাশ্চাত্য সমালোচকরা বলিয়াছেন নিদারুণ গ্রীষ্মে দুর্ভিক্ষে বন্যায় অতিবৃষ্টি-অনাবৃষ্টি-মহামারীতে ভুগিয়া ভুগিয়া আমরা শক্তিহীন ও নিরাশ হইয়া পড়িয়াছি, প্রবল প্রকৃতি-প্রকোপের প্রতিবিধান করিতে না পারিয়া অদৃষ্টবাদ ও দুঃখবাদে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। ঐহিকপ্রধান পাশ্চাত্য দৃষ্টিতে বাহ্যপ্রকৃতিই সর্বাপেক্ষা বড় কথা, বাহ্যপ্রকৃতির সহিত সংগ্রামই তাহার সভ্যতার ইতিহাস এবং সেই সংগ্রামে জয়ী হওয়াই তাহাদের সাধনায় চরম মনুষ্যত্ব। ভারতীয় সাধনায় কিন্তু অন্তঃপ্রকৃতিই প্রধান বিষয়।

সংসারে দুঃখ আছে একথা কে অস্বীকার করিবে? জরাগ্রস্ত ব্যক্তি প্রায়ই সুস্থ থাকে না, ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি খুবই কষ্ট পায়, মৃত্যুতে কাহারও নিজের ইচ্ছা হয় না ও সকলেরই পরিজনবর্গের দুঃখ হয়—এসকল তো সর্বদাই সকলে দেখে। অতএব বুদ্ধ যখন বলিয়াছিলেন জরায় দুঃখ, ব্যাধিতে দুঃখ, মৃত্যুতে দুঃখ, তখন তিনি অন্যায় কি বলিয়াছিলেন? প্রিয়ের সহিত বিয়োগে দুঃখ, অপ্রিয়ের সহিত সংযোগে দুঃখ, এ কথা কি অসত্য? সমাজের সকলের সুখদুঃখের বিষয় যে চিন্তা করে, সে দুঃখকে বিস্মৃত হইতে পারে না। যে ব্যক্তি লোকস্বাস্থ্যের বিষয় চিন্তা করে না বা নিজে সুস্থ আছে মনে করে, সে হয়তো ভাবিতে পারে দেশে রোগ নাই কিন্তু যেখানে যাওয়া যায় সেখানেই বিবিধ ব্যাধির প্রকোপ দেখিয়া চিকিৎসক যদি নিজ অভিজ্ঞতায় বলেন দেশের অধিকাংশ লোকই বিবিধ রোগে ভুগে, তবে চিকিৎসককে রোগবাদী বলিলেও সত্যবাদী বলিব না কি? এবং যদি সেকথা সত্য হয় তবে দেশকে রোগময় বলাও মোটেই অত্যুক্তি নহে। বুদ্ধও এই দৃষ্টিতেই সংসারকে দুঃখময় বলিয়াছিলেন, কিন্তু এই দুঃখের উর্ধ্বে সুখের কথাও তিনি বলিয়াছেন।

প্রাত্যহিক জীবনের ভোগকামনার পশ্চাতে ধাবমান সংসারের লোক যাহাকে সুখ বলে, বুদ্ধ তাহাকে সুখ বলিতেন না। তিনি বাস্তব সংসারকে অশেষদোষদুষ্ট দেখিয়াছিলেন বটে কিন্তু দুঃখেই মানবজীবনের পরিসমাপ্তি একথা বলেন নাই। সংসারের তুচ্ছ বিনাশশীল আত্মন্তবান সুখ ছাড়িয়া

নির্বাণের অক্ষয় সুখই তিনি পাইবার চেষ্টা করিতে বলিয়াছিলেন। ইহাতে মনে হয় ভারতের শ্রেষ্ঠ ধর্মচিন্তাকে দুঃখবাদী না বলিয়া বরং দুঃখদ্বেষী তুচ্ছসুখত্যাগী পরমানন্দবাদী বলাই উচিত। দুঃখ অবশ্যই আছে, তাহার করালমূর্তিও অবশ্যই স্বীকার্য, কিন্তু বুদ্ধ উপনিষদ গীতা প্রভৃতির শিক্ষা দুঃখের নিকট পরাভব স্বীকার করে নাই, দুঃখের উপরে অনন্ত সুখের কথা তাঁ । বলিয়াছেন এবং সেই সুখপ্রাপ্তির পথও তাঁহারা নির্দেশ করিয়াছেন।



ভিক্ষাপাত্রে বোধিদ্রুমশাখা—নন্দলাল বসু অঙ্কিত

সমাপ্ত